প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

প্রিয় নাথ সেন

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন বিরচিত

শ্রীপ্রমোদনাথ সেন সম্পাদিত

মূল্য ২৷৷০ টাকা

প্রকাশক
শ্রীপ্রমোদনাথ সেন
"প্রিয়ধাম"
৮, মথুর সেন গার্ডেন লেন
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৪০ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

পূজনীয়া

মাতৃদেবীর

করকমলে

প্রমোদনাথ সেন

মুখবন্ধ

প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর যে সব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে। আমি জানি তার কারণটি কত স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হোতো। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। তারপর অনেকদিন গেল কেটে, বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটল,—পাঠকদের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি।

সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোর-বয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্ব্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্ত্তী সামনের জিনিষ পিছিয়ে পড়ছে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহুকালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তবু তিনি যে-কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকদের কাছে সে দূরবর্ত্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।

শান্তিনিকেতন
২৯ আষাঢ়, ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয় সন ১৩২৩ সালের ৮ই কার্ত্তিক পরলোক গমন করেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্য ও পদ্য রচনা ছাড়াও তিনি বিবিধ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী গদ্য ও পদ্য রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। কিন্তু তিনি ইংরেজী ভাষায় যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহা মোটেই প্রকাশিত হয় নাই এবং দুঃখের বিষয় সেই সব রচনার পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যাইতেছে না।

পিতৃদেবের রচনাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার প্রবল বাসনাসত্ত্বেও নানা বিপদ-আপদ ও বাধাবিঘ্নবশতঃ এতাবৎকাল উহা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর পরে আজ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার গদ্যরচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। পদ্যরচনাগুলিও শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

তাঁহার যে সকল রচনা মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল উহাদের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা হইতেই উহাদিগকে মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু মাসিকপত্রে প্রকাশিত কোন কোন রচনার স্থানে স্থানে মুদ্রাকরপ্রমাদ এত বেশী রহিয়াছে যে পাণ্ডুলিপি না পাইলে উহাদের সংশোধন আমার পক্ষে সুসাধ্য নহে।

তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলীর পাণ্ডুলিপিও সমস্ত পাওয়া

যাইতেছে না ; যদি উহাদের সমগ্র উদ্ধার সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিয়মিতভাবে লিখিবার জন্য কোন খাতা তাঁহার ছিল না এবং পেন্সিলেই তিনি বেশীর ভাগ লিখিতেন। যখন কোন বিষয়ে লিখিবার বাসনা হইত তখন তিনি হাতের কাছে যাহা কিছু পাইতেন—তা' সে চিরকুট কাগজ, পুস্তকের মলাট, ছেলে-দের লিখিবার খাতা বা শ্লেট, ছাপান বিজ্ঞাপনের (Handbill) শাদা পৃষ্ঠাই হউক—তাহাতেই লিখিতেন। সুতরাং সেই সব পাণ্ডুলিপির উদ্ধারের আশা অল্প।

যশোলিপ্সায় তাঁহার মজ্জাগত ঔদাসীন্য ছিল। কোন দিন তিনি নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না ; তাই তাঁহার বহু রচনা মুদ্রাযন্ত্রের মুখ দেখে নাই ; নিতান্ত জোর করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণ যাহা কিছু টানিয়া লইয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে।

"স্বপ্ন-প্রয়াণ"-সমালোচনার পাণ্ডুলিপি সমস্ত পাওয়া যায় নাই। পরে যদি পাওয়া যায়, অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিব। পিতৃদেবের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে স্বপ্ন-প্রয়াণের একটি সমালোচনা লিখিবার জন্য পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে প্রকাশিত হইল। পিতৃদেব তখন অসুস্থ ছিলেন কিন্তু "স্বপ্ন-প্রয়াণের" সমালোচনা লিখিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ আগ্রহান্বিত দেখিয়া-ছিলাম। সমালোচনাটি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মারা যান।

পিতৃদেব বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অপেক্ষা

প্রায় ৫।৬ বৎসরের বড় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, প্রগাঢ় ভালবাসা এবং সহোদরপ্রীতি ছিল। উভয়ের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান সর্ব্বদাই হইত। রবিবাবুর অধিকাংশ চিঠি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মুদ্রিত করিলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হয়। তখনকার দিনে রবিবাবু প্রায় প্রত্যহ আমাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং সাহিত্যচর্চ্চায় কখন কখন সমস্ত দিনই অতিবাহিত করিতেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যে কতদূর ছিল, তাহা রবিবাবুর "জীবনস্মৃতি" এবং পত্রসমূহ পাঠে বেশ বোঝা যায়। রবিবাবুর কতকগুলি পত্র এবং পিতৃদেবেরও একখানি পত্র গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে প্রকাশিত হইল।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর নানা দৈনিক ও মাসিক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা বাহির হইয়াছিল তাঁহার ব্যক্তিগত ও রচনাগত বৈশিষ্ট্যপ্রকাশের সহায়তাকল্পে উহাদের কতক কতক পরিশিষ্টভাগে উদ্ধৃত হইল।

"সুলোচনা" নামক গল্পটী ১২৯২ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। যদিও তিনি আরও গল্প লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। ঐ গল্প এবং "ফলিত জ্যোতিষ" নামক প্রবন্ধটী সমালোচনামূলক না হইলেও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

কলিকাতা
"প্রিয়ধাম"
শ্রাবণ ১৩৪০ সাল

শ্রীপ্রমোদনাথ সেন

সূচীপত্র

১।	কাব্যকথা	১
২।	মানসী	১৮
৩।	চিত্রাঙ্গদা	৪৮
৪।	সনেট পঞ্চাশৎ	৯৮
৫।	অলীকবাবু	১২৮
৬।	রস্কিন্	১৩৮
৭।	গীদে মোপাসাঁ	২১২
৮।	স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২২
৯।	ফলিত জ্যোতিষ	২৩১
১০।	সুলোচনা	২৪৬
১১।	স্বপ্ন-প্রয়াণ	২৫৬
১২।	পরিশিষ্ট :—(ক) পত্রাবলী	২৬৭
	(খ) আলোচনা-প্রবন্ধ	৩০১

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

কাব্য-কথা

কাব্যের উদ্দেশ্য

তর্ক করিবার একটা নেশা আছে। অনেকেই তাহাতে একটু ঝাঁঝাল আমোদ অনুভব করেন। তাই প্রায়ই দেখা যায়, সভাসমিতিতে, সংবাদ বা সাময়িক-পত্রে কোনও না কোনও বিষয় লইয়া একটা অনাবশ্যক আন্দোলন চলিতেছে। স্বীকার করি, জীবনে তর্ক বা আলোচনার বিষয় অনেক আছে। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাদের মীমাংসা এখনও হয় নাই। চির-সমস্যার ন্যায় তাহারা আবহমানকাল মীমাংসার নাগাল অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে, এবং যতদিন না মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞান তাহাদের বর্ত্তমান সীমা অতিক্রম করিতেছে, ততদিন সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যেমন বেদান্ত এবং সাঙ্খ্যের মতদ্বন্দ্ব। কিন্তু মীমাংসার আশা না থাকিলেও মানুষ তাহার নিজের প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সেই অন্ধকার ঘরে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মীমাংসার তল্লাস করিবেই। সুতরাং তদ্বিষয়ক তর্ক বা আলোচনা কখন থামিবে না—নিয়তই চলিবে।

আবার এমনও অনেক বিষয় আছে, যাহা এত সূক্ষ্ম এবং জটিল তথ্যে পরিপূর্ণ, যে মীমাংসিত হইলেও, তাহাদিগকে বুদ্ধির আয়ত্ত করা এতই দুষ্কর যে মাঝে মাঝে তাহাদের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন আমাদের ষড়্‌দর্শনের অনেক কথাই। সুতরাং তর্ক বা আলোচনার বিষয় অনেক আছে ; এবং তাহাতে ব্যাপৃত থাকা মানুষের একটি প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ সকল ছাড়া, এমন অনেক বিষয় আছে যাহাদের চরম মীমাংসা বহুকাল হইতে নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে। তাহাদের পুনরালোচনায় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়েরা হয় পাণ্ডিত্য ফলাইবার ইচ্ছায়, নয় বুদ্ধির সঙ্কোচে বা প্রকৃতিগত খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেই সকল মীমাংসিত প্রশ্নের ধ্রুব সত্যকে আরও পরিষ্কার এবং সুগম করিবার ভাণে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য-ধূলিমধ্যে প্রোথিত করেন ; এবং তাহাদের লইয়া বুদ্ধির ডিগ্‌বাজী খেলিতে থাকেন।

সাহিত্যের এমন একটি প্রশ্ন লইয়া সাময়িক পত্রে কিছুদিন হইল আলোচনা চলিতেছে। সবুজ পত্রে "বাস্তব", "সাহিত্যের বাস্তবতা" প্রভৃতি প্রবন্ধে "সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি" এই পুরাতন এবং সুমীমাংসিত প্রশ্ন পুনরালোচিত হইয়াছে। "বাস্তব" কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। রসসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবির মুখে এই কাব্যকথা প্রকৃত এবং শিক্ষণীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রবাবু পাণ্ডিত্য না ফলাইয়া সরল সহজ

ভাষায় এবং পদ্ধতিতে আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া—পাণ্ডিত্যের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ না লইয়া—দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, রস-সাহিত্যের বস্তু রস! "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—তা আমাদের সাহিত্যের নবরসই লও আর ইউরোপীয় সাহিত্যের emotionই লও। যে সাহিত্যে রস আছে, তাহা বস্তুহীন নহে—তাহা বাস্তব এবং তাহাই—কেবল মাত্র তাহাই কাব্য। তাহার পর কথা উঠিল কাব্যের দর লইয়া। ইহার উত্তর খুব সোজা এবং সংক্ষিপ্ত। রসই যদি কাব্যের বস্তু হইল, তবে কাব্যের যাচাই করিতে হইলে রসের যাচাই করিতে হয়; দেখিতে হয় সে রস খাঁটি কিনা, তাহার মাত্রা এবং পরিমাণ নৈসর্গিক সীমা অতিক্রম করিয়াছে কিংবা তাহার নিম্নে আছে; এক কথায় যে রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে কিনা। এইখানে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকগণ তাঁহাদের অতিবুদ্ধি প্রভাবে একটি নিতান্ত অভিনব এবং অনন্তদৃষ্ট তথ্যের উদ্ভাবন করিলেন। রসেরও ত একটি বস্তু থাকা চাই। কবি "তথাস্তু" বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিলেন, হাঁা, নিশ্চয়ই, রসের একটি আধার আছে। কিন্তু সেইটিরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়? রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে, আজও তাহা বাতিল হয় নাই। এই চির এবং অভ্রান্ত সত্যের প্রতিবাদ করিলেন—পণ্ডিত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি

বলিলেন, "রস ও বস্তু, দুইয়েরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। কাব্য যে গুণে স্থায়ী হয়, তাহা নিত্য রসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয়—নিত্য রস ও নিত্য বস্তুর গুণে।" রসের মধ্যে একটা অনিত্যতা আছে, ইহা কোনক্রমেই আমাদের বুদ্ধির গোচর করিতে পারি না। কতক রস কি নিত্য এবং কতক অনিত্য? অথবা এক রসেরই অংশবিশেষ নিত্য এবং অপর অংশ অনিত্য? আমরাও আজ পর্য্যন্ত জানি রস মাত্রেই নিত্য এবং আমাদের ধারণা, "রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে।" এই কথায় রবিবাবু তাহাই বুঝিয়াছেন এবং বলিয়াছেন। মানব-হৃদয়ে রসমাত্রেরই আবহমান-কাল একটি অপরিবর্ত্তনশীল প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের হৃদয়-বৃত্তিসমূহের স্ফুরণকে অলঙ্কার শাস্ত্রের পারিভাষিক ভাষায় রস বলে। সুতরাং রসের মূল মানবের স্বভাবজ হৃদয়-বৃত্তিসমূহ—ভক্তি, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন একটি বৃত্তি পাত্রবিশেষে কম বা বেশী হইতে পারে—অচিরস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন মানুষের হৃদয়-বৃত্তি-সঞ্জাত রসও থাকিবে—সেই অর্থেই রস নিত্য এবং তাহার মূল্যও নিত্য। কিন্তু রসের বস্তু বা আধার সম্বন্ধে এই কথা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বথা খাটে না। রসের বস্তু কল্পনা করা যাইতে পারে এবং প্রায়ই কাব্যাদিতে কল্পিত হইয়া থাকে; কিন্তু রস মানবের স্বভাবজাত চিত্তবৃত্তির অনুরূপ—প্রতিকৃতি মাত্র। তাহা ছাড়া বস্তু বা কল্পিত বস্তুর দর মানবের বিচার-সাপেক্ষ; এবং যদিও

আমরা Swiftএর মতের একেবারে প্রতিপোষক নই, ইহা অনেকটা সত্য, মানুষ উড়িতে যেরূপ সক্ষম, বিচার করিতেও সেইরূপ সক্ষম—"mankind is as much fitted to reason as to fly." প্রতিদিনের ঘটনায় দেখিতে পাই, আজ যে বস্তু, যে ঘটনা, যে মত সকলের শিরোধার্য্য, কাল তাহা পদদলিত। কিন্তু প্রেম, ভক্তি, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতির প্রভাব এবং মূল্য বাল্মীকির সময়েও যাহা, Kiplingএর সময়েও তাহাই। রসের যুগ বা জাতি নাই—সত্যযুগেও যাহা—কলিযুগেও তাহা। হিন্দুর নিকট যেরূপ—ম্লেচ্ছের নিকটও সেইরূপ।

রসোদ্ভাবনেই কবির মর্য্যাদা, কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। বস্তু সমাধানে কবির কৃতকার্য্যতা থাকিতে না পারে, তাহাতে আসিয়া যায় না। কিন্তু রসোদ্ভাবনে অসামর্থ্য অমার্জ্জনীয়। এমন অনেক কাব্য আছে, যাহার বস্তু যৎকিঞ্চিৎ—সামান্য এবং চিত্তকে আকৃষ্ট করে না; কিন্তু রসের প্রাবল্য এবং প্রাচুর্য্যে—রসোদ্ভাবনের গুণে তাহারা সাহিত্য-সংসারে এক একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। পদ্য কাব্যে Byron, Shelley, Keats প্রভৃতি এবং গদ্যকাব্যে Victor Hugo, Dickens, Thackeray, Ruskin, বঙ্কিম প্রভৃতি হইতে ইহার প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

Shakespeare লিখিত Tempest নাটকের ঘটনা-সংস্থান-বস্তু সামান্য। পাত্র পাত্রীদের মধ্যেও কেহ বা মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিবিশিষ্ট—কেহ বা মানুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের—আবা

কেহ বা মানুষ হইয়াও, মানুষের সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা হইতে বঞ্চিত ; কিন্তু এইসকল উদ্ভট পাত্র-পাত্রী লইয়া, যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বনে মহাকবি মানবের চিত্তবৃত্তির কি অপূর্ব্ব খেলা দেখাইয়াছেন ! নাটকের বস্তু সামান্য হইলেও—একাধিক বিচিত্র রসের বিস্ময়কর উদ্বোধনে সাহিত্য-জগতে Tempestএর তুল্য দ্বিতীয় নাটক নাই।

ফরাসী কবি (Coppe) কোপে লিখিত Passant (পথিক) নামক নাট্যকাব্যের আখ্যানবস্তু কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নাটিকা আগাগোড়া মধুর রসে সিক্ত। একবার পাঠ করিলে হৃদয় তৃপ্ত হয় না—পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইয়া একাধিকবার পড়িতে হয়।

কালিদাসের "মেঘদূত" রসের ভাণ্ডার—কিন্তু ইহার বস্তু কি ? এবং Coleridgeএর Ancient Mariner ইংরাজী সাহিত্যে তুলনারহিত—বস্তুগৌরবে নয়, রসের গুণে। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বিখ্যাত ফরাসী কবি এবং সমালোচক রেমিতিগুরমে বলেন, কাব্যকলায় বস্তুসম্বন্ধে আদর বা অনুরাগ শিশু বা অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কাহারও নাই। ফরাসী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিতার বস্তু কি ? Odysseyর কি এবং L'edrication Sentimentalএরই বা কি ?

এখানে তর্কস্থলে দেখা দিলেন সবুজপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ...ধুরী। তিনি সাহিত্যে—বিশেষতঃ রস-সাহিত্যে

প্রবীণ, একাধিক ভাষার সহিত সুপরিচিত এবং নিজে কবি; কিন্তু তর্ক করিবার নেশা তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়াছে। তাই তিনি রসের বস্তু সম্বন্ধে রবিবাবুর মত সহজ কথায়, সাহিত্যিক প্রশ্নের সাহিত্যিক হিসাবে মীমাংসা করিতে না গিয়া হিন্দু দর্শন এবং পুরাণাদির আবাহন করিয়াছেন। তাহাতে তর্কের আড়ম্বর না কমিয়া অবান্তর কথায় তাহা স্ফীতদেহ হইয়াছে। "বস্তু-*তন্ত্রতা" শব্দের গোত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি সাধারণ বঙ্গীয় পাঠককে বাধিত করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের পারিভাষিক* শব্দ হইলেও সাহিত্যে উহার চলন বিশেষ সুবিধাজনক এবং বাঞ্ছনীয়। প্রমথবাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখন সেকথা পরিহার করিয়া প্রকৃতমনুসরামঃ। আমরা দেখাইয়াছি সাহিত্যে রস নিত্য এবং মুখ্য বস্তু; এবং সকলেই স্বীকার করিবেন,—রবিবাবু ও রাধাকমল বাবুও স্বীকার করেন—রস একটি অবলম্বনকে—বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। কিন্তু রসের প্রাধান্য স্বীকার কর, বা বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার কর—রস-সাহিত্যেরও কার্য্য কি—উদ্দেশ্য কি? সকল কলাবিদ্যার যে কার্য্য—যে উদ্দেশ্য—রস-সাহিত্যেরও তাহাই—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা;—যাহাই সৌন্দর্য্যের উপাদান, তাহাই সাহিত্যে গ্রাহ্য। সাহিত্য-মন্দিরে কোন পদার্থেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই—যদি তাহাদের দ্বারা সৌন্দর্য্যের স[illegible], এবং যাহাতেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় তাহাতেই সাহি[illegible]অধিকার—কোথাও তাহার হাত বাড়াইবার কারণ নাই। [illegible] সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অনুমতিপত্র লইয়া

ত্রিভুবনে যত্র-তত্র সাহিত্যের অবারিতগতি—এবং সেই অনুমতি-পত্রের বলে ত্রিভুবনে যাহা, তাহা সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং সমস্ত জীবনই সাহিত্যের ক্ষেত্র। বাস্তব ঘটনা—কল্পিত ঘটনা—মানব চরিত্র—প্রকৃতির দৃশ্য—কর্ত্তব্যের কঠোর পথ—স্বপ্ন বা খেয়ালের আকাশকুসুম—সকলই কাব্যের বিষয়। কেবল সৌন্দর্য্যের উদ্ভাবন হইলেই হইল; অর্থাৎ উদ্ভাসিত রস এবং বর্ণিত বস্তুকে সৌন্দর্য্যের আলোকে মণ্ডিত করিতে হইবে। সে আলোকের উপাদান এবং প্রকৃতি Wordsworth চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুপম সুন্দর ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"The light that was never seen on sea or land
The consecration and the poet's dream !"

সে আলোক প্রতিভার আলোক। গ্রীক-পুরাণে আখ্যাত আছে Prometheus স্বর্গ হইতে অগ্নি আহরণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ কবি-প্রতিভা উচ্চতর স্বর্গ হইতে সৌন্দর্য্যের চিরোজ্জ্বল অনির্ব্বাণ নিত্যনব আলোক বিকীর্ণ করে। এবং কবির স্বপ্ন, স্বপ্ন হইলেও কেবল সুবর্ণ হইতে সুবর্ণতর (more golden than gold) নয়—বাস্তব হইতে বাস্তবতর। কিন্তু ইহাতে রাধাকমল বাবুর ভাবনা হইয়াছে লোকশিক্ষার কি হইবে? আমার ত বিবেচনায় যখন সমস্ত জীবনই সাহিত্যের ক্ষেত্র—তখন এই প্রশ্নের উত্তর চক্ষুর সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। জীবন বা জগৎ হইতে লোক যদি শিক্ষা পায়, তবে সাহিত্য হইতেও পাইবে।

এবং জীবনে যাহা জটিল—সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা অসম্বদ্ধ—নানা ঘটনা-সজ্ঞে আবৃত-প্রচ্ছন্ন-লুকায়িত, সাহিত্যে তাহা পরিষ্কার—পরিস্ফুট—উজ্জ্বল। একটা কথা চিরকালই প্রচলিত—সাহিত্য জীবনের দর্পণ!—বাস্তবিকও তাই! কিন্তু কেবল দর্পণ নহে। সাহিত্য জীবনকে সংশ্লিষ্টভাবে (Synthetically) এবং বিশ্লিষ্ট-ভাবে (analytically) দেখায়। বাস্তব জগতের পাত্র-পাত্রী অপেক্ষা আমরা সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীদের নিকট হইতে বহুবিধ এবং অধিকমূল্যের শিক্ষালাভ করি। কাল্পনিক হইলেও, তাহারা বাস্তব হইতে বাস্তবতর! তাহারা আমাদের জীবনের অংশ—হৃদয়ের সন্নিহিত। একবার মনে মনে স্মরণ কর দেখি, রামায়ণ ও মহাভারতের পাত্র-পাত্রী—Shakespeare, কালিদাস—ভবভূতি—বঙ্কিমের। তুমি জীবনে প্রতাপের ন্যায় মনোমুগ্ধকর বরেণ্য আদর্শ দেখিয়াছ? জীবনও কাহাকেও বলে না—সাহিত্যও কাহাকেও বলে না—আমার নিকট হইতে শিক্ষা লও বা শিক্ষা লইও না। যদি কেহ শিক্ষালাভ করে, তাহাতে জীবন বা সাহিত্য দুইয়েরই কোন আপত্তি নাই—দুইয়েরই কেহ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয় না। Victor Hugoর কাব্য সম্বন্ধে Swinburne বলিয়া-ছেন—"As the laws that steer the world his works are just." যদি জগতের বিধিসকল ন্যায় ও যুক্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহা হইলে জগৎ হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সাহিত্য হইতেও পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য! এবং Victor Hugoর কাব্য জগতের অনুরূপ বলিয়াই তাহা হইতেও সেই

শিক্ষা পাওয়া যায়। তাহা হইতে তুমি, আমি অজ্ঞাতসারে বা অতর্কিতভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারি; কিন্তু সাহিত্য সে বিষয়ে উদাসীন। আত্রেয়ীর বাণী কেবল গুরুশিক্ষা সম্বন্ধে খাটে না, সকল শিক্ষা সম্বন্ধেই খাটে—"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ।"

শিক্ষাদানে সাহিত্যের এই উদাসীনতার উল্লেখ John Stuart Mill তাঁহার Poetry and its varieties নামক প্রবন্ধে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। কবিতা এবং উদ্দীপনার পরস্পর পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"Poetry and eloquence are both alike the expression or utterance of feelings. But if we may be excused the antithesis, we should say that eloquence is heard, poetry is over-heard. Eloquence supposes an audience; the peculiarity of poetry appears to us to lie in the poet's utter unconsciousness of a listener. Poetry is feelings confessing itself to itself in moments of solitude, and embodying itself in symbols, which are the nearest possible representation of the feeling in the exact shape in which it exists in the poet's mind. Eloquence is feeling pouring itself out to other mind, courting their sympathy, or endeavouring

to influence their belief or move them to passion or to action.

All poetry is of the nature of soliloquy."

বঙ্গীয় সাহিত্যে এই কথার সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "উদ্দীপনা" নামক প্রবন্ধে। "দুইটি রসাত্মক বাক্য—কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। নির্জ্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; এবং অনেক লোকের সহিত আলাপে ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। উদ্দীপনা সর্ব্বদাই লোককে ডেকে কথা কন। পরের মনোবৃত্তিসঞ্চালন, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্য্যে লওয়ান, এইরূপ একটি না একটি তার চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্ব্বদাই ডাকিতেছেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন।

"তিনি কখন * * * ভূরি প্রস্ফুটিতা যূথিকা লতারূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেনও না, কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না, চতুর্দ্দিক গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেন। তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইল কি না, সে শোভা কেহ দেখিল কিনা, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই।"

কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা—ইহা একটি পুরাতন সাহিত্যিক বৈধর্ম্ম্য—heresy—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ফরাসী কবি এবং

সমালোচক Baudelaire (বদলেয়ার) যাহাকে heresie de I'ensignment বলিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গতায়ু "প্রদীপ" পত্রে মল্লিখিত "রস্কিন" প্রবন্ধে এই প্রশ্নেরই আলোচনায় যাহা লিখিয়াছিলাম, এস্থলে সঙ্গত বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"সত্যনিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য—শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাহা সাধ্য। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বা উদ্ভাবন কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য—রুচি (Taste) আমাদিগকে তাহার পথ দেখাইয়া দেয়। নীতি আমাদিগকে কর্ত্তব্য বিষয় শিক্ষা দেয়—এবং ইহা বিবেকের কার্য্য। এমন হইতে পারে যে, সত্য বা নীতির অপলাপে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বা অবিকৃত বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কলাশাস্ত্র হইতে আমরা সত্যের উদ্ভাবন বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় ঠিক করিয়া লইতে পারি না। বিজ্ঞান বা নীতির উদ্দেশ্যের সহিত যখনই কলা-বিদ্যা সঙ্গত হইয়াছে, তখনই তাহার নিজ উচ্ছেদ বা বিলোপ অনিবার্য্য। সত্যেরও মর্য্যাদা আছে, কর্ত্তব্যেরও মর্য্যাদা আছে; সৌন্দর্য্যের তাহাদের অপেক্ষা কোনরূপ ন্যূন নহে। কলাশাস্ত্রে সৌন্দর্য্যের স্থান সকলের উপর। বালক জীবনের সমস্ত মধুময় মোহ, উজ্জ্বল কল্পনা, বিচিত্র শোভা ও অর্দ্ধস্ফুট কুসুম-কোরকবৎ কোমল ও কমনীয় কবিত্বের সারাদান করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী লেখক কেনেথ গ্রেহাম (Kenneth Graham) মহাশয় যে "গোল্ডেন এজ্" (Golden Age) নামক অতি সুন্দর ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই পুস্তকের মধ্যে

আমরা কল্পনা-প্রিয় বালকের এই অমূল্য আবিষ্কারের সন্ধান পাই, সত্যের অপেক্ষাও উচ্চতর পদার্থ আছে—(There are higher things than truth) ইহার উদাহরণ কলাশাস্ত্রের প্রতিচ্ছত্রে —সে শাস্ত্রে সৌন্দর্য্য সত্যের অপেক্ষা উচ্চতর।" কিন্তু বাঙ্গালী পাঠককে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ফ্রান্স পর্য্যন্ত অতদূরে দৌড়াইতে হইবে না। আমাদের ঘরের লোক, আমাদের আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? অনেকে উত্তর দিবেন, নীতিশিক্ষা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে, 'হিতোপদেশ' 'রঘুবংশ' হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতির বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

"কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব ?

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা ; কিন্তু নীতি নির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

ইহার উপর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করি না, তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, বঙ্কিম ইদানীন্তন বাঙ্গলার শুধু অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক ন'ন—সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার মানসিক স্বাস্থ্য (sanity) আদর্শস্থানীয়, তাঁহার বিচারশক্তি এবং রসগ্রাহিতা সর্ব্বতোমুখী এবং অনিন্দ্য। তিনি যে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে কোন ভ্রমাত্মক মতকে প্রশ্রয় দেন নাই, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত এবং আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি ইতস্তত: না করিয়া অসঙ্কোচে পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা নয়।

এই সৌন্দর্য্য লইয়াই কবির ধ্যান ধারণা—কবির জীবন। কোনকালে কোন কবি তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত সৌন্দর্য্যে চির-পরিতৃপ্ত নয়। যাহা এখন চরম সৌন্দর্য্যরূপে প্রতিভাত, পরক্ষণেই অভিনব সৌন্দর্য্যের মদির স্বপ্নে কবির হৃদয় চঞ্চল,—অনিবার্য্য ঔৎসুক্যে দোদুল্যমান,—"পাইলেও নাহি পাই মেটেনা পিয়াস।" সৌন্দর্য্যের দিগ্‌বলয়ের পরিধি নাই—সীমা নাই,—তাহার অনন্ত বিকাশ কাহারও দ্বারা কখন সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না।—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল"

এবং ইহার প্রভাবও অসীম। "He Bantepente tout chose"—সৌন্দর্য্যের অশেষ শক্তি—সকলই করিতে পারে,—

পশুকেও মানুষ করিতে পারে—লোকশিক্ষা কোন ছার! উপরে উদ্ধৃত বঙ্কিমবাবুর কথাগুলি স্মরণ কর।

সৌন্দর্য্যকে সংজ্ঞার (definition) মধ্যে আনা অসম্ভব—যদিও ইহাকে অনুভব করিতে সময় লাগে না। পার্থিব হইয়াও ইহা অপার্থিব। মানুষের চির আনন্দের সামগ্রী হইলেও ইহা দ্বারা মানুষের কোন অভাবই পূরণ হয় না—জীবনের কোন কাজেই লাগে না। হিতবাদীদের (utilitarians) গাত্রে কালি ছিটাইবার জন্য লিখিত হইলেও, Theophile Gautier সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য এবং আমার বিবেচনায় অভ্রান্ত সত্যের বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত। যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না—যাহা কিছু মানুষের ব্যবহারে আসে, তাহাই অসুন্দর—কুৎসিত, কারণ উহা কোন না কোন অভাবের পরিচায়ক এবং মানুষের সকল অভাবই নীচ এবং তাহা দীন দুর্ব্বল প্রকৃতির ন্যায় হেয়। বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান শৌচাগার। তথাপি আমরা কিছুতেই তত মুগ্ধ নহি—কিছুতেই আমরা তত তীব্র ও অসীম আনন্দ উপভোগ করি না, যেমন সৌন্দর্য্য। ইহার মধ্যে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর একটি রহস্য আছে বলিয়া বোধ হয়। Goetheএর কথাই সত্য! তিনি বলিয়াছেন—"সৌন্দর্য্য নিসর্গের গূঢ় নিয়ম সকলের অভিব্যক্তি, সৌন্দর্য্যের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে যাহারা কখনই প্রকাশ পাইত না।" ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, আমাদের জাগ্রত-চেতনার অন্তরে যে অব্যক্ত-

চেতনা আছে, তাহা সৌন্দর্য্যের মোহময় স্পর্শে সেই সকল প্রচ্ছন্ন নিয়মের সঙ্গে অস্পষ্ট সহানুভূতি অনুভব করে এবং অনির্দ্দিষ্ট ভাবসঙ্ঘের আঘাতে চঞ্চল হয়। হৃদয় এই অবস্থায় কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পায় না বলিয়া উৎকট ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ণ উপভোগের অভাবে পরিতৃপ্তি পায় না। কিন্তু ইহা দর্শনশাস্ত্রের প্রশ্ন—আমাদের অনধিকার চর্চ্চা।

সেই সৌন্দর্য্য-সৃজনই কবির আত্মপ্রসাদ,—রবিবাবু যে আত্মপ্রসাদের উল্লেখ করিয়াছেন। উহাই তাঁহার আদিম এবং একমাত্র অবলম্বন। অসংখ্য লোকের বাহবা বা প্রশংসা তাঁহার কার্য্যে তাঁহাকে সে পরিমাণে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, যেমন তাঁহার নিজ হৃদয়ের প্রীতি। যখন তিনি সেই প্রীতি লাভ করিলেন তখন তাঁহার আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না—তাঁহার নিজের আনন্দ তাঁহার কৃতকার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে চরম সাক্ষ্য—তৎপ্রতি চরম ব্যবস্থা (sanction)। যখন সৌন্দর্য্য তাঁহার লেখনীমুখে আবির্ভূত, তখন তিনি বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন—বাগ্‌দেবীর "ভর" তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। Coleridge যথার্থই বলিয়াছেন "Poetry has been to me its own exceeding great reward." লোকপ্রশংসা আসুক বা না আসুক, যতক্ষণ না তাহার সৃষ্টি কবির হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছে ততক্ষণ তিনি অন্ধকারে। গোড়ায় তিনি সাধারণের প্রশংসার জন্য চেষ্টিত নন—অবজ্ঞার ভয়ে ভীত নন।—"তান্ প্রতি নৈব যত্নঃ!"

সেই রস-সাহিত্যকে—সেই আনন্দের সৃষ্টি বিশাল দেব-মন্দিরকে—সৌন্দর্য্যের অসীম পীঠস্থানকে, কে পাঠশালার সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে? আশা করি কেহ নয়—রাধাকমল বাবুও নন—অন্ততঃ পুনরালোচনায়!

মানসী

সৌন্দর্য্য উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ, অপর দিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতানিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎ-সংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি; এবং বিশুদ্ধ বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বরং বাড়িতেই থাকে। ইংরেজ কবি শেলি লিখিয়াছেন, প্রেমের বিভাগ অর্থে এমন বুঝায় না যে, কাহারও প্রাপ্ত অংশ হইতে তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র বঞ্চিত করা। এ কথায় অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে—কিন্তু, সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভাগ করিয়া লইলে, আনন্দ যে বাড়ে বই কমে না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মঙ্গলময়ী এবং ইহার পরিচালনা শুভোদ্দিষ্টা।

আমাদের সৌন্দর্য্যস্পৃহা নানা উপায়ে চরিতার্থ হয়। কিন্তু বোধ হয়, সুন্দর কাব্য হইতে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর কলা বিদ্যারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি, কিন্তু কাব্যে যেমন বাহ্য এবং অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য স্থায়ী, এবং সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ

প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কাব্যামোদী পাঠক, তাই কোনও সুন্দর কাব্যের সন্ধান পাইলে সুখে অধীর হইয়া অপরকে তাহার রসাস্বাদনে সুখী করিতে উৎসুক হন। সম্ভবতঃ, সমালোচনার জন্ম ইহা হইতেই।

আমরা "মানসী" পাঠে যে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন আমোদ পাইয়াছি, সচরাচর কোন কবিতা পুস্তকপাঠে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সেই আনন্দ-উদ্বেগে প্রণোদিত হইয়া মানসী-প্রকাশের কিছু দিন পরেই আমরা উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখি—কিন্তু কতিপয় কারণবশতঃ উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি মানসীর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে—আমরাও তদুপলক্ষে আমাদের পূর্ব্বরচিত প্রবন্ধ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

আমাদের বিবেচনায় মানসী একখানি অতি উৎকৃষ্ট, অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এত চরম সৌন্দর্য্যের, এত বিচিত্র কবিতার একত্র সমাবেশ বাঙ্গলা ভাষাতে আজ এই প্রথম দেখিলাম। অপর কোনও ভাষাতেও এরূপ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচ্চ দরের অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসরের ভিতর ইংরেজি বা ফরাসী ভাষায় এমন কোনও কবিতা-পুস্তক দেখিয়াছি কি? সুইন্‌বার্ণ এবং ভিক্টর হুগোর দুই এক খানি গ্রন্থ স্মরণ হইতেছে—কিন্তু মানসী পড়িয়া বিষয় এবং ভাবের বৈচিত্র্যগুণে এবং কাব্য-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষনিবন্ধন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাপুস্তকই বার

বার আমার মনে আসিয়াছে। সে পুস্তক আর কাহারও নয়, ভিক্টর হুগোর—এবং সেখানি তাঁহার অপর কোন পুস্তক নয়, তাঁহার লে কোঁতাঁপ্লাসিওঁ (Les Contemplations)। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, সমালোচক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন। আমরা কিন্তু আমাদের মনের কথাই বলিতেছি। আমাদের স্থির বিশ্বাস, মানসীর রসাস্বাদনে অধিকারী পাঠক যদি ভিক্টর হুগোর কোঁতাঁপ্লাসিওঁ পড়িয়া থাকেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এই দুই পুস্তকের একত্র নামকরণ অনিবার্য্য না হইলেও, নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

মানসীর ভাষা এবং ভাব—যেন একই ছাঁচে একেবারে প্রকৃতির হাত হইতে বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক ইহার কোথাও কৃত্রিমতার নাম গন্ধ নাই। এই সকল কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের মূলীভূত কারণ,—তাহাদের মর্ম্মগত সত্য। মানসী বড়ই সুন্দর, কেন না মানসী বড়ই সত্য। তাহাতে একটিও মিথ্যা কথা নাই। কবি মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবসমূহের অতলস্পর্শ গভীরতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই, সেই চির সত্যের ভিতর কবিত্বের অমর সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই জন্য তাহার অন্বেষণে তাঁহাকে মিথ্যার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই। প্রকৃতির চিরসৌন্দর্য্যের প্রাণ পর্য্যন্ত দেখিবার চক্ষু তাঁহার আছে বলিয়াই, তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া চিরদিন রং ঘুঁটিতে হয় নাই। তিনি বাহ্য এবং অন্তর্জগতের এতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে জানেন বলিয়াই, এত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছেন, এবং এমন সুন্দর করিয়া

দেখিতে পারিয়াছেন। এই গেল মানসীর ভাব বা প্রাণের কথা। ইহার বাহ্য বিকাশ অর্থাৎ ভাষা এবং ছন্দ সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই খাটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কবির ভাব ও ভাষা একাধারে একেবারে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ সৃষ্টির হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা আসিয়াছে, তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। সেই জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ আহরণ করিতে হয় নাই—ভাবপ্রকাশের জন্য ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই। এ দিকে আবার জোর করিয়া একটা মস্ত কথা বলিবার কোথাও প্রয়াস বা চেষ্টা দেখিলাম না। পূর্ণ প্রাণ হইতে সুন্দর এবং পরিণত ভাষা ও ছন্দে, উচ্ছ্বাসোন্মুখ কবিতার মুক্তস্রোত হিল্লোলময়ী ধারায় নিঃসৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কবির বলিবার কথা আছে—কথা বলিবার আড়ম্বর নাই। তাই তাঁহার ভাষা সারগর্ভ, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিস্ফুট এবং ভাবের পর্দ্দার সঙ্গে সুমিলিত। শুধু তাহাই নহে। এ প্রশংসায়, ভাষার এ গুণপণায়, উৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য উভয়েরই দাবী আছে, এবং উভয়েরই থাকা চাই। কিন্তু পদ্যের হিসাবে এই সকল কবিতার অপূর্ব্ব সুন্দর ভাষাকে আরও সুন্দর এবং মুগ্ধকর করিয়া তুলিয়াছে শব্দবিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ বিস্ময়কর ক্ষমতা। আমি কেবল শব্দের লালিত্য বা মাধুর্য্যের কথা বলিতেছি না—কাব্যাংশে তাহাদের সার্থকতার কথা বলিতেছি। এ ক্ষমতা যে কেবল রবীন্দ্র বাবুর মানসীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহার

শৈশব কবিতার ভিতরও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার নির্ব্বাচিত শব্দগুলির ভিতর যেন স্বভাবের চিরসৌন্দর্য্য জাগিয়া রহিয়াছে—প্রকৃতির পূর্ণ-মোহ তাহাদের ভিতর বিগুমান। নিকৃষ্ট কবিদিগের বর্ণনার ন্যায় তাহারা নিসর্গের কেবলমাত্র প্রাণহীন ফোটোগ্রাফ বা অন্ধ ছবি নহে। স্বভাবের সমস্ত জীবন তাহাদের অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত। পাঠকালে এই শব্দমন্ত্রে আহূত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, কখন বা স্বভাবের উদার, কখনও বা রুক্ষ, কখনও বা বিস্ময়কর দিব্য মূর্ত্তি; এবং কেবল তাহাই নহে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি দেখিলে হৃদয় যে অব্যক্ত অধীরভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাদের ভিতর সেই অব্যক্ত অধীরতাটুকুও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল বাহ্যজগতে সৌন্দর্য্যরাশি আনিয়া পাঠককে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হয় না—কবির অন্তর্জগতের আরও মুগ্ধকর বার্ত্তা আনিয়া দেয়—আনন্দ-উন্মুখ পাঠকের প্রাণে কবির উপভোগগলিত তপ্তপ্রাণ ঢালিয়া দেয়। এক কথায়, তাহাদের ভিতর যেমন নিসর্গের চিরপ্রফুল্ল সৌন্দর্য্যরাশি বর্ত্তমান, তেমনই তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কবি-হৃদয়ের মুগ্ধ উপভোগও বর্ত্তমান।

এই পরিস্কার ভাসা ও এই মোহমন্ত্রময় শব্দবিন্যাসের উপর আবার আসিয়া পড়িয়াছে, উদ্বেলিত প্রাণের সমুচ্ছ্বাসপূর্ণ, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ন্যায় মুগ্ধকর, এক অতি আশ্চর্য্য—অতি অপূর্ব্ব ছন্দের আকুল তরঙ্গ। বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্র বাবুকে ছাড়িয়া দিলে, শব্দ-বিন্যাস এবং ছন্দরচনায় রবি বাবুঁ বঙ্গ কবিদিগের শীর্ষস্থানীয়, এবং

ভবিষ্যতের চির আদর্শ। এক ছন্দ লইয়াই কবিপ্রতিভার পূর্ণ পরিমাণ লওয়া যাইতে পারে। নিকৃষ্ট সমালোচকেরা ছন্দকে কবিতার বাহ্য-গঠন বা পরিচ্ছদজ্ঞানে তাহাকে নিতান্ত গৌণ বা অপ্রধান স্থান দিয়া থাকে। নিকৃষ্ট কবিদের নিকট ছন্দ ভাব-প্রকাশের নিগড় বা ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃত কবির হাতে ছন্দ ভাষা অপেক্ষা রসবিকাশের শ্রেষ্ঠতর —যোগ্যতর অবলম্বন। ভাষা যাহা করিতে পারে না, ছন্দ তাহা অনায়াসে করিয়া থাকে। ভাষা যেখানে যাইতে পারে না, ছন্দের স্বর্গীয় রাগিণী সেখানে ভাবপ্রকাশের পথ অতি সুগম করিয়া দেয়। পদ্য যদি ছন্দোময়ী রচনা হয়, এবং গীতিকাব্য যদি প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তবে সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না, যেমন ছন্দের আকুল হিল্লোলে। প্রথম শ্রেণীর কবিমাত্রেরই ছন্দের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ছন্দের উপর ক্ষমতা অর্থে আমি বুঝিতেছি না—মাত্রা, মিল বা যতি সংস্থাপন সম্বন্ধে শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলা। এমন অনেক পদ্য আছে, যেখানে সকল নিয়মই সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে—পড়িতে শুনিতেও যাহা বেশ সুমধুর, অথচ ছন্দের যে সৌন্দর্য্যের কথা আমি বলিতেছি, তাহাতে তাহার কিছুই নাই। সে সৌন্দর্য্য নিয়মের অধীন নয়, শিক্ষারও আয়ত্ত নয়। গায়কের কণ্ঠের ন্যায় তাহা নিতান্ত স্বভাবের সামগ্রী। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসকে লইয়া যে পুরাতন বিবাদ আছে, এখানে তাহার মীমাংসা হইতে পারে। বিদ্যাপতির ছন্দের উপর এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—বিদ্যাপতির গলা আছে।

চণ্ডীদাসের নাই। চণ্ডীদাসের ছন্দ বেশ সুন্দর এবং মধুর, বেশ তাললয়বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির অপূর্ব্ব মোহ নাই। মলয় সমীরণের ন্যায় তাহা হঠাৎ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না, প্রাণকে ভাসাইয়া দেয় না। বিদ্যাপতির বংশীর রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চিত্ত চমকিত হয়, বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া কোথায় কোন্ দিকে ভাসিয়া যাই।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

চণ্ডীদাসের এই কয়টি কথায় বিদ্যাপতির সুন্দর কণ্ঠধ্বনি অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বিদ্যাপতির ছন্দের ঘোরও একটু আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নহে; ইহাতেও কেমন একটু আকুলতা আছে, কিন্তু দেখ, সে আকুলতা এই কয়েক কাতর পদের দীর্ণ বিদীর্ণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া ধুইয়া মগ্ন হইয়া গেল।

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

বিদ্যাপতি সুরে মুগ্ধ করেন, চণ্ডীদাস কথায় মুগ্ধ করেন। কিন্তু সুর লইয়াই ছন্দ এবং ছন্দ লইয়াই কবির কার্য্য। তাই বলিয়া এমন বুঝিও না, চণ্ডীদাসের সুর নাই বা বিদ্যাপতির কথা নাই।

ছন্দের উপর রবি বাবুর ক্ষমতা বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায়। তাঁহারও ছন্দের সুরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সুদূর নিকট হয়, নিকট সুদূর হয়। দুই চারিটি পদ্যে চক্ষে জল আসিয়া পড়ে এবং ছন্দের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মর্ম্ম কাঁপিতে থাকে। এই মানসীতে তাঁহার ছন্দরচনাক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি নূতন মিল, নূতন মাত্রা, নূতন পদবিভাগ, যতিসংস্থাপন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নূতন ছন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষার সুপ্ত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার—পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহার অভিনব ব্যবস্থা সকল স্থানে না খাটিলেও, আমাদের পুরাতন 'আটপৌরে' পয়ার ছন্দের জরাজীর্ণতার ভিতর অনেকটা জীবনী সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাহার সেই অলস নিদ্রাতুর "একঘেয়ে" ভাব বিদূরিত করিয়া, তাহার স্থানে জাগ্রত জীবনের সচল ভাব আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই অভিনব বিধানের ভিতর উৎকট কিছুই নাই—ইহা বাঙ্গলা ভাষা ও ছন্দের আভ্যন্তরিক ধাতুগত স্বাভাবিক গতির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া মিশিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত এই কয়টি চরণের যতিবিভাগে এবং বিভিন্ন স্বরের উত্থান পতনে—অথবা জানি না কোন্ নিগূঢ় কারণে,—হৃদয়ের কি ঘোর ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে, যেন আবেগভরা প্রাণের গভীর 'দুরু দুরু' এই ছন্দের তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছি গীতহার,
কত রূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

হাজার কথা দিয়া কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিত না, কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিবে না, তাহা এই কতিপয় অলঙ্কারশূন্য সাদাসিধা, অতি সরল, অতি সহজ অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি প্রাণভরা উক্তি পাইয়াছে। জানি না, শেষচরণপাঠে চক্ষের উপর কত জন্ম কত যুগ ঘুরিয়া যায়। কত সুদূর বৎসরের বিশাল মেঘরাশি ঠেলিয়া প্রাণ কোথায় ভাসিতে থাকে। অতীতের অনন্ত বিস্তৃতি চক্ষের

সম্মুখে খুলিয়া যায়। কত অন্ধকার কত আলো আসিয়া প্রাণে পড়ে। ইহা অপেক্ষাও আরও মুগ্ধ সুন্দর সুরবিশিষ্ট পদ ও চরণ মানসীতে অনেক আছে। এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধের শেষ হইবে না। সে যাহা হউক, আমি বলিতে চাহি যে, কবির এই মোহমন্ত্রময় শব্দবিন্যাস এবং অপূর্ব্ব ছন্দ-সৌন্দর্য্য রসবিকাশে এবং ভাবপ্রকাশে তাঁহাকে অতুল ক্ষমতা দিয়াছে। ইহার দ্বারা সকল ভাব, সকল রসই বেশ পূর্ণ পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। বিশাল সমুচ্চ বা সুগভীর ভাব—মনের ভাষা যেখানে পৌঁছিতে পারে না—অতি সূক্ষ্ম কোমল মৃদুভাব—কথায় যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী কল্পনার সেই লাজময়ী কুসুমসুকুমার মূর্ত্তি—ভাষার রূঢ় স্পর্শে যাহা মলিন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই সকলই কি চমৎকার, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দররূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। কখন কখন তাঁহার একটি সমগ্র কবিতা এইরূপ একটি ভাবেই পরিপূর্ণ। অথচ তিনি উচ্চ প্রতিভাবলে তাহাদিগকে এমনি কবিত্বময় অথচ পরিচিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একদিকে যেমন ভাবের নৈসর্গিক গৌরব এবং সুষমা রক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে পাঠকের হৃদয়ে তাহারা শৈশব সুহৃদের ন্যায় অতি সহজে প্রবেশ লাভ করে। তাহাতে অপ্রাঞ্জল কিছুই নাই—জটিলতার নাম গন্ধ নাই। মানসীতে এমন অনেক কবিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম এবং শেষ কবিতা দুইটির উল্লেখ করিলাম। “উপহারে” যদিও ছন্দের মোহ বা অপূর্ব্বতা কিছুই নাই, তবু কি সুন্দর সরল ভাব ও ভাষায় কবির

সমস্ত জীবন-কাহিনী ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। সে চিত্র যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য। কবির প্রাণের সেই দুর্দ্দমনীয় সৌন্দর্য্য-পিপাসা, সৌন্দর্য্যকে ধরিবার নিমিত্ত সেই জন্মান্তরীণ আকুলতা, কি অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যকে কে কবে আয়ত্ত করিয়াছে, আয়ত্ত করিয়াই বা কে তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। মনে করি এই বুঝি পাইলাম, পলক না ফেলিতে কই কোথায় আবার উড়িয়া গেল—'আঁখি পালটিতে নাহি পরতীতে যেন দরিদ্রের হেম'—এক যায়, আবার শত শত আসিয়া জীবনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে—প্রাণের ভিতর চির-চঞ্চলতা, সুচির অশান্তি আনিয়া দেয়। দুইটি কথায় ইহার কি সুন্দর ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে—"রচি শুধু অসীমের সীমা" এই কয়টি কথায় কবি-জীবনের সমস্ত উন্মত্ত আশা, প্রাণ-ভরা স্বপ্ন, হৃদয়-ভরা আবেগ এবং পৃথিবী-ভরা ব্যথা কি উক্ত হয় নাই?

গ্রন্থের শেষ কবিতাটিতে প্রেমিকের জীবনরহস্য তেমনি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম ইহার ভিতর উক্ত হইয়াছে। প্রেমিকের সকল কার্য্য এবং সকল চিন্তার, সকল আশা এবং সকল কল্পনার ভিতর যে প্রিয়জনের মধুর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার অনন্ত বিশাল হৃদয়াকাশ যে প্রিয়জনের সেই ক্ষুদ্র সুন্দর মুখচন্দ্রমার অসীম জ্যোৎস্নায় চির আলোকিত, তিনি তাহার কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন,—

নাহি সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্ব ভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে'।

নিম্নলিখিত কয়টি ছত্রে পুরুষের কল্পনাময় idealising প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মধুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে,—

আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোন খানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন শুধু স্মৃতি তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।

এই সকলের উপর আবার কি মধুর সুমিষ্ট ছন্দ। সাদাসিধা সহজ কথা, সরল অথচ মধুময় গাঢ় প্রাণভাসান সুর। কোনও কল্ কৌশল নাই, ভাষা বা ছন্দের কোনও কৃত্রিমতা বা জটিলতা নাই, আমাদের ঘরের বাঙ্গলা, অথচ কি স্বর্গীয় রাগিণী। যেন শারদ জ্যোৎস্নার শুভ্র সরল আকুল হৃদয়ে শেফালিকা তাহার শুভ্র সরল আকুল প্রাণখানি নীরবে খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু বিষয় ও ভাবের অভিনব ও প্রগাঢ় মাধুর্য্যে, এবং ছন্দেরও অভিনব অপার্থিব সুষমায়, 'বর্ষার দিনে' নামক কবিতাটি রবি বাবুর অসাধারণ শক্তির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। তাঁহার অপর সকল কবিতা হইতে, এবং তাহা হইলেই বঙ্গ সাহিত্যের অপর সকল কবিতা হইতে ইহা পৃথক, এবং বিশেষ আসন পাইবার উপযুক্ত। ইহার মত দ্বিতীয় কবিতা তিনি বা অপর কোন্ বঙ্গ কবি

লিখিয়াছেন? বাঙ্গলা ভাষায় বা ছন্দে যে এমন মোহিনী আছে বা থাকিতে পারে, তাহা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, তিনি কেবল তাঁহার সুন্দর প্রতিভাবলে আমাদের এই 'একঘেয়ে' ভাষায় অভিনব শক্তি দিয়াছেন, বা তাহার প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই কবিতাটি সহস্রবার পাঠে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অপর কোনও ভাষায় এরূপ সুন্দর ছন্দ রচিত হইতে পারে না, অপর কোনও ভাষায় ইহার উপযুক্ত উপাদান নাই। আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষাতেই কেবল ইহা সম্ভবপর। জানি না, অপর কোন্ ভাষাতে এমন কোন্ কবিতা আছে, যাহাতে সমগ্র বর্ষার ঘনঘোর জীবনের সমস্ত বুকভরা ব্যথা এমন অনির্ব্বচনীয় মনোহর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ষার মেঘরুদ্ধ হৃদয় যেন এই কবিতার কাতর ছন্দে বিদীর্ণ হইয়াও হইতেছে না। ইহার প্রত্যেক কথার অন্তরালে প্রাবৃটের চির সন্ধ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং মানবজীবনের অনিবার্য্য বিষাদ, সেই সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে জড়িত রহিয়াছে। এ দিকে কি সুন্দর অথচ সহজ ভাব ইহার প্রাণের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। যে সকল কবি বা কল্পনাব্যবসায়ী মানবজীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রান্তভাগ বা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট প্রদেশের অপরূপ শোভাবর্ণনে পটু—Poe, Baudelair বা Hawthorne—তাঁহাদেরও কবিতা বা রচনার ভিতর এমন কোন অপার রহস্যময় গোধূলির ছায়া দেখি নাই, এমন পবিত্র অপার্থিব বিষাদ দেখি নাই। ইহার সুন্দর ছন্দের কাতর মন্থর

গতিতে সন্ধ্যার হৃদয়ধ্বনি অনুভূত হয়, এবং তাহার আলুলায়িত কেশের শিথিল অন্ধকার উহার প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

মানসীর উত্তরার্দ্ধে মিত্রাক্ষর পয়ারে যে সকল কবিতা আছে (মেঘদূত, অহল্যা-বিদায়) তাহাদেরও ঠিক এইরূপই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই সকল কবিতায় রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গলা পয়ারকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, তিনি তাহাকে অভিনব জীবন প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত তাঁহার নিজের সামগ্রী। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বঙ্গীয় কবি এইরূপে পয়ার রচনা করেন নাই। তাঁহার হস্তে ইহা এক অপূর্ব্ব জীবন্ত দর্পিত গতি লাভ করিয়াছে। কবিতার তীব্র স্রোতে একটি চরণ কেমন আর একটির উপর তরঙ্গায়িত হইয়া উছলিয়া পড়িয়াছে! চরণের উপর চরণের এইরূপ উচ্ছ্বাসকে ফরাসী ভাষায় আঁজাবমাঁ (enjambement) বলে। বাঙ্গলায় যেমন এই চতুর্দ্দশমাত্রাত্মক পয়ার, ইংরাজীতে সেইরূপ আয়াম্বিক পেণ্টামিটার (Iambic Pentameter) এবং ফরাসী ভাষায় আলেকজাঁদ্রিন্ (Alexandrine)। এই তিন ভাষাতে এই তিন অতি প্রাচীন এবং সাধারণ ছন্দ, এবং তিন ভাষাতেই এই তিন ছন্দের প্রতি চরণের অন্তে যতি স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। আধুনিক কালে ভিক্টর হুগো আলেকজাঁদ্রিন্‌এর এই নিয়মের নিগড় খুলিয়া দিয়া সাহিত্যসমাজে মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফরাসী ভাষায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দ না থাকিলেও এই শৃঙ্খলমুক্ত আলেকজাঁন্ড্রিন্ সর্ব্বতোভাবে ইংরাজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাধীনতা, সৌন্দর্য্য এবং বাক্পটুতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ভিক্টর হুগোর বহু পূর্ব্বে এই আঁজাবমাঁ কখন কখন ব্যবহৃত হইত। রবীন্দ্র বাবুই কিন্তু এই প্রথমে বাঙ্গলা মিত্র পয়ারের পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলেন, এবং তাহাতে যে বাঙ্গলা সাহিত্যের বল এবং সৌন্দর্য্য কতদূর বর্দ্ধিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রতিভার বিক্রম। ইঁহার এই মিত্রাক্ষর পয়ার পড়িয়া ইংরাজী পেণ্টামিটারএর শীর্ষস্থানীয় শেলির এপিসাইকিডিয়ন (Epipsychidion) মনে পড়ে। ইংরেজী সাহিত্যেও উচ্চ শ্রেণীর কবি ভিন্ন মধ্য বা নিকৃষ্ট কবিদিগের লেখায় এরূপ পয়ার দেখিতে পাইবে না। পোপ (Pope) বা ড্রাইডেন (Dryden)এ ইহা নাই, কিন্তু শেলি এবং কীট্স্এ ইহা বহুল পরিমাণে দেখিবে। বাঙ্গলা যদি ফ্রান্স হইত, তাহা হইলে আজ রবীন্দ্র বাবু সাহিত্য-জগতে ভিক্টর হুগোর ন্যায় পূজা পাইতেন—তাহা হইলে তাঁহার এই অভিনব দৃপ্ত সুন্দর আবিষ্ক্রিয়ার জন্য দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে কচিৎ আমাদের ন্যায় দুই এক জন পাঠকের মৃদুকোমল প্রশংসার পরিবর্ত্তে সহস্র রসজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ কণ্ঠের উচ্চ জয় রোলে বাঙ্গলা ব্যস্ত হইয়া উঠিত।

আমি দেখিতেছি ভারি বিপদে পড়িলাম, এত দিক্ হইতে মানসীর কবিতা সমূহের এত প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, এক দিকের কথা বলিতে গেলেই অপর সহস্র দিক পড়িয়া

থাকে। এই এক ছন্দের কথা বলিতে গিয়া, আমি অন্যান্য নানা কথা ভুলিয়া যাইতেছি। উপরি-উক্ত অহল্যা নামক কবিতা এমন বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ—ইহার ভিতর জড়-জগতের সহিত এমন একটি অসীম ধাতুগত সহানুভূতি রহিয়াছে যে, বোধ হয় যেন, Walt Whitmanএর সৃষ্টি বিশাল প্রাণ Shelleyর অমর বীণা লইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। যে সকল অন্ধ এবং বধির পাঠক রবি বাবুকে তাঁহার সেই অপোগণ্ড কালের কবিতাসমূহের মধ্যেই চিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই অহল্যার প্রকাণ্ড কল্পনার পরিচয় লইতে বলি। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে অহল্যার সেই "নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অৰ্দ্ধ জাগরণের" বিশাল চিত্র কি স্থান পাইবে? তাঁহার কি উদার মহত্ত্ব এবং মাধুর্য্যপূর্ণ ভাষা! কি স্নেহপ্রীতিময়ী কল্পনা—উষার ন্যায় সরল শুভ্র আলোকময়ী দৃষ্টি। তাঁহার কবিহৃদয়ের বিশ্ব-ব্যাপিনী করুণা—এ সকলের আদর না দেখিলে মর্ম্মে মরিয়া যাইতে হয়।

মানসীর 'বিদায়' নামক কবিতার পূর্ব্বার্দ্ধে বিদায়মান দিবসের বিষণ্ণ আলোক জড়িত রহিয়াছে, অপরার্দ্ধে সন্ধ্যার শিথিল হৃদয়ের আকুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। শেষ কয়েকটি চরণে আকাশ, সাগর এবং সাগর-তীরের উল্লেখে বোধ হয়, যেন কোন সুদূর অপরিচিত দেশে কোন সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের ভিতর সন্ধ্যার বিশাল বিজনতার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ভাসিতেছি,—মাথার উপর সন্ধ্যাতারা কেবল তাহার শুভ্র বিমল দীপ্তি বর্ষণ করিতেছে। জীবনের একটি ক্ষণিক বিদায়ের বিরহ-বিষাদে থাকিয়া, কবি

প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে মহাবিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন। এ বিরহ প্রেমিকের বিরহ এবং কবির বিরহ। ইহারই অধীনে প্রেমিক কবি দেখিয়াছিলেন, "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।" তাই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া কবি বলিতেছেন,

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্
দূর পরিচিত তীর হ'তে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে।

এবং বিশ্বচরাচরের সুন্দর উদার বিষণ্ণ পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায়-গ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড়-জগতের অব্যক্ত মায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির কোন মহান্ বিশাল রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছি, যেন উদার বিস্তৃত সাগর বক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত করিতেছি,—যেন সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান ক্লান্ত

ম্লান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছে, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহারাজ্য খুলিয়া গিয়া, কোথা হইতে এক মহান্ অথচ নিরুদ্দেশ উদ্দেশ্য আসিয়া প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এইবার দেখিতেছি আমার কায ভারি কঠিন হইয়া উঠিল, এইবার আমি মানসীর প্রেম-কবিতাগুলির উল্লেখ করিব। কিন্তু আমার দরিদ্র ভাষায় তাহাদের উপযুক্ত প্রশংসা অসম্ভব। আমি নিজেই বুঝিতেছি, আমার সেরূপ বাক্যবিভব নাই, যাহাতে তাহাদের সহস্র গুণের এক অংশও প্রকাশ করিতে পারি। তাহাদের ভাব যেমন গভীর, অকপট ও মধুর, তাহাদের ভাষা ও ছন্দ সেইরূপ সরল, মধুর এবং গভীর রাগিণীতে বাঁধা। মানব-প্রেমের অসীমতা এবং অনন্ত গভীরতা মানসীর কবি যেমন অনুভব করিয়াছেন, এবং ভাষা ও ছন্দে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর খুব অল্প কবিই তাহা পারিয়াছেন। সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দৌরাত্ম্য একটু বাড়াবাড়ি। আমাদের দেশে ত কথাই নাই। এখানে বাগ্দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের ষোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু সুস্থ সুন্দর সরল কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কয়টি কবিতা আছে? বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তাঁহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই। তাঁহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ়

অনুভবশক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভিতর অপ্রাকৃত কিছুই নাই, সেই জন্য একঘেয়ে হইলেও তাহারা চিরজীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক্ হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের মরুময় নিকৃষ্ট লালসায় জর্জ্জরিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অহংভাবে স্ফীত বা বর্দ্ধিতদেহ। তাহাদের ভিতর 'ছিব্‌লেমি' চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানবহৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাস আছে। মানবজীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তাহারা জীবিত উন্মত্ত আকুল। বাস্তবিক মানুষের সমুদয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা, তেমনই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেমকবিতার শ্রেষ্ঠতা। সর্ব্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই ইহার চরম সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। ইংরেজ কবিদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বে একা Shakespeareই যেমন অপরাপর সকল বিষয়ে, সেইরূপ এ বিষয়েও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তার পর এই বর্ত্তমান শতাব্দীতেই আমরা যাহা কিছু উচ্চদরের প্রেম-কবিতা দেখিতে পাই। রবীন্দ্র বাবুর কিন্তু শৈশব হইতেই প্রেম-কবিতায় অদ্ভুত অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহার রচিত প্রায় সকল প্রেম-কবিতাগুলিই সর্ব্বতোভাবে সুন্দর, সেই

ছেলেবেলার "বলি ও আমার গোলাপবালা" হইতে আজিকার এই মানসীর "আমার সুখ" পর্য্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁত নাই। রবি বাবুর কবিতাসমূহের ভিতর তাহারা বসন্তপ্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকের ন্যায় বা বিমল নৈশ আকাশে প্রস্ফুট-শ্রী তারকাপুঞ্জের ন্যায় "উজ্জ্বল মধুর" শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। আবার তাহাদের মধ্যে দু একটির তুলনা নাই। একটির উল্লেখ করি,—"আজু সখি মুহু"।* বাঙ্গলা, ইংরেজী বা ফরাসী সাহিত্যে মিলন এবং উপভোগের এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত কেহ কখন শুনে নাই। ইহার উপযুক্ত প্রশংসা আমার ক্ষমতার বাহিরে। ইহাতে সমস্ত বসন্তের কুসুম-সুষমা, শারদ জ্যোৎস্নার সমস্ত মোহ, এবং মলয়সমীরণের সমস্ত উন্মাদনা বর্ত্তমান। ইহা পাঠে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর একটি অতি সুন্দর প্রেমকবিতা মনে পড়ে। Maudএর ভিতর বিরহ-বিধুর প্রেমের সেই মধুর অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষাময় আহ্বানসঙ্গীত, এই মিলন সঙ্গীতের যথার্থ দোসর।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং জ্বালা—উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিষাদ, কি সুন্দর ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে। ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় সুমধুর,—বাঙ্গলা ভাষায় তাহাদের তুলনা কোথায়? "বিরহানন্দ", "ক্ষণিক মিলন" প্রভৃতির ছন্দ, কবি দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম

* ভানু সিংহের কবিতা দেখ।

দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত। তাহাদের কি সুমিষ্ট ঝঙ্কার—কি সুন্দর গুঞ্জন—প্রতি শ্লোকের শেষ ভাগে মাত্রা এবং মিলনের কি অপূর্ব্ব ছটা। কিন্তু এ সকল কবিতারও মধ্যে মিথ্যা কিছুই নাই, চটুল ছিব্‌লেমি বা ন্যাকামি নাই—প্রেমহীন বিরহের হা হুতাশ নাই, "আন্ ছুরি" "খাই বিষ" নাই। এখানে কোকিল অভিসম্পাত বা নির্ব্বাসনের ভয় না রাখিয়া তাহার আনন্দবিকশিত কণ্ঠস্বরে ডাকিতেছে, এবং জ্যোৎস্নাও দাহিকা শক্তি অর্জ্জন করিতে শিখে নাই। এখানেও কবির নিজ হৃদয় সত্য এবং স্বভাবের চিরসুস্থতার ভিতর আছে বলিয়াই আর সকলই প্রকৃতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Byron-দিগের বোধ হয় ইহা ভাল লাগিবে না।

গ্রন্থের শেষের দিকে কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব জীবনের প্রেম। ইহাতে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। এ প্রেম জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বা পরিচ্ছেদ নয়—সমস্ত মানবজীবনই এই প্রেমের। যেখানে এ প্রেম নাই, সেখানে মানবজীবনের পূর্ণতাও নাই। সূর্য্যালোকে যেমন দিবসের শূন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এ প্রেমও সেইরূপ মানবহৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। ইহাতে সঙ্কীর্ণ হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উদ্যমে জাগ্রত হয়। এক কথায় ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েরই মুক্তি সাধন করে।

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্ব্বদিকের কবিতাগুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাহাদের মাধুর্য্য মদিরতামিশ্রিত, তাই পাঠককে ক্রমশঃ ক্লান্ত করিয়া আনে। অপরার্দ্ধের কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য্য-উপভোগে প্রাণ উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। প্রথমার্দ্ধ বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ব্যস্ত, অপরার্দ্ধ সাগরোর্ম্মির মধুর, উদার নির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে।

এই সকল কবিতা আবার কলা-কৌশলে ইউরোপীয় প্রধান কবিদিগের রচনা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, কিন্তু ভাবের ঔদার্য্যে এবং রসের গভীরতায় তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় হৃদয়েও প্রেমের এতদুর মৌলিকতা এবং গভীরতা নাই, সুতরাং ইউরোপে এরূপ কবিতা এখনও জন্মে নাই। কই আমি ত ইংরেজী বা ফরাসী কবিদিগের গ্রন্থাবলীর ভিতর "পূর্ব্বকালে" বা "অনন্ত প্রেম" প্রভৃতির ন্যায় কবিতা দেখি নাই। এই দুইটি কবিতারই মর্ম্মকথা—যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে কি সবে এই মাত্র এই জন্মে ভাল বাসিলাম? আমার হৃদয়ে এই যে প্রেমের প্রগাঢ়, দুরন্ত, নিবিড় অনুভব, ইহা কি আজিকার? এই বিশ্ববিলোপী প্রেমের স্রোত কি একদিনে জন্মিয়াছে, না অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে? আমরা যে আজ উভয়ের প্রেমে আত্মহারা, ইহার

কি পূর্ব্বাপর নাই? সুদূর অতীতে আমাদের মত যাহারা ভাল বাসিয়াছিল, তাহাদের সেই মহান্ অনুভবের ভিতর কি আমরা ছিলাম না? এবং ভবিষ্যতে কি এই মহান্ অনুভব নিবিয়া যাইবে? সকল প্রেমিকের মাঝে আমরা ছিলাম, আছি, এবং থাকিব। বর্ত্তমানে নিখিল জগতের সমস্ত প্রেম আমাদের দুই জনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। Walt Whitmanএ এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু Walt Whitman মার্কিনদেশীয়, এবং অনেকটা প্রাচ্য ভাবে দীক্ষিত।

"ধ্যান" নামক কবিতাটির সুন্দর ভাব কেবলমাত্র আমাদেরই দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও, অনুভবের গভীরতায় Hugo বা Shelleyর শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান।

"তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
উদয় শিখরে সূর্য্যের মত
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়ন সম;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার;
আমি যেন এই অসীম পাথার,

আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার।"

কৈ Hugo বা Shelleyর ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই।

মানসীতে এখনও নানাবিষয়ক কত কবিতা আছে যাহাদের এ পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। তাহাদের ভিতর অনেকগুলিই উপরে সমালোচিত কবিতা সমূহের ন্যায় সুন্দর। যে কবিতার ভিতর এমন অতুলনীয় শ্লোক আছে, তাহার সম্যক্ প্রশংসা করিতে গেলে "ভাষা" "মৌন" হইয়া পড়ে।

"আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভাল, থাক্ তাই, তার বেশি কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙ্গে যায় পাছে!
এত মৃদু এত আধো, অশ্রুজলে বাধো বাধো
সরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে?
কথায় বোলোনা তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে!"

যে সকল পাঠক মানসীর অপর কোন অংশ বুঝিতে বা তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও "নব বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপের" রহস্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। "নিষ্ফল

উপহারের” বাঁধাবাঁধি ছন্দ, নিয়ন্ত্রিত রচনা, এবং ভাবের শাসন, বঙ্গ সাহিত্যে অদ্বিতীয়। “দুরন্ত আশার” তীব্র দুরন্ত কশাঘাতে বাঙ্গালী ভিন্ন অপর সকল জাতির মনে লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহাতে যে বেদুইনের বর্ণনা আছে, তাহা কোন্ শ্রেষ্ঠ কবির না উপযুক্ত? “শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান”—ওমর খায়্যমের যোগ্য—সহসা শুনিলে তাঁহারই কথা বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার পরের দুইটি কবিতা যদি আমাদিগের বঙ্গবীরেরা প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝি এক দিন ভারত উদ্ধারের পথ হইতে পারে। “সুরদাসের প্রার্থনায়” সৌন্দর্য্য-বিধুর প্রেমবিহ্বল কবিহৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একটিমাত্র কবিতারচনার দ্বারা অনেকেই প্রভূত কবি-যশ অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু রবি বাবুর অক্ষয় ভাণ্ডারে ইহা একটি সামান্য ক্ষুদ্র রত্ন। ইহাতে তিনি হৃদয়-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এমন হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, যেন Browning ও Shelley একত্র মিলিত হইয়াছে। ইহার উপান্ত Stanzaর সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা একবার মাত্র পাঠে মনে চিরকাল রহিয়া যায়। কেমন অল্প কথায়, উজ্জ্বল উপমার গুণে, “ভীষণ মধুরের” প্রদীপ্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে :—

“উজ্জ্বল যেন দেব রোষানল,
উদ্যত যেন বাজ।”

দুইটি বন্ধুকে লিখিত দু'খানি পত্রের ভিতর বন্ধুহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা কবিতার স্রোতের সঙ্গে কেমন সুন্দর মিলিয়া মিশিয়া

গিয়াছে। ইহাদেরও ভিতর স্বভাববর্ণনে কবির স্বাভাবিক মোহমন্ত্র পরিস্ফুট ;—

"যেনরে সরম টুটে' কুমুদ আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করেনা আকুল !"

এই কয়টি কথায় যেন ভরা শ্রাবণের মেঘ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোক ও ছায়া, সৌরভ এবং শ্যামকান্তি প্রাণে আসিয়া পড়ে।

"নারীর উক্তি" এবং "পুরুষের উক্তি" ভাল হইলেও আদর্শের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমটির আরম্ভ অবিকল Browningএর মত হইলেও, পরে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browningএর কথার ধারই ইহাতে নাই, এবং ইহার ভিতর মানবজীবনের কোন রহস্য উদ্ভাবিত হয় নাই। "পুরুষের উক্তি"তে কিন্তু একটি বেশ গভীর সত্য প্রকটিত হইয়াছে।

"কেন তুমি মূর্ত্তি হ'য়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার !
সেই মায়া-উপবন, কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার !"

তাই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসীম সুন্দর গদ্য কাব্যের নায়িকা নায়কের সহিত কেবল মাত্র এক রাত্রি প্রেম-সম্ভোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া বলিয়াছেন ;—"তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সঞ্চালন

করিবে। আমি তোমার চির-বাঞ্ছিত হইয়া রহিব। তোমার লুব্ধ কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য অনুদিন উৎসুক থাকিবে।"—(Mademoiselle de Maupin)। "শূন্য গৃহে" এবং "জীবন মধ্যাহ্ন" দুইটিই আমাকে বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত শ্লোকের করুণ রস কি সরল সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইয়াছে ("কাল ছিল প্রাণ যুড়ে...হেন বজ্রপাত" ৭৬ পৃঃ) "তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে লাগে"—সৌন্দর্য্যে ইহা Tennysonএর "Star to star vibrates light"এর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। "জীবন মধ্যাহ্নের" ন্যায় দ্বিতীয় কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় দেখি নাই। ইহা সুন্দর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ, এবং পূর্ণ প্রাণের উক্তি। ইহাতে কোনরূপ ভান বা আড়ম্বর, কোনরূপ ভঙ্গী বা ভেঙ্গান নাই। হৃদয়ের যথার্থ ভাবই যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক একটি উপমা অতি মনোহর :—

"লজ্জা বস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।"

"——শস্যশীর্ষরাশি

ধরার অঞ্চলতল ভরি',—"

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ করিব।

"নিষ্ফল কামনা" একটি নিতান্ত অভিনব পদার্থ। আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্র ছন্দে এমন কবিতা রচিত হইতে পারে না। মিলের অভাবে তাহা নিতান্ত শোভাহীন

ও শুনিতে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে। কিন্তু রবি বাবু দেখাইলেন যে, এইরূপ মাত্রাবিভাগে বেশ সুন্দর অমিত্র ছন্দ রচিত হইতে পারে।

"উচ্ছৃঙ্খল" নামক কবিতাটির ভিতর কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি কারুণ্যপূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলের কি নূতন, কি পরিপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার ভাবে কি গভীরতা! ছন্দে কি আকুলতা! ভাষায় কি তরঙ্গ! এমন সুন্দর কবিতা কখন পড়ি নাই। ইহার ভাষা ও ছন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিদিগের ভাষা ও ছন্দের ন্যায় উন্মুক্ত এবং উদার। Shelley বা Swinburneএর ইংরাজী, Hugo বা Leconte de Lishএর ফরাসী, ভবভূতি বা জয়দেবের সংস্কৃত ইহা অপেক্ষা কোন অংশে বেশী গৌরবান্বিত নহে। কেহ যদি ইহাকে নিতান্ত অন্যায় প্রশংসা বিবেচনা করেন তাঁহার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি যেন উপরি-উক্ত কবিদিগের গ্রন্থাবলী হইতে শ্রেষ্ঠতর রচনা আমাকে দেখাইয়া দেন।

উপসংহারে কি বলিতে হইবে যে, মানসীর কবিতাগুলি ভাবপ্রধান না বস্তুপ্রধান? তাহারা কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এবং তাহাদের ভিতর কবি কি গুপ্ততত্ত্ব নিহিত করিয়াছেন? অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, আমরা এ সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, সৌন্দর্য্য-অনুভবে তাহাদের জন্ম, এবং সুন্দর অভিব্যক্তিতে তাহাদের বিকাশ। যেখানে এই দুইটি আছে,

সেখানে অপর সকলই আছে বা আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। কাব্যসম্বন্ধে—আর কেবলই কাব্যসম্বন্ধে কেন?—সমস্ত কলাবিদ্যা-সম্বন্ধে প্রথম এবং শেষ কথা এই যে, সমালোচ্য বিষয়টি সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক কি না? যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ থাকে, তবে অপর হাজার কেন অভাব তাহার থাকুক না, তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না—তাহাতে তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে; কিন্তু হাজার অপর গুণের আধার হইয়াও যদি তাহাতে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা একেবারে অপদার্থ। তাহার নিজ উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হয় নাই। পৃথিবীতে তাহার স্থান বা প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু রসাস্বাদনশক্তি আছে, তাহাতে আমি নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, মানসীতে সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ইহার জাতি বা সম্প্রদায় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন দেখি না। ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের এই এক অসাধারণ গুণ যে, তাহার সহিত কাহার কোন বিবাদ বিসম্বাদ থাকিতে পারে না, সকল শ্রেণীর লোক তথায় স্থান পাইতে পারে। তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিয়া, সকল সম্প্রদায় তাহার উদার সৌন্দর্য্যের অসীমতার ভিতর মিলিত হইতে পারে। সে কবিতা বিষয় অনুসারে বস্তুগত বা ভাবগত। তাহার সৌন্দর্য্য যেমন অনুভবে, তেমনি অভিব্যক্তিতে,—যেমন কল্পনায়, তেমনি রচনায়—যেমন অন্তর্দৃষ্টিতে, তেমনি বহির্দৃষ্টিতে। তাহা যেমন জপিবার, তেমনি মাতিবার এবং মাতাইবার।

মানসী

মানসীর ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাঠে হৃদয় তাহার অন্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়ে—সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়—ব্যাকুল প্রাণ জগতের মাঝখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিয়া জগৎসংসারের মাঝে সংসার রচনা করে, এবং সমস্ত মানবহৃদয়ের সহিত মিলিত হয়। আবার এমনও কথা আছে যে, হৃদয় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুরমধ্যে সেই একই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। বিশ্ব তখন বিলুপ্ত—জগৎ—শূন্য। প্রাণ—প্রাণেরই ভিতর প্রবিষ্ট ও আপনাতে আপনিই বিভোর। এইরূপে মানসীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য্য, উচ্চতম কবিত্ব, এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা "শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ", বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু।

চিত্রাঙ্গদা

বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যসেবী এবং প্রথম শ্রেণীর সমালোচক-আচার্য্য জর্জ্জ সেণ্টসৃবরী আজ কয়েক বৎসর হইল, "Revised Impressions" (পুনরালোচিত বা সংশোধিত ধারণা) নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাশালী লেখকদিগের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের প্রথম ধারণা এবং পূর্ব্বতন মতসমূহের আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যসেবিমাত্রই জানেন, কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পাঠকালেই একেবারে চিত্তকে জয় করিয়া ফেলে, কিন্তু পরে তাহাদের প্রভাব ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আসে। আবার কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পরিচয়ে রসহীন বলিয়া বোধ হইলেও, উত্তরোত্তর পাঠে তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ তাহারা চিত্তের উপর স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করে।

Byronএর প্রথম "চটক" ইংরাজী-সাহিত্যে প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এদিকে Wordsworthএর সহিত আলাপ যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাঁহার কবিতাসমূহের গভীর এবং মর্ম্মগত সৌন্দর্য্য উপলব্ধ হয়।

এইরূপে দেখা যায়, অনেক গ্রন্থ সম্বন্ধেই আমাদের প্রথম ধারণা স্থায়ী হয় না। সম্প্রতি রবি বাবুর রচিত "চিত্রাঙ্গদা"

নামক কাব্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণার পুনরালোচনা করিতে হইয়াছে। প্রকাশ হইবার কালেই আমরা "চিত্রাঙ্গদা" পাঠ করি। সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার পরও কয়েকবার পাঠকালে ইহা আমাদের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রথমশ্রেণীর খণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রচনার উৎকর্ষে, ভাষাভঙ্গীর মৌলিকতায়, শব্দরচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে, মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতায়, নাট্যগুণে এবং সর্ব্বশেষে নিছক-কবিত্ব-রসে সাহিত্য সংসারে ইহাকে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত একটি ফুল। বলিয়াই জানিয়াছিলাম। কিন্তু গত জ্যৈষ্ঠমাসের "চিত্রাঙ্গদা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের লিখিত "কান্য পাত্র-নীতি" নামক প্রবন্ধে "চিত্রাঙ্গদা" সম্বন্ধে তাঁহার মত,—অর্জ্জুন করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্ব্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহার মতে, এই কাব্য "দুর্নীতিমূলক" এবং "অস্বাভাবিকতাপূর্ণ"। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিক বিস্মিত হইয়াছি, আমাদের পূর্ব্ব ধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত পাইয়াছে, এবং আমাদিগকে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে,—যে "দুর্নীতি" এবং "অস্বাভাবিকতা" দ্বিজেন্দ্রবাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই কেন? সম্ভবতঃ প্রথম পাঠকালে আমাদের নীতিজ্ঞান তত জাগ্রত ছিল না, এবং কবির রচনার মোহমন্ত্রে আমাদের বিচার-শক্তি অভিভূত বা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং "সাহিত্যে"র পাঠকবর্গের সহিত আমরা "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য পুনর্ব্বার পাঠ করিব, এবং তৎসম্বন্ধে

আমাদের পূর্ব্বধারণার এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

চিত্রাঙ্গদার কথা, কথার ভাণ্ডার মহাভারতে আছে। কথাটি অতি ক্ষুদ্র। মূল মহাভারতে ১৩টি মাত্র শ্লোকে আদ্যন্ত বর্ণিত। ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য নাই,—অভিনব পাত্র-পাত্রীর সৃষ্টি নাই, মানব-প্রকৃতির বা হৃদয়ের কোন তথ্য বা রহস্য ইহাতে দর্শিত হয় ʼ। বাস্তব ঘটনা যেমন ইতিহাসে সাদাসিধা ভাবে সচরাচর হইয়া থাকে, কথাটি সেইরূপেই লিখিত। "রাজতরঙ্গিণী"র ন্যায়ের ভিতর ইহা সন্নিবেশিত দেখিলে আমরা আশ্চর্য্য না।

রবিবাবুর উদ্ভাবনী অথচ সঙ্গত কল্পনা, আখ্যান-বস্তুটিকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। মহাভারতে যাহা কেবল-রেখা বা আভাস, তাহা তিনি ছন্দে এবং বর্ণে পরিস্ফুট রয়া তুলিয়াছেন।

মহাভারতের গল্পটি এই :—

অর্জ্জুন যখন মণিপুরে গমন করেন, তখন তথাকার রাজা ছিলেন চিত্রবাহন; চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার একটিমাত্র কন্যা ছিল। রাজার কোন অপুত্রক পূর্ব্বপুরুষ পুত্র-লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিলে, মহাদেব প্রীত হইয়া এই বর দেন যে, তাঁহার বংশে পুরুষানুক্রমে একটি করিয়া পুত্র জন্মিবে। কিন্তু চিত্রবাহনের পুত্র না হইয়া কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যাই বংশ-রক্ষা করিবে এই ভাবিয়া চিত্রবাহন তাহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করেন, এবং পুত্র

বলিয়া জ্ঞান করিতেন। চিত্রাঙ্গদা একদিন নগর-মধ্যে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজা অর্জ্জুনের পরিচয় পাইয়া অর্জ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরস-জাত পুত্র চিত্রবাহনের বংশধর হইবে। অর্জ্জুন তথায় তিন বৎসর কাল বাস করেন, এবং পুত্র জন্মিলে মণিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

এই সামান্য আখ্যান অবলম্বনে রবিবাবু তাঁহার "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্যমধ্যে আমরা দুইটি প্রধান পাত্র-পাত্রী দেখিতে পাই—এক অর্জ্জুন অপর চিত্রাঙ্গদা,—অর্জ্জুন মহাভারতকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাহার উপর রং ফলাইতে পারেন, এমন কবি বিরল। অর্জ্জুন-চরিত্রকে যদি কোন পরবর্ত্তী কবি স্পর্শ করিতে সাহস পান, তাহা হইলে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, সে চরিত্র কবি-সৃষ্টির তুঙ্গ-শৃঙ্গে অবস্থিত, তিনি যেন সেই উজ্জ্বল চরিত্রকে কোনরূপে মলিন না করেন। সুতরাং অর্জ্জুন-চরিত্র-অঙ্কনে বেদ-ব্যাসের উপর কিছু নূতনত্ব আনিতে হইলে তাহা অতি সন্তর্পণে করিতে হইবে,—ইহাতে বলা হইল না অর্জ্জুন-চরিত্র নির্দ্দোষ বা আদর্শ মানব-চরিত্র, অথবা বেদ-ব্যাস অর্জ্জুনকে আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, অর্জ্জুনের প্রকৃতি এমন বিচিত্র এবং বহু-মুখী—তাঁহার হৃদয়ের প্রবৃত্তি সকল এমন সবল ও জাগ্রত,—

তাঁহার চরিত্র এমন সঙ্কীর্ণতার সংস্পর্শশূন্য—ভাঁড়ামী ও ভীরুতা হইতে মুক্ত যে,তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র পাঠক তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিয়া, না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। এই কাব্যে রবিবাবু অর্জ্জুনকে সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ প্রেমিক করিয়া সাজাইয়াছেন, অথচ বেদব্যাস-সৃষ্ট অর্জ্জুনের মনুষ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বতোভাবে রবিবাবুর নূতন সৃষ্টি। মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কোন সুস্পষ্টমূর্ত্তি নাই। কোথাও কোন বিষয়ে তাহার কর্ত্তৃত্ব বা বিশেষত্ব দেখি না, এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর মধ্যেও যখন পুনর্ব্বার তাহার সাক্ষাৎ পাই, তখনও তাহার এই-রূপই নির্ব্বিশেষত্ব। মহাভারতকার যেন একতাল মাটির উপর "চিত্রাঙ্গদা" এই কয়টি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। রবিবাবু সেই মাটি লইয়া একটি জীবন্ত অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

A perfect woman nobly planned.

রবিবাবুর চিত্রাঙ্গদা কাব্য বুঝিতে হইলে, নায়িকার চরিত্রটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এ চরিত্রে কিন্তু জটিল কিছুই নাই—ইহা অত্যন্ত সরল এবং সহজে বোধগম্য। কিন্তু ইহার বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। সেই জন্য রবিবাবুর কাব্যের গল্প অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের কল্পনা পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি।

একা চ মম কন্যেয়ং কুলস্যোৎপাদনী ভৃশম্।
পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ ॥

চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে মূল মহাভারতের এই সামান্য ইঙ্গিত হইতে, এবং বোধ হয় কাশীরামদাসের "পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন" এই কয়টি কথার ছায়া অবলম্বন করিয়া, রবিবাবু একটি জীবন্ত, বাস্তব, অথচ অপূর্ব্ব পাত্রীর সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিক সাহিত্য-জগতে রবিবাবুর চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র একটি বিস্ময়কর অথচ সঙ্গত সুন্দর সৃষ্টি; মহাভারতে পুত্রবৎ পালিতা কন্যা রবিবাবুর কাব্যে একেবারে প্রকৃত যুবরাজ; যুবরাজের ন্যায় তাহার শিক্ষা—যুবরাজেরই ন্যায় তাহার কর্ম্মের পরিসর—যুবরাজেরই ন্যায় তাহার স্কন্ধে রাজ্যের কর্ত্তব্যভার। ফলতঃ চিত্রাঙ্গদা নারী হইলেও শিক্ষা এবং ব্যবহারে পুরুষ,—কবি চিত্রাঙ্গদার মুখেই এই কথা সুস্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস; নাহি জানি হাব ভাব,
বিলাস-চাতুরী; শিখিয়াছি ধনুর্ব্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।"

মণিপুরের বনচরদিগের মুখেও কবি অর্জ্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদা যে যুবরাজ—রাজ্যরক্ষক এবং শত্রুজিৎ এই পরিচয় দিয়াছেন। ভীত বনচরদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া অর্জ্জুন তাহাদের ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন,—

"উত্তর পর্ব্বত হ'তে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্ব্বত্য বন্যার
মত বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?

বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোন ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থ-পর্য্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণ ব্রত।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতা মাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্য্যে যুবরাজ।"

এবং রাজ্যরক্ষা-প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদা আত্মগোপন করিয়া নিজ মুখে যে আত্মপরিচয় দিয়াছে, তাহাতেও ঐ কথা,—

"চিত্রাঙ্গদা। কোন ভয় নাই প্রভু!
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি'।"

উপরের লিখিত বর্ণনা হইতে আমরা জানিলাম, রবিবাবুর "চিত্রাঙ্গদা" শিক্ষায় এবং কার্য্যে একেবারে পুরুষ; সে যে কেবল অন্তঃপুরবাসিনী নয়, এমন নহে। অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া যে

শিক্ষাগুণে স্ত্রীলোক লজ্জা এবং সঙ্কোচ অর্জ্জন করে, সে শিক্ষা তাহার একেবারে নাই—তাহার জীবনে বা চরিত্রে সে শিক্ষার ছায়াপাতও কখনও ঘটে নাই ; সুতরাং তাহার পক্ষে অন্তঃপুর-বাসিনীর লজ্জা-সঙ্কোচ অসম্ভব। স্ত্রীজনোচিত সামাজিক এবং পারিবারিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা এমন পাত্রী আমরা অপরাপর কবির সৃষ্টির মধ্যে ক্বচিৎ দেখিতে পাই। বঙ্কিম বাবুর 'কপাল-কুণ্ডলা' এবং Shakespeare রচিত Tempest নামক নাটকে Miranda (মিরেণ্ডা) চরিত্র পাঠকের মনে পড়িতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রবন্ধের স্থানান্তরে যথাসময়ে করা যাইবে।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা যে কেবল স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা, তাহা নয়, তাহার বিরুদ্ধ শিক্ষাই পাইয়াছিল,—পুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং তাহাও যে সে পুরুষের নয়—রাজা বা রাজ-পুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল। তাহাকে শিখিতে হইয়াছিল লোকশাসন করিতে—সমাজ এবং সাম্রাজ্যে নিজের বলবিক্রম প্রকাশ করিতে, দেশরক্ষা করিতে এবং যুদ্ধ করিতে। প্রকৃতি তাহাকে নারী করিয়া গড়িয়াছিল—শিক্ষা তাহাকে পুরুষ করিয়া তুলিয়াছিল।

কাব্যের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, এই চিত্রাঙ্গদা অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া বনপথে একটি জাগ্রত-পৌরুষ-দীপ্ত পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিল ; এই সাক্ষাতেই তাহার জীবনে আমূল বিপ্লব সংঘটিত হইল, এবং কাব্যে নাটকত্বেরও সূত্রপাত হইল। কবি

ইহার যে অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিরই সম্ভবপর ; তাহা যে কোনও প্রথম শ্রেণীর কবিরই যশঃ-প্রভা উজ্জ্বল করিতে পারে।

এই উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরূপ এবং কাব্যের আখ্যান গোড়া হইতেই আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিবার নিমিত্ত আমরা নিম্নে কাব্যের সেই অংশ বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম,—

"চিত্রাঙ্গদা। একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে, একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণানদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি' অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি'।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য অন্ধকার
লতাগুল্ম-গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছুদূর অগ্রসরি' দেখিনু সহসা
রুধিয়া সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে' যেতে,—নড়িল না, চাহিল না ফিরে'।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না ;—সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে

চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখ পানে,—রোষ দৃষ্টি
মিশাল পলকে ; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদু হাস্যরেখা
বুঝি সে বালক-মূর্ত্তি হেরিয়া আমার।
শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে' পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলেছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল-মূর্ত্তি-হেরি,'
সেই মুহূর্ত্তে'ই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্ত্তে'ই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।"

এ পুরুষ কে ?

সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু 'কে তুমি ?' শুনিনু উত্তর 'আমি
পার্থ, কুরুবংশধর'।

কিন্তু পার্থ হইলেও চিত্রাঙ্গদার তাহাতে কি ? চিত্রাঙ্গদা কি পার্থের কোন সংবাদ রাখে ? পার্থ চিত্রাঙ্গদার অশেষ ভক্তির পাত্র—মানসদেবতা। স্বপ্নেও যাহার দর্শন পাইবার আশা তাহার মনে একদিনও জাগে নাই, তাহাকে হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে পাইয়া চিত্রাঙ্গদা স্তম্ভিত—নির্ব্বাক !

"রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে' গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ ? আজন্মের বিস্ময় আমার।

শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্য-দুরাশায় কত দিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্দ্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্য্য বীর্য্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ সেই তাঁর
চরণের তলে!—

তাহার পর ঘটিল কি?

"কি ভাবিতেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি' গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি';
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার! ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমা-ভিক্ষা,— বর্ব্বরের মত
রহিলি দাঁড়ায়ে – হেলা করি' চলি' গেলা
বীর! বাঁচিতাম, সে মুহূর্ত্তে মরিতাম
যদি!—

উপরে উদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে কবি অতি বিশদ এবং সুন্দর ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, যে স্বভাববিরুদ্ধ—আরোপিত মিথ্যাজীবন চিত্রাঙ্গদার নৈসর্গিক প্রকৃত জীবনকে চাপিয়া রাখিয়াছিল,—জন্মলব্ধ জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক পথে চালিত করিয়াছিল—প্রেতের ন্যায় যে জীবন তাহাকে এতকাল পাইয়াছিল—আজ তাহা হইতে সে মুক্ত! আজ সে খাঁটী পুরুষকে সম্মুখে পাইয়া বুঝিল, সে নিজে ভেজাল—বুঝিল সে পুরুষ নয়—পুরুষ হইতেও পারে না। আজ সে নিজেকে জানিতে পারিল—জানিল সে নারী।

তার পর যে পুরুষ-দর্শনে তাহার আত্মজ্ঞান মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি যে সে পুরুষ নন। তিনি অর্জ্জুন—চিত্রাঙ্গদার 'আজন্মের বিস্ময়'—কল্পনারাজ্যের অধীশ্বর। এমন অবস্থায় অর্থাৎ যখন অর্জ্জুনের সাক্ষাৎলাভে চিত্রাঙ্গদা একাধারে প্রকৃত-পুরুষ এবং আদর্শ পুরুষকে দেখিতে পাইল, তখন যে তাহার সহসা-জাগ্রত চিত্তবৃত্তি সকল দুর্দ্দমনীয় এবং অপ্রতিহত বেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। স্বভাবের অমোঘ নিয়মেই ইহা ঘটিয়াছিল—পুরুষ হইলেও ঘটিত। কে তাহার কল্পনার বস্তুকে—স্বপ্নের ধনকে নিকটে পাইয়া উদাসীন থাকিতে পারে? এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চিত্রাঙ্গ পরদিন তাহার কপটপুরুষ-জীবনের ছলা-কলা পরিহার করি মিথ্যা হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করিয়া, নারীবে আপনাকে নারী বলিয়া ব্যক্ত করিয়া অরণ্যের শিবালয়ে অর্জ্জু

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইল, এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। মন্দিরের মধ্যে পরস্পরে কি কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কাব্যে লিখিত হয় নাই।

"চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভাল,
তার পরে কি কহিনু আমি, কি উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়োনা ভগবন্!
মাথায় পড়িল ভেঙ্গে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষ প্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে'
দুঃস্বপ্ন-বিহ্বল সম! শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্তশূল
'ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

অর্থাৎ, চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল, অর্জ্জুন তাহাতে সম্মত হইলেন না। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া চিত্রাঙ্গদা পার্ব্বতীর ন্যায় নিজের রূপের নিন্দা করিল, এবং অন্ততঃ একদিনের তরে অমানুষ রূপ পাইবার নিমিত্ত ঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল—যাহাতে তপোলব্ধ রূপের প্রভাবে র্জ্জুনের হৃদয় হরণ করিতে পারে। দেবতারা—মদন ও ন্ত তপে তুষ্ট হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে কেবলমাত্র একদিনের জন্য নয় সরকালস্থায়ী মানব-দুর্লভ রূপ প্রদান করিলেন। বসন্তদেব লেন,—

"শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা একবর্ষ ধরি'
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকাশ!

তাহাই হইল; এবং পরদিন চিত্রাঙ্গদা যখন নিজ অঙ্গে কুসুমবৎ সন্নদ্ধ সেই দেবদত্ত অপরূপ রূপের প্রথম বিকাশ, বনস্থিত সরসীর স্বচ্ছ জলে সুন্দর এবং স্বাভাবিক কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিল,—তাহার যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই স্বাভাবিক। প্রতিভাশালী কবির চতুর কল্পনা তাহাতে আবার অপূর্ব্ব নাটকত্ব আনিয়া দিয়াছে—সেই মুহূর্ত্তে তাহার সেই রূপ—সেই বিস্মিত কুতূহলী দৃষ্টি দেখিতেছিল, আর একজন—অর্জ্জুন। এই নাটকত্ব চিত্রের মাধুর্য্যে চন্দ্রকরে কুসুম-সৌরভের ন্যায়, নাতিতীক্ষ্ণ উন্মাদনা মিলিত করিয়াছে।

ইংরেজ কবি Milton রচিত Paradise Lost নামক মহাকাব্যের ৪র্থ সর্গে এইরূপ একটি চিত্র পাঠকের মনে পড়ে কি? সদ্যঃসৃষ্ট খৃষ্টীয় আদিমাতা ঈভ জলমধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে, শিশুর ন্যায় সরল-হৃদয়ে তাহাকে আর এক জন ভাবিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত আনন্দ-কৌতূহলের সহিত জলের নিকট আসিয়া একবার আনতদেহে সেই ছায়া-মূর্ত্তি দেখিতেছেন আবার পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছেন।

"As I bent down to look, just opposite
A shape within the watery gleam appeared
Bending to look on me. I started back,

It started back ; but pleased I soon returned
Pleased it returned as soon with
answering looks
Of sympathy and love"

এ চিত্রের সরলতা এবং মাধুর্য্য স্বর্গীয়। এরূপ আর একটি চিত্র পাঠক তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু বিবিধ-পার্থিব-জ্ঞান-বিশিষ্টা তিলোত্তমায় স্বভাব-সরলতার আরোপে সে চিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পীড়িত কল্পনা তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

কিন্তু রবিবাবুর এ চিত্রে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছুই নাই। এ দেশে যদি এক জনও পটু চিত্রকর থাকিত, তাহা .লে এতদিন কবির এই ছন্দোময়ী কল্পনা পটে ভাষান্তরিত হইয়া কবি, চিত্রকর, এবং বঙ্গদেশকে কলা-জগতে চিরধন্য করিয়া রাখিত। পাঠককে মূলগ্রন্থে সেই অমৃতময়ী রচনার পরিচয় লইতে অনুরোধ করি,—নিম্নে আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

অর্জ্জুন। নিবিড় নির্জ্জন বনে নির্ম্মল সরসী ;—
সেথা তরু-অন্তরালে
অপরাহ্ণ বেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা ;
হেন কালে ঘন তরু-অন্ধকার হ'তে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল,
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে

কি অপূর্ব্ব রূপ! কোমল চরণ-তলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়েছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব্ব পর্ব্বতের
শুভ্রশিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি' বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি' ধীরে সরোবর-তীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি'। ক্ষণপরে মৃদু হাসি'
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর—প্রেমের করুণা মাখা।
নিরখিলা নত করি' শির, পরিস্ফুট
দেহ-তটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া, নব গৌর তনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে
পা দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা।—বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স
যাপিল নয়ন মুদি',—যে দিন প্রভাতে

প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণ পরে,
কি জানি কি দুঃখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হ'ল দুটি আঁখি, বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে' গেল;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি'
আঁধার রজনী পানে ধায় মৃদু পদে।

উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক দেখিলেন চিত্রাঙ্গদা এই অপূর্ব্ব রূপ লাভ করিয়া আনন্দিত নয় বরং দুঃখিত কিন্তু কিসের জন্য এত দুঃখ? ম্লান আঁখি কেন? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে আমরা চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিব।

পাঠক দেখিয়াছেন, অর্জ্জুনের প্রতি আশৈশব চিত্রাঙ্গদার কি সরল, কি প্রগাঢ়, কি উদার ভক্তি ও অনুরাগ। এ হেন ভক্তির পাত্রকে আয়ত্ত কর নিজের গুণে। তোমার ভক্তি তাহার স্নেহ আনিয়া দিক। তোমার প্রেম তাহার প্রেমকে জাগাইয়া তুলুক, এবং পরস্পরের হৃদয়াভিমুখী বৃত্তি সকল পরস্পরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধুক। তাহা হইলেই তোমার সেই অমূল্য পবিত্র ভক্তি এবং অনুরাগ সার্থক হইবে।

কিন্তু নিজ-হৃদয়ের পরিচয় দিবার অবসর চিত্রাঙ্গদার কোথায়? অশেষ গুণশালিনী হইয়াও অবসরের অভাবে চিত্রাঙ্গদা নিজের

৺..র দ্বারা অর্জ্জুনকে আয়ত্ত করিতে পারিল না, নিজের রূপের দ্বারাও নয়, তাই তাহাকে দেবতার নিকট রূপ ধার করিয়া ছলনা পূর্ব্বক অর্জ্জুনের হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই ছলনা-অবলম্বনই চিত্রাঙ্গদার জীবনের আলোককে নির্ব্বাপিত করিয়া তাহাকে গভীর দুঃখে নিমগ্ন করিল। উদার এবং মহৎ চরিত্রের পক্ষে কপটতাই সকল দুঃখের উপর দুঃখ—সকল লজ্জার উপর লজ্জা। এবং এ কপটতা আবার কাহার নিকট—যাহার নিকট কায়-মনঃ-প্রাণ-সর্ব্বস্ব অকপটে সমর্পণ করিতে প্রাণ চায়—সমর্পণ করাতেই পরিপূর্ণ সুখ। এ সম্বন্ধে কাব্যের নায়িকার উক্তির মধ্যে আমরা একাধারে মানবহৃদয়, বিজ্ঞান, উচ্চনীতি এবং প্রকৃত কবিত্ব দেখিতে পাই,—

> সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
> তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম
> অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
> সহায়তা। সঙ্গিরূপে থাকিতাম সাথে,
> রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
> রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
> জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
> পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
> ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত্তপরিত্রাণে
> সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।

একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে 'এ কোন বালক,
পূর্ব্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মত !'
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে ;
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথ-নয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি' ;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল !
আপনারে বারেক দেখাতে পারি যদি
নিশ্চয় সে দিবে ধরা !
হায় হায়
আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্য্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্ম-জন্মান্তের ব্রত।

চিত্রাঙ্গদার এই দৈব-প্রসাদ-লব্ধ অলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত। এবং অবিলম্বে অরণ্যের সেই শিব-মন্দিরে চিত্রাঙ্গদার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার প্রেমপ্রার্থী হইলেন। তথায় তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠে পাঠকের "কুমার-সম্ভবে"র পঞ্চম সর্গ মনে পড়িবে ;—

অর্জ্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন!—সুদর্শনে,
উদয়-শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি ; সপ্তদ্বীপ-মাঝে
যেখানে যা কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চখে ;
কি চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যাঁরে চাহি।

অর্জ্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়! কার যশোরাশি
অমর কাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন!
কহ নাম তার—শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর—

অর্জ্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায় ; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুর্লভ
সৌন্দর্য্য সম্পদে। কহ শুনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
কোন বীর, ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলে।

চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্ত্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী ?
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন মাঝে
রাজবংশচূড়া ?

অর্জ্জুন। কুরুবংশ !

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ ?

অর্জ্জুন। বল শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জ্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি'। ব্রহ্মচারি,
কেন এ অধৈর্য্য তব ?

অর্জ্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জ্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান্।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্য্য বীর্য্য তার,
মিথ্যা হোক্, সত্য হোক্ যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্য সম।

কিন্তু এবার চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া দিল। ইহার অর্থ কি? এই প্রত্যাখ্যান বাস্তব, না কেবলমাত্র ভাণ? প্রশ্নের উত্তর পাঠক চিত্রাঙ্গদার মুখে শুনিবেন,—

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ? ধিক্ পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কি আছে মোর, কি দেখেছ তুমি,
কি জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্ত্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জ্জুনেরে করিতেছ অনর্জ্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে, সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি' সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্য্যাদা! কোথায় রহিল প'ড়ে
নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার!
যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর! মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ব তোমার
দিও না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও!

পাঠক কি ইহার অর্থ বুঝিলেন? যে অর্জ্জুনকে পাইবার নিমিত্ত এত দেবপূজা প্রভৃতির আয়োজন, এত কঠোর তপস্যা, সে যখন পদপ্রান্তে, তখন তাহাকে এরূপে প্রত্যাখ্যান করার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? ইহা কি নারী-জাতির প্রবাদগত অব্যবস্থিতচিত্ততা? বা মুগ্ধ প্রেমিককে আরও দৃঢ়তর রূপে পাশ-বদ্ধ করিবার নিমিত্ত হৃদয়-হীনার নিষ্ঠুর ছলাকলা? যদি কোন পাঠক এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র কিছুই বুঝিলেন না। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, ইহা একটি মহৎ চরিত্রের অবস্থাবিশেষে স্বাভাবিক বিকাশ। আমরা ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছি, দেবতার নিকট প্রার্থিত রূপ পাইয়া আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক্, চিত্রাঙ্গদা কাঁদিয়াছিল। সে কি কখনও সেই রূপের ছলনার দ্বারা আরত্ত অর্জ্জুনের প্রেম সহসা গ্রহণ করিতে পারে? তাহার মহীয়সী প্রকৃতি কি এই দৈন্যে, এই হীনতায় এই ছলনার কার্য্যে হঠাৎ সম্মতি দিতে পারে? উপায়ের অনার্য্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহার মহৎ হৃদয় নিজেই যে ঠিক সেই কার্য্য-সিদ্ধির মুখেই নিজের উদ্দেশ্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা অনেক সময়ে প্রলুব্ধ হইয়া হীন উপায় অবলম্বনে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার আয়োজন করি। কিন্তু আমাদের প্রকৃতিতে কিঞ্চিন্মাত্র মহত্ত্ব থাকিলে যে মুহূর্ত্তে সেই উপায়-প্রয়োগের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপক্রম হয়, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয় স্বতঃ—**instinctively**—সে সাফল্য সে সিদ্ধির বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের মনও চায় না, হাতও

উঠে না। নিজের প্রকৃতিগত ঔদার্য্যের প্ররোচনায় চিত্রাঙ্গদার প্রথমে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে আরও জানিত, তাহার সে রূপ নিজের জন্মলব্ধ রূপ নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।—তাই সে যখন দেখিল, এই মিথ্যার পদে অর্জ্জুন আপনার শৌর্য্য, বীর্য্য—মহত্ত্ব উৎসর্গ করিতেছে, তখন সে নিজের হৃদয় দিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়কে বিচার করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সেই কারণেই এই প্রত্যাখ্যান। এবং চিত্রাঙ্গদার এই অকৃত্রিম সরলতা এবং মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য কবি এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু অর্জ্জুন যখন পুনর্ব্বার তাহার নিকট আসিয়া তাহার প্রেম যাচ্ঞা করিলেন, তখন অর্জ্জুনগতহৃদয়াকে পরাজিত হইতে হইল, এবং দুই জনে পরস্পরের প্রেম-বন্ধনে মিলিত হইলেন।

কিন্তু মিলিত হইয়াও মিলন পরিপূর্ণ হইল না। যতদিন তাহার সে দৈবরূপ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন চিত্রাঙ্গদা তাহার নিজের প্রকৃত পরিচয় অর্জ্জুনকে দেয় নাই। অর্জ্জুনের নিকট সে কেবল পরিপূর্ণ রূপ—এবং সৌন্দর্য্য—

> সে কেবল
> মেঘের স্বর্ণচ্ছটা, গন্ধ কুসুমের,
> তরঙ্গের গতি।

তাই অর্জ্জুনের প্রেমপিপাসা মিটে নাই, এবং তাঁহার ক্ষুব্ধ হৃদয় অপরিতৃপ্তির আকুল আর্ত্তনাদে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—

অর্জ্জুন।   তাহারে যে ভালবাসে
অভাগা সে! প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দ্দিনে।

সুতরাং অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে পাইয়াও পান নাই। তাঁহার হৃদয়ে চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে চির ঔৎসুক্য জাগ্রত রহিল। বিশেষতঃ পরস্পরের নিত্য সঙ্গ-লাভে চিত্রাঙ্গদার অশেষ গুণ, চরিত্রগৌরব এবং মানসিক সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে নিত্য নববেশে উন্মেষিত হইতে লাগিল। রূপজ আকর্ষণের উপর শ্রদ্ধা প্রীতি এবং মহৎ হৃদয়ের প্রতি মহৎ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত মর্য্যাদা, অর্জ্জুনের প্রেমকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিয়া তুলিল, তাঁহার অপরিতৃপ্ত হৃদয় চিরদিনই চিত্রাঙ্গদার প্রেম-পিপাসার মধুর অথচ তীব্র পীড়নে আকুল, সে হৃদয়ে প্রেমের মৌলিক রহস্য অক্ষুন্নভাবে নিত্য বর্ত্তমান।

অর্জ্জুন। কোন গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয় পরিজন?
নিত্য স্নেহ-সেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধাময় করে', যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা' দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়! প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোন নাম ধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?
তুমি যারে ভালবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জ্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে' পড়ে'
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমিষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জ্জুন। তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ. তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস!
নামধাম গোত্র গৃহ বাক্য দেহ মনে
সহস্র বন্ধন পাশে ধরা দাও প্রিয়ে!
চারি পার্শ্ব হ'তে ঘেরি' পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস! নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়-মন্দির মাঝে? গোত্র নাই? তবে
কি মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

অর্জ্জুন। বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার! এতদিন আছি,
তবু যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরাল থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন রত্ন, আলিঙ্গন সুধা;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে! তেজস্বিনী পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি, মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ-চিত্রিত
শিল্প-যবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি'। নিত্য দীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছল ছল করে' ওঠে, দেখিতে দেখিতে
ফাটিয়া পড়িবে, যেন আবরণ টুটি'।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি'; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে
আলো করি' অন্তর বাহির! সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে!

আমার যে সত্য তাই লও! ভ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের।—

কবি এইখানে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয়স্বরূপ একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যে সময় কণ্ঠলগ্না অথচ অসম্পূর্ণ-পরিচিতা অজ্ঞাতনাম্নী প্রণয়িনীর জন্য অর্জ্জুনের হৃদয়ের অপরিতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা দিনে দিনে বাড়িতেছিল, সেই সময়েই সেই সুদূরবাসিনী জনশ্রুতি মাত্র-লব্ধসত্বা রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদার অদ্ভুত বার্ত্তা এবং বিস্ময়কর চরিত্র অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করাইলেন, এবং তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনের হৃদয়ে এক অশ্রান্ত কুতূহল জাগাইয়া তুলিলেন। তাহার গুণগ্রামে, তাহার বীরোচিত কার্য্যকলাপে তাহার প্রজাবাৎসল্যে অর্জ্জুনের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ জাগিয়া উঠিল। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জ্জুনের হৃদ্গতভাব নাট্য-নিপুণ কবি কি সুন্দর কৌশলেই ব্যক্ত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার কথা অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং চিত্রাঙ্গদার মুখেই শুনিতেছেন। এই প্রশ্নোত্তরের অতর্কিত ঘাত প্রতিঘাতে উভয়ের হৃদয় এবং প্রকৃতি অজ্ঞানিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।—

চিত্রা। কি ভাবিছ নাথ?

অর্জ্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হ'তে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব্ব কাহিনী।

চিত্রা। কুৎসিত কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড়-কৃষ্ণ-তারা!
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে!

অর্জ্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী বীর্য্যে সে পুরুষ।

চিত্রা। ছি ছি, সেই
তার মন্দ ভাগ্য! নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে' বেঁধে' হেসে' কেঁদে'
সেবায় সোহাগে ছেয়ে' চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম! কি হইবে
কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তার!
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বন-পথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে
ওই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে' যেতে!
* * * এস, নাথ, বস। কেন আজি
এত অন্যমন? কার কথা ভাবিতেছ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত? কি অভাব তার?

চিত্রা। কি অভাব তার? কি ছিল সে অভাগীর?
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করি'
কুণ্ঠমান রমণী-হিয়ারে। রমণী ত
সহজেই অন্তরবাসিনী; সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি! কি অভাব তার!
অরুণ-লাবণ্য-লেখা চিরনির্ব্বাপিত
উষার মতন, যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে' থাকে
বীর্যশৈলশৃঙ্গ 'পরে নিত্য একাকিনী—
কি অভাব তার! থাক, থাক, তার কথা!
পুরুষের শ্রুতি-সুমধুর নহে, তার
ইতিহাস।

অর্জ্জুন বল বল। শ্রবণ-লালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্দ্ধ রজনীতে।
নদী গিরি বনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্র সৌধ কিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্দ্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জ্জন; প্রভাতপ্রকাশে

বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুকহৃদয়ে
তারি তরে। বল বল শুনি তার কথা !

চিত্রা। কি আর শুনিবে ?

* * * *

অর্জ্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি' অবহেলে;
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সঙ্কীর্ণ দুয়ারে রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি' সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহীর মতন, চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী,
বীর্য্যসিংহ 'পরে চড়ি' জগদ্ধাত্রী দয়া।

উপরে উদ্ধৃত অংশ পাঠে পাঠক দেখিবেন, এই উভয় চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জ্জুনের তদানীন্তন হৃদয় প্রেমের চৌম্বকাকর্ষণে কেমন কম্পিত—উদ্বেলিত। এবং ঠিক এই সময়েই কবি বর্ষ শেষ করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে তাহার দেবদত্ত রূপের মিথ্যা আবরণ

হইতে মুক্ত করিলেন। অর্জ্জুনও ঠিক সেই সময়ে জানিতে পারিলেন যে, যেমন সন্ধ্যা-তারা এবং প্রভাত-তারা দুটি পৃথক জ্যোতিষ্ক নয়, বস্তুতঃ এক—সেইরূপ তাঁহার অঙ্কগতা প্রণয়িণী এবং সুদূরবর্ত্তিনী কল্পনার বিষয়ীভূতা অথচ হৃদয়-সন্নিহিতা হৃদয়মথন-কারিণী মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা—একই নারী।

অর্জ্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদার নিজের প্রকৃত পরিচয়দানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। তাহা যে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে এবং গম্ভীর ও করুণ সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুত, তাহার বর্ণনা আমাদের রূঢ় ভাষায় সম্ভবপর নয়, এবং তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে পাঠকের উপর অন্যায় আচরণ করা হয় এই আশঙ্কায় আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

চিত্রা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ এই সুললিত
সুগঠিত নবনী-কোমল সৌন্দর্য্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
করিয়াছ পান! আর কিছু বাকি আছে?
সব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই প্রভু!
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আরো কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব!

* * * *

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর!

দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে ; কত দৈন্য আছে ; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াসা ! সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা ! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয় !

* * * *

হয় ত পড়িবে মনে, সেই একদিন,
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি' তার রূপহীন তনু।
কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা ; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে
ভালই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তারপরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি' বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

*　　*　　*　　*　　*

আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্র-নন্দিনী।

অর্জ্জুন।　　　　প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

অর্জ্জুনের শেষ কয়টি সামান্য কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এই মুহূর্ত্ত হইতে চিত্রাঙ্গদার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় গভীর প্রেম আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যখন তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা দুইটি হৃদয়প্লাবিনী ধারায় দুই দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন সহসা তাহাদের দুই মুখ এক হইয়া একই দিকে দ্বিগুণতর বেগে ধাবিত হইল।

এমন অনেক লোক আছেন, কথায় কথায় যাঁহাদের চো
পাতা অশ্রুজলে আর্দ্র হয়; কিন্তু এমনও লোক আছেন, যাঁহ

হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও চোখে অশ্রু সহসা দেখা যায় না। জানি না অর্জ্জুনের শেষকথাগুলিতে এমন কি রহস্য আছে যে, তাহা পাঠে শেষোক্ত প্রকৃতির লোকও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন না। ইহাতে নির্দ্দোষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নাই—বিরহ নাই—মৃত্যু নাই, কিন্তু তবু কথা কয়টি পাঠে হৃদয় অভিভূত হয়, কণ্ঠস্বরে অস্ফুট ক্রন্দনের বেগ আসিয়া পড়ে। আনন্দ-বিষাদ-মিশ্রিত সে ক্রন্দন! বিষাদ—চিত্রাঙ্গদার বৎসর-কালব্যাপী আত্মগোপনজনিত লজ্জা এবং ক্ষোভে; আনন্দ—সে মিথ্যা হইতে লজ্জা হইতে আজ তাহার মুক্তিতে।

আমরা চিত্রাঙ্গদা কাব্য পাঠকের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর মন্তব্যসমূহের আলোচনা করা যাক্। তৎপূর্ব্বে কিন্তু তিনি কি ভাবে রবিবাবুর কাব্যের গল্পাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, দেখিতে হইবে।—তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে গল্পটি এই ভাবে বর্ণিত,—

"বনমধ্যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্ম-সমর্পন করেন। অর্জ্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধার করেন। অর্জ্জুন তখন সম্মত হ'ন, এবং সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ [illegible]রেন।"

এই আখ্যানের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া, দ্বিজেন্দ্রবাবুর [illegible]া অভিযোগ, কবি অর্জ্জুনকে "জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত [illegible]াছেন।" "আর চিত্রাঙ্গদা! 'বেচারী মা আমার! * * * *

এক জন যে সে হিন্দুকুলবধূ "যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে !"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দ্বিজেন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিনা বিবাহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ধরিয়া লইবার কোনও কারণ কাব্য-মধ্যে আছে কি ? আমরা দেখাইব যে, কাব্য-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। অর্জ্জুন যখন চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহার তখনকার শেষ কথাগুলি স্মরণ করুন,—

ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন সে সময় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বিবাহে সম্মত হন নাই।

পরে যখন অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার দেবলব্ধ রূপে মুগ্ধ হইলেন, তখন তাহাকে পাইবার জন্য তিনি হৃদ্গতভাব এবং অভিলাষ কিরূপে ব্যক্ত করিলেন, দেখা যাক্।

অর্জ্জুন। পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রাম-রূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ

তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কি আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে! আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে;—তোমা পানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ।—কৈলাস-শিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুর-সরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণ মৃণাল সাথে মিশি' নেমে গেছে
অগাধ অসীমে; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে লক্ষ কোটী অগ্নিময়ী
নাগিনীর মত। মনে হল ভগবান্
সূর্য্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশিয়া
দি'ছেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত
মর্ত্ত্যজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখিছি তোমার মাঝে। চারিদিক হতে

দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপন।

ইহাতে কি কামান্ধ রূপোন্মত্ত প্রেমিকের ইন্দ্রিয়বিকার বা উপভোগলালসা ব্যক্ত হইয়াছে? না, একনিষ্ঠ প্রেমের মধুর, পবিত্র এবং পাবন উন্মাদনা বীণাঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে? এই কয়েকটি ছত্রে প্রেমের যে উচ্চ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যে দুর্লভ। ইহার তুল্যাদরের কবিতা Shelleyতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহার রচিত Epipsychidion প্রমুখ অতুলনীয় কবিতাসমূহের মধ্যেই এইরূপ আত্মবিলোপী প্রেম এবং প্রেম-সর্ব্বস্ব জীবন গীত হইয়াছে।

বিবাহ যে হইয়াছিল, তাহা পাত্র এবং পাত্রীর চরিত্র-গৌরবও আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে।

তাহা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল। এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত ছিল। সে বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি আসক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপকরণে প্রয়োজন ছিল না। যখন অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের এইরূপ প্রবলভাবে আকৃষ্ট, তখন তাঁহারা বিবাহের এমন সম্মত, সহজ ও সমীচীন উপায় থাকিতে তাহা হইতে দিগকে স্বেচ্ছাক্রমে বঞ্চিত করিলেন, এ কল্পনা উৎক —অস্বাভাবিক। স্বীকার করি, কাব্যের কোথা

গান্ধর্ব্ব বিবাহের উল্লেখ নাই ; কিন্তু কাল, পাত্রপাত্রী, উভয়ের চরিত্রগৌরব, কুলশীল, এবং শাস্ত্রবিধান, সমস্তই কি অভ্রান্তভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে না যে অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরে গান্ধর্ব্ব বিবাহে মিলিত হইয়াছিলেন ? মহাভারতে এই চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যানের অব্যবহিত পূর্ব্বে "উলূপ্যর্জ্জুনসমাগমঃ" নামক অধ্যায় আছে। সে অধ্যায়ে অর্জ্জুন এবং উলূপীর যৌন-মিলন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোথাও গান্ধর্ব্ব বিবাহের উল্লেখ নাই ; অথচ ঐ অধ্যায়েই উলূপী সাধ্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং মহাভারতের পরবর্ত্তী অংশে উলূপী অর্জ্জুনের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত। ইহাতে আমরা কি বুঝিব ? আমরা কি বুঝিব না যে, অর্জ্জুন ও উলূপীর গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল ? তাহা যদি হয়, কি কারণে এই "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয় নাই ? এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের ক্ষীণ ছায়াও কখন পড়ে নাই। আমরা বরাবরই বুঝিয়াছি, এবং উপযুক্ত পাঠকমাত্রকেই বুঝিতে হইবে য, চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের মিলন বিবাহ-নিষ্পন্ন দাম্পত্য-মিলন। হা যদি হইল, তবে অর্জ্জুন এক জন কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া বৎসরকাল তাহাকে পশুবৎ সম্ভোগ করিলেন, দ্বিজেন্দ্রবাবুর ত... ...ভিযোগ দাঁড়ায় কোথায় ?

...র... এই ...ন্দ্রবাবুর আর এক অভিযোগ চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা ...নের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে ...এবং যে কারণপরম্পরার সংযোগে চিত্রাঙ্গদা এইরূপ

কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য। অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা-সঙ্কোচ-শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই—বরং তাহার চরিত্র পুরুষের ন্যায়ই গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সে চরিত্রে রবিবাবু যদি শুদ্ধান্তচারিণীর লজ্জা-সঙ্কোচের আরোপ করিতেন, তাহা হইলে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও অসত্য হইত। Shakespeare কল্পিত অন্তঃপুর-শিক্ষা-বঞ্চিতা Miranda চরিত্রে আমরা এইরূপ লজ্জা সঙ্কোচের অভাব দেখিতে পাই। Ferdinandএর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই Miranda পিতৃসন্নিধানে অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল,—

> This
> Is the third man that e'er I saw ; the first
> that e'er I Sighed for :

এবং পরে সেই অপরিচিত পুরুষের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া এই বলিয়া আত্মসমর্পণ করিল,—

> I am your wife, if you will marry me ;
> If not, I'll die your maid : to be your fellow
> You may deny me ; but I'll be your servant
> Whether you will or no.

এ দিকে আবার দেখুন, যখন নারদ উমার সমক্ষে হিমালয়ের নিকট উমার বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন কালিদাস

উমার তদানীন্তন ভাব কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, উমা তখন ভাণ করিতেছেন, যেন বিবাহের কথা উমার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই, তিনি যেন অন্য চিন্তায় নিমগ্না,—

"লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।"

Shakespeare যদি বনবিহঙ্গিনী Mirandaকে লোকালয় বাসিনী, সামাজিক-শিক্ষাপ্রাপ্তা উমার ন্যায় ছলনা-পরা করিতেন, তাহা হইলে তাহা একেবারে অসঙ্গত হইত। আমাদের হৃদয়ও তাহা কোনও মতে গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং উমার মুখে Mirandaর স্বাভাবিক সরল লজ্জাহীন হৃদয়াভিব্যক্তি নিতান্ত অস্বাভাবিক শুনাইত।

এই উপযাচিকার ভাব, যাহা দ্বিজেন্দ্রবাবুর নৈতিক সত্তাকে এত বিচলিত করিয়াছে, তাহা ত মহাভারতের বর্ণিত যুগের আস্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল। মনোগত ভাব প্রকাশে তাহাদের কোনরূপই সংযম দেখা যায় না। কোন পুরুষের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে তাহা তাহারা স্পষ্ট প্রকাশ করিত—রাখিয়া ঢাকিয়া বলিত না। তাহা ত হইবেই। যখন যৌন মিলনের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ-পদ্ধতি রূপ এমন প্রশস্ত রাজপথ পড়িয়াছিল, তখন রাখা-ঢাকার প্রয়োজন কোথা? রাখিলে ঢাকিলে যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই ঘটে না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু ভক্তি-শ্রদ্ধা-গদ-গদ-কণ্ঠে বলিয়াছেন, "লজ্জা সঙ্কোচ, সম্ভ্রম সব দেশেই নারীজাতির সম্পত্তি।"—সকল দেশের

হউক না হউক সকল কালের ত নয়-ই। এই মহাভারতের কালের নয়। "দৃষ্টান্ত চাই?" উলূপীর আখ্যান দেখুন না! অথবা নাগকন্যা উলূপীকে ছাড়িয়া দিন। দময়ন্তী ত আদর্শ নারী—সেই দময়ন্তী বিবাহের পূর্ব্বে নল রাজার সাক্ষাৎ পাইয়া—অথচ তাঁহাকে তখন নলরাজা বলিয়া না জানিয়া—সেই অপরিচিত পুরুষকে কি বলিয়া প্রথম সম্বোধন করিলেন?

কস্ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ মম হৃচ্ছয়-বর্দ্ধন।

হে সুন্দর! আমার কাম প্রবৃত্তির উত্তেজক, কে তুমি? হায়! "নারী জাতির সম্পত্তি—লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম"! এমন দ্বিজেন্দ্রবাবুর নারীনিষ্ঠা! ভাগ্যে রবিবাবু "ব্যাসদেদার সেই ক্ষীর নামেন নাই।"

দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর এক অভিযোগ এই যে, যতদিন চিত্রাঙ্গদার দেবলব্ধ রূপ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের সম্ভোগে অন্ধ—উন্মত্ত। "দ্বিধা নাই—সঙ্কোচ নাই—ধর্ম্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ—ভোগ।" কিন্তু যদি স্বীকার কর, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলে এই অভিযোগের সারবত্তা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, আমরা ত কাব্যের কোথাও দ্বিজেন্দ্রবাবুর কথিত এই নির্লজ্জ উপভোগ বা তাহার অধিকতর নির্লজ্জ বর্ণনা দেখিলাম না। বাস্তবিক, এই অভিযোগে আমরা যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের বোধ হয়, দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন তাঁহার এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তখন

কাব্যখানি তাঁহার সম্মুখে ছিল না। তিনি বহু পূর্ব্বকালের পাঠের স্মৃতি বা বিস্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। কাব্যপাঠে এই এক বৎসর কাল ধরিয়া আমরা চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ে নিত্যবর্দ্ধনশীল শোকেরই পরিচয় পাই। আমরা দেখিতে পাই, তাহার হৃদয়রুদ্ধ নির্ব্বাক বিষাদ সমস্ত জীবনকে তিক্ত করিয়া তুলিতেছে। চিত্রাঙ্গদার দুঃখ নহে যে, "হায়! আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।" দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন সমস্ত কাব্যখানি ভুল বুঝিয়াছেন, তখন যে তিনি উহাই চিত্রাঙ্গদার দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, ᐧᐧত বিস্ময়ের কিছুই নাই।

ᐧᐧনার দুঃখ এই,—অর্জ্জুনের যে অপরিসীম প্রেম সে লাভ ᐧᐧ, এবং উচ্ছল, উদ্বেলিত, সাগরতরঙ্গের ন্যায় যে প্রেমের ᐧᐧময় উচ্ছ্বাস প্রতিদিন তাহার হৃদয়ে আসিয়া পড়িতেছে, সে প্রেম তাহার নিজের রূপ-জন্যও নয়, গুণ-জন্যও নয়। অর্জ্জুন তাহাকে ভালবাসিতেছেন কিসের জন্য? যে সৌন্দর্য্য, যে রূপ তাহার নিজের নয়, যাহা তাহার ছদ্মবেশমাত্র, সেই জন্য। এই ছলনার দুর্বিষহ লজ্জা "তিরশ্চীন-মলাত-শল্যবৎ"—জ্বলন্ত-অঙ্গার-নির্ম্মিত বক্র শেলের ন্যায় চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ে আমূল প্রোথিত থাকিলেও, অম্লানবদনে তাহাকে বহিতে এবং সহিতে হইয়াছিল; এবং যে সৌন্দর্য্যে অর্জ্জুন মুগ্ধ, সেই সৌন্দর্য্য তাহার দেহে অধিষ্ঠিত বলিয়া সে দেহও তাহার বিদ্বেষের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য অর্জ্জুনের সহস্র আদর, প্রথম মিলনের উন্মাদনী

স্মৃতি—সকলই চিত্রাঙ্গদার নিকট বিষাক্ত। সে সমুদায় মূলে তাহার এই দেহস্থিত মায়ালাবণ্য-সঞ্জাত বলিয়া চিত্রাঙ্গদা তাহা-দিগকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই জন্য কাব্যের যেখানেই চিত্রাঙ্গদা এ মায়া-লাবণ্যের এবং তজ্জনিত অর্জ্জুনের প্রেমের উল্লেখ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার কথাগুলি শ্লেষ এবং বক্রোক্তির মিশ্রণে তিক্ত-মধুর; এবং তাহাতে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থা কেমন সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে!

অন্তরের এই নিষ্ঠুর দাবদগ্ধ স্মৃতি—হৃদয়ের এই বিষদিগ্ধ ক্রূর অনুভূতি কিরূপ প্রখর এবং গভীর, পাঠককে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য কবি সৃষ্টিকারিণী কল্পনা-বলে চিত্রাঙ্গদার সেই মায়া-লাবণ্যকে অমানুষিক-বিদ্বেষ-দুষ্ট সত্তা দিয়া রাক্ষসীর ন্যায় তাহাকে অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার মাঝখানে দাঁড় করাইয়াছেন।

* * * মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গ-সহচরী করি ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাত! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান! সেই প্রেমদৃষ্টিপাত—
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা,—সেই দৃষ্টি

রবিরশ্মিসম চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারীহৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে !

* * *

বিদ্যুৎবেদনা সহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্খা-তীর্থ
বাসরশয্যায় ; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর !

এই অসহ্য লজ্জা এবং দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য চিত্রাঙ্গদা কন্দর্পকে তাহার প্রদত্ত রূপ ফিরাইয়া লইতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিল, এবং সে সৌন্দর্য্য হারাইবার ফলস্বরূপ অর্জ্জুনেরও প্রেম হারাইবার বিপৎপাতকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল।

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভাল ! এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে ! সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভাল যদি নাই লাগে,
ঘৃণা করে চলে' যান যদি, বুক ফেটে

মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি র'ব!
সেও ভাল ইন্দ্রসখা!

কাব্যের ঠিক মর্ম্মস্থানে চিত্রাঙ্গদার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখস্রোত গভীর আবর্ত্তে পরিণত হইয়াছে। নাটকের এই অংশে তাহার মহান্ হৃদয়ের গভীর বিষাদ Tragedy of a soulএ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া কেহ কি দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতের অনুমোদনে বলিতে পারেন যে, রবিবাবু চিত্রাঙ্গদাকে নির্লজ্জা কুলটা এবং অর্জ্জুনকে জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন? দ্বিজেন্দ্রবাবু যদি এইরূপ একটি বাস্তব চিত্র দেখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। পূজাস্পদ কাশীরাম দাসের কৃত মহাভারতে, সুভদ্রাহরণের পূর্ব্বে, অর্জ্জুন এবং সুভদ্রার যে আলাপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে আমরা দ্বিজেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করি। সেই বর্ণনায় তিনি দেখিতে পাইবেন, যে অর্জ্জুন—যিনি "রাজপুত্র, পঞ্চ-পাণ্ডবের একজন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিবেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে উর্ব্বশীরও প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন," সেই অর্জ্জুন জঘন্য পশু নয় ত কি? "বঙ্গের" উক্ত "কবিবরে"র হাতে পড়িয়া কামান্ধ অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক কুমারীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত! আর সুভদ্রা, অনূঢ়া হইয়াও অর্দ্ধরাত্রে উক্ত "কবিবরে"র কল্যাণে সুপ্ত অর্জ্জুনের শয়নগৃহে অভিসার করিয়াছিলেন! ভদ্রলোকের পাঠ্য এই "সাহিত্য" পত্রে আমরা পূজ্যপাদ কাশীরাম দাসের বিরচিত মহাভারতের সে অংশ উদ্ধৃত করিবার সাহস পাইলাম না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু Courtshipএর উপর একেবারে খড়্গহস্ত। সমালোচ্য কাব্যে রবিবাবু Courtshipএর অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন, এবং ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"Courtship না হইলে প্রেম হয় ?" ইহার উত্তরে আমরা মুক্তকণ্ঠে অসঙ্কোচে বলি,—না—Courtship না হইলে প্রেম হয় না—প্রেম অসম্ভব। পাঠক আমাদিগকে ভুল বুঝিবেন না—আমরা এমন বলিতেছি না যে, Courtship না হইলে বিবাহ হয় না—বিবাহ Courtship ভিন্নও হয়, প্রেম ভিন্নও হয়। কিন্তু Courtship ভিন্ন প্রেম জন্মিতে পারে না।

আমরা বাঙ্গালী—আমাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। সে বিবাহের পূর্ব্বে Courtship ঘটে না। কিন্তু বাল্যবিবাহেও দাম্পত্য প্রেম জন্মিবার আগে Courtship আবশ্যক, এবং হইয়া থাকে—তবে তাহা বিবাহের পূর্ব্বে নয়।

Courtship কথাটা ইংরাজী হইলেও পদার্থটি আর কিছুই নয়—আমরা যাহাকে পূর্ব্বরাগ বলি। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার জন্য আলাপ এবং সঙ্গলাভকে স্থূলতঃ Courtship বলা যাইতে পারে।

আমাদের মধ্যে বিবাহকালে বর কন্যাকে বলিয়া থাকে,—

যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

কিন্তু ইহাও মন্ত্রবলে হইবার নহে, ইহারও আয়োজন চাই। কে এমন অন্ধ দুর্ভাগ্য আছে যে, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রেমের ভূমিকার সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ আয়োজন দেখে নাই? দ্বিজেন্দ্রবাবু নীতির দোহাই দিয়া রবিবাবুর যে সকল নির্দ্দোষ ও পবিত্র গানের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এই পূর্ব্বরাগের মাধুরীতে পূর্ণ।

আমাদের গুরুজনভূয়িষ্ঠ একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অপর সকলের অজানিতভাবে নববধূর স্বামীর নিকট লাজ-সঙ্কুচিত ধীরপদক্ষেপে গমন—দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিসারই নয় বলিলাম,—নববিবাহিত পাত্র পাত্রীর পরস্পরকে "চুরি করিয়া" বা অপাঙ্গে দর্শন, পূর্ব্বরাগের এ সমস্ত মধুময় লক্ষণ রবিবাবুর সেই সকল অতুলনীয় গীতগুলির মধ্যে "পঞ্চম রাগিণী"তে নিত্য গুঞ্জরিত।

আমাদের এমন আশা আছে যে, দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তি সত্বেও এই নির্দ্দোষ এবং মনোমুগ্ধকর Courtship শীঘ্র সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে না, এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিন্দা সত্বেও রবিবাবুর এই গানগুলি যতদিন বাঙ্গলা ভাষা এবং বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে। তা' ছাড়া গানের উপর দ্বিজেন্দ্রবাবু এত চটিলে চলিবে কেন? দ্বিজেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়াছেন, "কানু বিনা গীত নাই"—আর সে গীত—

উপসংহারে জিজ্ঞাসা করি, তর্কের অনুরোধে যদিও আমরা ধরিয়া লই, Courtship আমাদের সমাজে অপ্রচলিত, তাই

বলিয়া উহা অস্বাভাবিক কেন? Give a dog a bad name and hang it, নীতিকুশলী দ্বিজেন্দ্রবাবু এই উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন কি?

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে কিন্তু এই Courtship-চিত্র বিরল নয়। রবিবাবুর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যে এই Courtship এর যে মধুর চিত্র চিরকালের জন্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। জর্ম্মনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাহার সৌন্দর্য্যে, "চাপলায় প্রণোদিতঃ" হইয়া যে অনুপম চতুষ্পদী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য-সাহিত্যাভিজ্ঞ শকুন্তলার পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু বোধ হয়, কালিদাসের সম-সাময়িক পণ্ডিত দিঙ্‌নাগাচার্য্য মহাশয় এই Courtshipএর অবতারণা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি এবং নিন্দা করিয়াছিলেন।

শকুন্তলার এই Courtship-চিত্রে দ্বিজেন্দ্রবাবুর আপত্তি-কর আর একটি বিষয় দেখিতে পাই। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে যে উপযাচিকার ভাব দ্বিজেন্দ্রবাবুর রোষের কারণ হইয়াছে, ঋষি-পালিতা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার চরিত্রে তাহারও যেন কিছু কিছু ছায়া দেখা যায়। দুষ্মন্ত-দর্শনে মদনতাপপীড়িতা শকুন্তলা যখন তন্নিবন্ধন অসুস্থদেহা হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার সখী-দ্বয় তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য (প্রেম এমনই সান্নিপাতিক ব্যাপার!) রাজার সহিত তাহার আশু সম্মিলনের উপায়স্বরূপ শকুন্তলাকে রাজার নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পরামর্শ

দেন, এবং রাজাকে একখানি মদনলেখ লিখিতে বলেন। পাঠককে কি বলিতে হইবে, শকুন্তলা সে হৃদয়গ্রাহী পরামর্শ সহর্ষচিত্তে এবং আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন? তখনও কিন্তু রাজা তাঁহার মনোভাব মুখে বা পত্রে ঘুণাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই। তবে শকুন্তলার ন্যায় তাঁহারও আকার ইঙ্গিতে আধিব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল—অন্ততঃ অভিজ্ঞ এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিদিগের চোখে। শকুন্তলা রাজাকে যে প্রেমপত্র লিখিলেন, তাহা এই,—

"তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি।
ণিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং।"

"নিষ্ঠুর! তোমার হৃদয় কিরূপ জানি না, কিন্তু তোমার সহিত সঙ্গমোৎসুক আমার এই দেহকে কন্দর্প দিবারাত্রি সন্তপ্ত করিতেছে।" এখানে দেখিতেছি, "লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম নারী-জাতির সম্পত্তি" নয়, পুরুষেরই সম্পত্তি। না জানি আমাদের পূর্ব্বকথিত দিঙ্‌নাগাচার্য্য মহাশয় ইহার কতই নিন্দা করিয়াছিলেন।

সনেট-পঞ্চাশৎ

আজ আমরা এক জন নূতন কবির পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর নাম বাঙ্গলা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত না হইলেও, তিনি যে প্রকৃত কবি, তাহা আজ আমরা তাঁহার এই অভিনব "সনেট-পঞ্চাশৎ" পুস্তিকা-পাঠে জানিলাম। প্রকৃত কাব্যানুরাগীর পক্ষে আর একটি আনন্দের বিষয় এই যে, প্রমথ-বাবুর কবিপ্রতিভা যে শ্রেণীরই হউক না কেন, তাঁহার এই প্রথম পুস্তকেই তিনি নিজের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য বা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার কণ্ঠ নূতন, ভঙ্গীও নূতন। পূর্ব্বপরিচিত কোনও কবির কণ্ঠ ও ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি বা ছায়া তাঁহার কবিতার মধ্যে দেখিলাম না। সাহিত্যে এই স্বাতন্ত্র্য অমূল্য—বৈচিত্র্যের কারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তির মূল। প্রকৃত কবির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা থাকিবেই। তাঁহার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, তাঁহার নিজের বলিবার কথাও আছে, বলিবার ভঙ্গীও আছে। ইহা অনিবার্য্য। এই অনন্যসাধারণতাতেই তাঁহার মর্য্যাদা—এমন কি, তাঁহার অমরত্ব। তুমি তাঁহার কবিতায় যে রস—যে মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য অনুভব করিবে, অপর কোনও কবির কাব্যে ঠিক তাহা পাইবে না। এবং সে রস মনে পড়িলেই সেই কবিকেও মনে পড়িবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি বুঝাইতে হইলে ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রভূত উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

"আমরা বড়লোক" হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যে যেরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ প্রকৃত কবি আছে, সংস্কৃত বা আধুনিক ভারতীয় কোনও সাহিত্যে তেমন নাই। ইংরেজী কবিদিগের মধ্যে Mathew Priorকে কেহ কোন দিন প্রথম শ্রেণীর কবি বলে নাই। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন একটি অনন্যসাধারণ অমায়িক সরল হাস্য পরিহাসের মধুর বিকাশ আছে, যাহা Prior এর অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণীর কোনও কবির রচনায় দেখিতে পাইবে না। ভাষা এবং ভাবে কোনও অভাবও উপলক্ষিত হইবে না। পাঠে তোমার রসানুভববৃত্তি চরিতার্থ হইবে এবং যখনই সেই রসের কথা মনে পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে Priorকেও মনে পড়িবে। ছোট কবি হইলেও Priorএর নিজের মর্য্যাদা আছে। Prior অমর। আমার বিবেচনায় আমাদের সমালোচ্য কবি প্রমথ চৌধুরীরও নিজের মর্য্যাদা আছে, এবং এই প্রবন্ধে সেই মর্য্যাদা যে কি, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রমথবাবু তাঁহার কবি-কল্পনা ও চিন্তা সনেট-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং "স্বদেশী"র ভয় না রাখিয়া পুস্তকের নাম "সনেট-পঞ্চাশৎ" দিয়াছেন। এই কবির একটি বিশেষ ও প্রধান গুণ—স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা। গ্রন্থের নামকরণেই তাহার পরিচয়। সনেট জিনিসটাই যখন বিদেশী, তখন তাহার বিদেশী নাম বাঙ্গলায় চালাইলে ক্ষতি কি?

ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট কবির ভাবপ্রকাশের একটি

সুপরিচিত এবং বিশেষ মর্য্যাদাপ্রাপ্ত প্রণালী। সম্ভবতঃ ইতালী ইহার জন্মস্থান। অন্ততঃ ইতালীয় কবিদিগের হস্তেই সনেট যে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল সাহিত্যেই ভাবপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট ছাড়া Ode, Ballad প্রভৃতি; পারসীক সাহিত্যে "রুবাই", "গজল" ইত্যাদি। কেহ যেন মনে না করেন, এই গঠন-প্রণালীর ভিত্তি রচয়িতার খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাবপ্রকাশের কোনও প্রণালী যখন বিশেষ একটি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সেই আকার তৎপক্ষে বিশেষ উপযোগী। সনেটের ইতিহাস-পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহার আয়তন, আকার ও মিলনপদ্ধতি শ্রেণীবিশেষের ভাবপ্রকাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়াই সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা।

এখন দেখা যাক্, কোন্ শ্রেণীর ভাবপ্রকাশে সনেটের পটুতা। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কবি Dante Gabriel Rossetti সনেট্ রচনায় সিদ্ধহস্ত, এমন কি, কোনও হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি সনেট সম্বন্ধে যে অতুলনীয় সনেট রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সনেটের ভাবগত প্রকৃতি, তাহার প্রাণ যে কি—তাহা বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাষায় বুঝাইয়াছেন। সেই সুন্দর কবিতাটি একাধারে সনেটের বিজ্ঞান ও আদর্শ। অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অনুপম ভাব ও ভাষার মন্ত্রশক্তিতে, কবি যেন সনে-টের অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে তাঁহার রচিত এই কবিতাটির ছন্দোময়

মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাঠককে আমরা এই সুন্দর কবিতাটির পরিচয় লইতে অনুরোধ করি—

> A sonnet is a moment's monument
> Memorial from the soul's eternity
> To one deathless hour.

যখন কোনও মুহূর্ত্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবিহৃদয় সৌন্দর্য্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, সনেট ভাষায় ও ছন্দে সেই দুর্ল্লভ মুহূর্ত্তের চিত্র। ইহা হইতে বুঝা যায়, সনেটের রচনার মূলে প্রবল ভাবের প্রণোদনা চাই। সেই ভাব যেন আবার বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তারিত হইয়া তাহার ঘনীভূত আবেশ না হারায়। কোনও কোনও সনেট আবার গভীর চিন্তাশক্তি-প্রসূত—Shakespeare যাহাকে "deep-brained" সনেট বলিয়াছেন। সুতরাং ভাব ও রসের একাগ্রতা ও সমগ্রতাই সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের যুগপৎ সংযম ও স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ, পরিণত অবয়ব দিবার জন্য, ভাষার প্রকাশ-শক্তির উপর নিরবচ্ছিন্ন জোরজবরদস্তি হুকুম তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাষা-শিল্পের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য-বিকাশেও দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে গীতিকবিতার উন্মাদনা থাকিবে, অথচ মিত্রাক্ষর-প্রাচুর্য্য জন্য যে ঝঙ্কার-বাহুল্য ও আড়ম্বর গীতিকবিতার গৌরব, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। একদিকে দেখিতে হইবে, ইহা

যেন চতুষ্পদী, ষট্‌পদী, বা অষ্টপদীর ন্যায় চুট্‌কি ভাষার বলে নিতান্ত স্বল্লায়তন হইয়া না পড়ে—অপর দিকে গীতিকবিতার ভাবপ্রবাহের উচ্ছ্বাসে অনির্দ্ধারিত সীমায় বিস্তারিত না হয়। খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দশ-পদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।

এ দিকে আবার এই চতুর্দ্দশপদ আদৌ, অন্ততঃ ইতালীয় সনেটে, দুই পৃথক ভাবে বিভক্ত ;—প্রথম, আট পদ—Octavo—অষ্টক ; অবশিষ্ট ছয় পদ—Sestet—ষষ্ঠক। এই বিভাগও রচয়িতার খেয়াল-প্রসূত নহে। জীবিত ইংরেজ সমালোচকদিগের অগ্রগণ্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সনেট-রচয়িতা Watts-Duntan এই সনেট-বিভাগের নিগূঢ় রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইনি বলেন—সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতন যেমন তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন, সনেটের ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনও সেইরূপ তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন। ফেনিলোচ্ছল সাগর-তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত ও বর্দ্ধিতকায় হইয়া বেলাভূমির উপর উৎপতিত হয়, এবং নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া আবার উজান-বেগে সাগরগর্ভে অপসারিত হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শব্দধারায় অষ্টকে উচ্ছলিত হইয়া বিপরীত আবর্ত্তনে ষষ্ঠকে অবসান প্রাপ্ত হয়। যে সুন্দর সনেটে কবি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চন্দ্রালোকের ন্যায় মধুর ভাষায়, এই কথাটি বুঝাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক যে কেবল উল্লিখিত সনেট-বিভাগের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন, তাহা নহে,

সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-জগতের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিবেন। নিম্নে এই সনেটের ষষ্ঠক উদ্ধৃত হইল :—

"A sonnet is a wave of melody :
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the 'octave' ; then returning free
Its ebbing surges in the 'sestet' roll
Back to the deeps of Life's tumultuous sea."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই চতুর্দ্দশপদমাত্রাত্মক রচনায় গীতি-কবিতার শব্দ-বাহুল্য ও ঝঙ্কার-প্রাচুর্য্য পরিহর্ত্তব্য—তাহাতে ভাব ও ভাষায় শিথিলতা আসিতে পারে। সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্যে রুদ্ধ-স্রোতস্বিনীর ন্যায় ভাবপ্রবাহ যাহাতে গভীর ও প্রখর-গতি হয়, তজ্জন্য ইহার আয়তন চৌদ্দটিমাত্র পদে পরিমিত। ইহার মিত্রাক্ষর-বিধানও—সংখ্যায় ও স্থাপনায়—সেইরূপ দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ। অষ্টকের আটটি পদে দুইটিমাত্র বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত হইবে :—প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পদের মিল একস্বরাত্মক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদের মিল আর এক স্বরাত্মক। যথা :—ক—খ—খ—ক—ক—খ—খ—ক।

ষষ্ঠকে মিলের একটু স্বাধীনতা আছে।—তিনটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিলও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে আদিম ইতালীয় সনেটের নিয়ম, এবং আধুনিক কালের অধিকাংশ

ইংরেজী সনেট-লেখক এই নিয়মেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু Shakespeareএর সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন ইতালীয় সাহিত্য হইতে ইংরেজী সাহিত্যে সনেট প্রথম আনীত হয়, তখন Wyatt,Srurey এবং Spenser প্রভৃতি কবিগণ কি আকারে ইংরেজী ভাষায় ইহা বেশ খাপ খাইতে পারে, তৎবিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের হাতে এবং পরবর্ত্তী কালে Shakespeareপ্রমুখ কবিদিগের হাতে সনেট যে আকৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাই সাহিত্যে সেক্সপীরীয়-সনেট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পেত্রার্কীয় সনেটের ন্যায় বাঁধাবাঁধি নিয়মে অষ্টক এবং ষষ্ঠকে বিভক্ত নয়—যদিও অষ্টম চরণে প্রায়ই ভাবের বিরাম দেখা যায়। ইহার প্রথম দ্বাদশ চরণে তিনটি চতুষ্পদী গঠিত। ইহাদের মিল বা মিত্রাক্ষর-সংস্থান একছত্রান্তর-পর্য্যায়ে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেক চতুষ্পদীতে দুইটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল থাকে—শেষ দুইটি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ার, এবং এই শেষ দুই চরণেই সেক্সপীরীয় সনেটের বিশেষত্ব। হয় এ দুটি পদে পূর্ব্বগত তিনটি চতুষ্পদীর সমুদয় ভাব ও রস সমষ্টি-আকারে চরমমাত্রা লাভ করিবে—না হয় বিপরীত ভাবের সমাবেশ-সংঘর্ষণে পদ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে।

Milton সেক্সপীরীয় সনেটের মিত্রাক্ষর-সংস্থাপন-বিধির পরিবর্ত্তে পেত্রার্কার বিধির পুনঃপ্রচলন এবং অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পেত্রার্কার অষ্টক ও ষষ্ঠক বিধান রক্ষা করেন নাই। কোনও কোনও সমালোচকের মতে Milton এ বিষয়ে পেত্রার্কীয়

পদ্ধতির অর্থ ও উদ্দেশ্য আদৌ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহা অবলম্বন করেন নাই, এবং তজ্জন্য তাঁহার সনেটগুলিও চরমোৎকর্ষ লাভ করে নাই।

সনেট সম্বন্ধে আরও অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। তাহাদের উল্লেখ বা আলোচনা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক। যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রমথবাবুর পুস্তকের সমালোচনার প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকা-স্বরূপ।

এখন আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া উপক্রমণিকার শেষ করিব। আমরা দেখাইয়াছি, সনেট-রচনা কঠিন নিয়মে আবদ্ধ। অনেকেই বলিতে পারেন যে, এমন একটি ক্ষুদ্র রচনায় এত কঠোর নিয়ম কেন? তাঁহারা বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করেন, যখন ভাব লইয়াই আমাদের কার্য্য, তখন ভাব-প্রকাশে পারিভাষিক কোনও নিয়মের ব্যতিক্রমে কি আসিয়া যায়? যখন কবিতা-পাঠে কবির ভাব স্পষ্ট জানা গেল, তখন ভাষা বা ভঙ্গীতে, ছন্দ বা মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে, আকার বা আয়তনে যদি কোনও ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, "তাহা ধর্ত্তব্য নহে"। তাঁহারা বুঝেন না যে, সাহিত্যে—এবং কেবলমাত্র সাহিত্যেই বা কেন?—ললিত কলার সমস্ত বিভাগেই—ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপকরণ দুটি পৃথক্ বা পরস্পর স্বাধীন বস্তু নয়, পরন্তু এক—অন্ততঃ একাঙ্গ। চিত্রকলায় দেখ না—বর্ণ-বিকাশ, রেখাপাত, বস্তু-সংস্থান প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে চিত্রকরের প্রধান উপকরণ—এবং যে পরিমাণে এই উপকরণে দোষ বা অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণেই ভাবেও দোষ

ও অভাব পরিলক্ষিত হইবে। ভাষা ও ভঙ্গী ছাড়িয়া ভাবের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ভাব ও ভঙ্গী, বাক্য ও অর্থ, হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তির ন্যায় পরস্পর "সম্পৃক্ত"।

সাহিত্য-কলায় আবার গঠনের স্থান (যাহাকে ইংরেজীতে Form বলে) মৌলিক। গঠন ভিন্ন ভাবগৌরব প্রকাশিত হয় না। ইহা বাহির হইতে আমদানী করা পদার্থ নয়, ভাবের নিজেরই অঙ্গ। গঠনের অভাবে কত কবিতা ও কাব্য সাহিত্যে স্থান পায় নাই। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের রচনায় কিন্তু গঠন ও উপকরণের উৎকর্ষ জাজ্জ্বল্যমান। তাঁহাদের ভাব ও ভঙ্গী, কল্পনা ও গঠন-রচনা এক সূত্রে গ্রথিত, এবং সমান উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। নিয়মের কাঠিন্য নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন বা বিঘ্ন নয়, বরং উৎকর্ষ-প্রকাশের সহায়; সমালোচ্য পুস্তকে প্রমথবাবু নিজেই লিখিয়াছেন,—

> "ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
> শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন॥"

যেখানে প্রতিভার বল ও তেজ আছে, নিয়মের শৃঙ্খল যতই তাহাকে বাঁধিতে যাইবে, ততই তাহার বল ও তেজ স্ফূর্ত্তি পাইবে। চালন-নিপুণ উপযুক্ত আরোহী বিক্রমশালী দুর্দ্দমনীয় অশ্বই চায়।

সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত বিখ্যাত ফরাসী কবি Soulary সনেট সম্বন্ধে যে একটি অপূর্ব্ব সনেট লিখিয়াছেন, তাহাতে সনেটের

স্বরূপ ও কঠিন বিধিবাহুল্য সত্ত্বেও, সনেটের ভাবপ্রকাশ-পটুতা কবিসুলভ-কল্পনা-কৌশলে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। ফরাসী-অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য আমাকে তাহার একটি নিতান্ত অনুপযুক্ত অনুবাদ করিয়া দিবার ধৃষ্টতা স্বীকার করিতে হইল,—

"ঢুকিবে না কায়া" বলে মুগ্ধা হাসি-মুখ
"ছিঁড়িবে যে ছোট জামা দেহপরিসর
বাঁকাইয়া কটিতট— ফুলাইয়া বুক,
বাড়াইল প্রতিকূল পথে রম্য কর।
ধীর আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম—
সুস্থবাসে সাজাইনু দেহযষ্টি তার
কোথাও বাঁধন দিয়া—কোথাও বিরাম—
শির-স্কন্ধ-বক্ষ পরে ক'রে দিনু পার।
উদ্ভিন্ন দেখ বাসে—কলার কৌশলে
উচ্ছল দেহলতা—প্রতি অঙ্গ-রেখা
হাসিছে লক্ষ্মীটি বাহু সামান্য সম্বলে,
ঠিক বসিয়াছে বাস! শোভা তাহে লেখা।
হৃদয়ে অভাব নাই—বাহুল্য শরীরে,
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে।

বাঙ্গলা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বপ্রথমে সনেট রচনা করেন, এবং তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে যে উপক্রম লিখিয়াছেন, তাহাতে পেত্রার্কার যশোগান গায়িয়াছেন। প্রমথবাবুও তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে পেত্রার্কাকে

গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।—

"পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্ত্যে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!"

সুতরাং তাঁহার রচিত সনেটগুলি আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে কিনা, ইহার পরীক্ষা লইবার অধিকার তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও রচনা-শিল্পের বহুবিধ উচ্চতর গুণে মুগ্ধ হইলেও আমাকে বলিতে হইবে যে, এক বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুর শাসন আদৌ মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি সনেটে পেত্রার্কার অষ্টক ও ষষ্ঠক বিভাগ রক্ষিত হয় নাই। একাধিক সনেটের দশম চরণে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ভাবতরঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিরাম লাভ করিয়াছে। প্রায়ই তাঁহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, এবং অনেক স্থলে সেক্সপীরীয় সনেটের অন্তিম পয়ারেরই অনুরূপ! দৃষ্টান্তস্বরূপ "পত্রলেখা" নামক অপরূপ সুন্দর সনেটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও কোনও কোনও ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকারপ্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই। ইহার তুল্য বা ইহার অপেক্ষা আরও গুরুতর বিশৃঙ্খলা আমরা Milton-রচিত একটি ইংরেজী সনেটে

দেখিতে পাই। 'Nightingale' নামক সুন্দর সনেটে Milton সপ্তম চরণের মধ্যাংশেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও যতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু Milton অপরাপর বিষয়ে পেত্রার্কার অনুযাত্রী হইলেও, যে কারণেই হউক, সনেটের ভাবপ্রবাহের বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার রচিত অপর সকল সনেটেই আমরা দেখিতে পাই, ভাবস্রোত কোনও স্থানে বিভক্ত না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পূর্ণ গোলকের আকার ও পরিণতি লাভ করিয়াছে।

Verlaine নামক এক জন আধুনিক প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি অনিয়ন্ত্রিততার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত দু একটি সনেটে ষষ্ঠকাষ্টক বিভাগ একেবারে বিপরীত। ষষ্ঠক আরম্ভে—অষ্টক শেষে।

প্রমথবাবুর এই "পত্রলেখা" সনেটে আরও গুরুতর দোষ দেখা যায়। ইহার অষ্টকের শেষ চরণে ভাবের বৈধ বিরাম হইলেও, নবম চরণে নবপ্রবর্ত্তিত ভাবতরঙ্গ সনেটের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত না হইয়া দশম চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া শেষ হইয়াছে। একাদশ চরণে আবার ভাবের নূতন আবর্ত্তন। ইহাতে ভাবস্রোত ত্রিধা বিভক্ত হইয়া প্রখরতা ও গভীরতা হারাইয়াছে। সনেটটিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া না মিলটনীয় সনেটের পূর্ণ নিটোল গোলকত্ব লাভ করিয়াছে—না পেত্রার্কীয় সনেটের তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন উত্থান-পতনের বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে কতকগুলি দোষ দেখা যায়।

কোনও কোনও সনেটে একই কথা একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন চরণের অন্তে স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও শব্দের মিল, সমধ্বনি দুটি ভিন্ন শব্দের সহিত নিষ্পন্ন না হইয়া, সেই শব্দেরই পুনরুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ দোষ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিহর্ত্তব্য—বিশেষতঃ সনেটে। 'রজনীগন্ধা' নামক সনেটে রজনীগন্ধা কথার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সনেটের ভাব ও রচনা-গৌরবের উপযুক্ত নয়—গীতিকবিতাতেই ইহা শোভা পায়। বস্তুতঃ না ভাবের সমাবেশে, না গঠন-ভঙ্গীতে, এই কবিতাটিকে সনেট বলা যাইতে পারে!

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে—কবিতার উৎকর্ষই সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য, নিয়মপরতন্ত্রতা পরে। রচনার নিয়ম ত আর আগে হইতে উদ্ভূত হয় না। কবিতা-বিশেষের সুন্দর গঠন-প্রণালী, ও শিল্প-সৌষ্ঠবের আলোচনা হইতেই রচনার নিয়মাবলী নিরূপিত ও নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং নির্দ্দিষ্ট কোনও একটি নিয়মের ব্যতিক্রম সত্বেও যদি কোনও কবিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সে নিয়মের মর্য্যাদা রাখিতে বাধ্য নই। বরং সে নিয়মের ব্যতিক্রমই নূতন নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। প্রমথবাবুর কিন্তু এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কারণ,তিনি গোড়া হইতেই পেত্রার্কার আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণ করিবার প্রকাশ্য সঙ্কল্পে সনেট লিখিতে বসিয়াছেন এবং যেখানেই তিনি তাঁহার আদর্শ ও নিয়ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন—সেইখানেই তাঁহার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে, এবং রচনায়ও নানা দোষ দেখা দিয়াছে।

এইখানেই সমালোচ্য পুস্তকের ত্রুটীর তালিকা শেষ হইল। এখন আমরা পাঠকের সহিত প্রমথবাবুর কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিব।

প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। প্রধানতঃ এই বিশেষত্ব তাঁহার মানসিক দৃষ্টিতে। তিনি যে কোনও বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহার বর্ণনায় বা রহস্য-উদ্ভাবনে যতই কেন চিন্তার গভীরতা বা প্রগাঢ়তা থাক্, তাহার ভিতর হাসির একটু আভাস, পরিহাসের একটু জ্বালা দেখা যায়।—তিনি জীবনের কোনও বিষয়কেই এত বড় মনে করেন না—এত প্রাধান্য দেন না যে, তাহার খাতিরে জীবনের অপর সকল বিষয়কে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংসার, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশমাত্র, কোনটাই সমগ্র জীবন নয়। একের জন্য অপর কোনটিকে তুমি উড়াইয়া দিতে পার না। তুমি যাহাকে এত বড় করিয়া দেখিতেছ, তাহার ভিতরেও ক্ষুদ্রত্বের উপাদান আছে। তাই তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু-বিষয়-সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু-বিষয়-সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু—তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দ্দেশ-ভঙ্গী আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসা-কল্পে বলিতেছেন। বিখ্যাত সমসাময়িক ফরাসী-লেখক Anatole Franceএর মনের প্রকৃতি অনেকটা এই ধরণের।

এই ভাব ও মনোভঙ্গীর উপযুক্ত সহায় তদুপযোগিনী ভাষা! প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাধীনতা এবং নির্ভীকতার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি। উপরের কথিত মনোদৃষ্টি ইহার স্পষ্ট এবং যথেষ্ট প্রমাণ। সমাজ ও ধর্ম্মমন্দিরের "আপনি-মোড়ল" প্রহরী-দিগের ভয় তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র থাকিলেও তিনি তাহাদের অন্ততঃ মুখে স্বীকৃত, অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় সকল সম্বন্ধে তীব্র বিদ্রূপের সহিত লঘুভাবে লিখিতে সাহস করিতেন না এবং সাহিত্যের ঐ শ্রেণীরই অনুরূপ রথীদিগের "দরকারী ভাব আর সরকারী ভাষা"র উপর তাঁহার সামান্যমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, তাঁহার অভিধান ও শব্দভাণ্ডার এত উদার ও বিস্তৃত হইত না। তিনি কোনও শ্রেণীর শব্দকেই নির্ব্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গ-কুলীন "সাধু" শব্দের সঙ্গে তিনি জাতিহীন "ইতর" শব্দকেও এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। তাহাতে যে ভাষার শক্তি বাড়িয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে?—ভাষার জীবন শব্দে। যখন দেখিবে, শব্দ-সংখ্যায় গণ্ডী পড়িয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে, ভাষার জীবনীশক্তিরও হ্রাস হইতেছে।

কবির যে মনোধর্ম্মের কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার "বিশ্বরূপ"; "বিশ্বকোষ", "বিশ্বব্যাকরণ" ও "আত্ম-প্রকাশ" নামক কয়েকটি সনেটে বেশ সুপ্রকাশ। বিশ্বরহস্য লইয়া এক শ্রেণীর লোক এত উন্মত্ত যে, তাহারা জীবনকে জীবন বলিয়া উপভোগ করিতে পারে না—তাহারা অনুক্ষণ তর্কবিতর্কে মত্ত। কবি কিন্তু বিজ্ঞের ন্যায় কল্পনা-সুখে তাঁহার

গুম্ফপ্রান্তে লঘু আকর্ষণ দিয়া ঈষৎ হাস্য-রঞ্জিত-অপাঙ্গে বলিতেছেন,—

"বিশ্ব সনে দিনরাত শুধু বোঝা পড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া!"

"তার চেয়ে" এস এই বিপুল বিশ্বে ছড়ান প্রক্ষিপ্ত সকল টানিয়া লইয়া,

"প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দ্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দ্দশ লোক!"

কিন্তু মানব-প্রকৃতি এমন নয় যে, গোলকধাঁধার ভিতর মানুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে। "অন্বেষণ" নামক সুন্দর সনেটে কবি বলিতেছেন :—

"আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই!
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই॥
কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎপ্রসব,
পূজা করি নির্ব্বিচারে শিব কি কেশব,—
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই॥
রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন॥
খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়,—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।

বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত-স্বর ॥"

নবম দশম চরণে সহজ অথচ অর্থপূর্ণ স্বল্পকথায় ভাবপ্রকাশে কবির অসামান্য ক্ষমতা পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন। "অনাহত-স্বর" Keatsএর "unheard melodies" অপেক্ষা সুন্দর।

নিম্নে উদ্ধৃত "শিব" নামক সনেটে দেখিবেন, কবির "অন্বেষণ" ব্যর্থ হয় নাই :—

"রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া,
চন্দ্র তব ললাটের চারু আভরণ,
তব কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্ধুর বরণ,—
বিশ্বরূপ জানি আমি তব দৃশ্যমায়া ॥
যার স্ফূর্ত্তি চরাচর, সে ত তব জায়া
নিজদেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ,
তাই হেরি কৃত্তি তব চিত্র-আবরণ,—
জীবনের আলোশ্লিষ্ট মরণের ছায়া।
তোমার দর্শন পাই মূর্ত্তিমান মন্ত্রে,
যজ্ঞসূত্রে বাঁধা যাহা হৃদয়ের তন্ত্রে ॥
সেইরূপ রেখো দেব ভরিয়া নয়নে,—
শিবমূর্ত্তি হেরি বিশ্বে, দেহ এ ক্ষমতা।
ধরিতে পারি না আমি নেত্রে কিংবা মনে,
আকারবিহীন কোন বিশ্বের দেবতা ॥

যে দেশের শাস্ত্র-শিক্ষা হইতেছে—

"যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈ রিদং ধর্ম্মং সনাতনম্।"

সে দেশের কবি যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বিশাল বিরাট শিবমূর্ত্তি বিশ্বময় দেখিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়—না দেখাই আশ্চর্য্য।

"মুস্কিল-আসান" সনেটে কবি দেখাইয়াছেন, শিবদর্শন সার্থক হইয়াছে :—

> "আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
> কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
> হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা'
> আকাশেতে শুনি বাণী 'মুস্কিল-আসান।'

কিন্তু লগ্ন হারাইলে ভক্তিও জন্মিবে না, এবং দেবদর্শনের ফললাভও হইবে না।

> "কতদিন কত দেশে কত শত ভোরে,
> অসংখ্য ফুলেতে ভরা কত ফুলবনে,
> ফিরেছি অলসভাবে, একা, আনমনে,—
> তুলিনি পূজার লাগি কিন্তু সাজি ভরে' ॥
> কতদিন কত দেশে সারা নিশি ধরে',
> থেকেছি বসিয়া আমি মন্দিরের কোণে,
> স্নিগ্ধ দৃষ্টি কত শত দেবতার সনে,—
> করিনি প্রণাম কিন্তু জুড়ি' দুই করে ॥
> আগে শুধু ক'রে গেছি এই সব ভুল।
> এখন দেবতা কোথা, কোথা সেই ফুল!

নিম্নলিখিত সনেট্ মানব-জীবনের একটি পরিচিত নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার মর্ম্মস্পর্শী করুণ চিত্র :—

"প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ম্ময় মণি,—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্ত্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,
পরায়েছি শ্যাম শাটী মরকতে বুনি,
রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে॥
প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুক্তা-নির্ম্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিংবা দিতে বিসর্জ্জন!

আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, দেহপাত প্রাণপাত করিয়া, কত যত্ন ও আদরে আমাদের সাধ ও আশাকে গড়িয়া তুলি—কিন্তু হায়! যখন চেষ্টার শেষ অঙ্কে উপস্থিত হই, তখন যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা কোথায়? যে জন বা যে বস্তু পাইবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস—জীবনসর্ব্বস্বদান, তাহাকে ত পাইলাম না—অথচ যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তাহার চিন্তাই বা কি করিয়া ত্যাগ করি।

প্রায় সমস্ত সনেট্‌গুলি এমন সুন্দর যে, উদ্ধৃত করিতে গেলে সমস্ত পুস্তক উদ্ধৃত করিতে হয়। ইহাতে কেবল একমাত্র আপত্তি,

স্থানাভাব। সনেট্‌গুলি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা তাহাদের শ্রেণী-নির্দ্দেশ করিয়া এবং অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গ্রন্থের প্রারম্ভে চারিটি সনেট্ সংস্কৃত সাহিত্যের চারিজন খ্যাতনামা কবির উপর লিখিত। যদিও তাহাদের অর্থসংগ্রহ এবং সৌন্দর্য্য-উপভোগের জন্য সেই সকল কবিদের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পাঠকের পূর্ব্বপরিচয় কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক, কিন্তু তাহারা এমন সরল সাধারণভাবে লিখিত যে, পাঠে সকলেই মুগ্ধ হইবেন। "ভাস" ও "জয়দেবে"র উপর দুটি সনেটে পরস্পরের কাব্য-প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে। এতদিন আমরা ভাসের নামমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম, সম্প্রতি তাঁহার কাব্যাবলী আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভাস সম্বন্ধে কবি বলেন:—

> "শুদ্ধ সুরে গেয়েছিলে প্রসন্ন বিভাস,
> পরিষদ ছিল তব মহাপ্রাণ আর্য্য।
> সে যুগের কবিমুখে ছিল না উচ্চার্য্য
> বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাষ॥
> স্বাধ্যায়-পবিত্র তব শূর-মুখ-বাণী।
> সন্নাসিনী অয়োগিনী তব বীণাপাণি॥"

"চোর কবি" নামক সনেট্‌টি সমুদয় না তুলিলে গ্রন্থকারের উপর অন্যায় করা হয়। কিন্তু স্থানাভাবে ষষ্ঠকটিমাত্র উদ্ধৃত হইল:—

"সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা,
করেছিলে মশানেতে নায়িকা-সাধনা।
দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যা-রূপ ধরি',
কনকচম্পকদামে সর্ব্বাঙ্গ আবরি,
সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সুন্দরী!"

কোনও চিত্রকরের তুলিকায় এমন সুন্দর লেখ্য কি সম্ভবপর? তুমি সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরীর ছবি ফলাইতে পার। কিন্তু কোন বর্ণের অজানিত মহিমা দ্বারা—কোন দেহ-ভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নাট্যকৌশলময় রেখাপাতে "প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সুন্দরী"কে আঁকিবে? মিল্টনের "Darkness Visible" মনশ্চক্ষে যে ছবি আঁকিয়া দেয়, কোন্ বর্ণে তাহা প্রতিফলিত করিবে?—বর্ণ ও রেখার অপেক্ষা শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি অশেষ গুণে অধিক। শব্দের শক্তি অসীম। "শব্দ ব্রহ্ম"। "বসন্ত-সেনা" ও "পত্রলেখা"র পূর্ণ রসাস্বাদনের পক্ষে, পূর্ব্বে "মৃচ্ছকটিক" এবং "কাদম্বরী"র পরিচয় আবশ্যক। এই দুই সনেটে উক্ত দুইটি সুন্দর কাব্যের মধুময়ী দুটি পাত্রী, কবির স্মৃতিময়ী কল্পনাস্পর্শে মধুরতররূপে প্রতিভাত। "বসন্তসেনা"য় কিন্তু সনেটের কোনও নিয়মই রক্ষিত হয় নাই। "পত্রলেখা" আরম্ভেই চিত্ত আকর্ষণ করে।

"অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছো পত্রলেখা"!

আমরা যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার অষ্টাদশবর্ষ-পরিমিত যৌবন। তারপর আর কোনও সংবাদই পাই না।

সুতরাং যখনই তাহাকে মনে পড়ে, তখনই তাহার সেই অষ্টাদশ বর্ষের উজ্জ্বল যৌবন-মাধুরী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যে ভূভাগে অষ্টাদশবর্ষ নিত্য বিরাজিত—"যৌবনাস্তং বয়ো যস্মিন্"—"পত্র-লেখা" সেই দেশের নিত্য অধিবাসিনী।

"রজনী-গন্ধা" ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ফুলের উপর লিখিত সনেট্-গুলি বিচিত্র কল্পনার বর্ণগৌরবে এবং অভিনব ভাবের অকৃত্রিম সৌরভে ফুলেরই মত সুন্দর। সকলগুলিই কবির সূক্ষ্ম রসানুভব-শক্তির পরিচায়ক—তা "ফুলের নবাব" এবং "নবাবের ফুল" গোলাপেরই উপর,বা "রতিভর তনু" কাঠমল্লিকারই উপর লিখিত হউক! তন্মধ্যে "ধুতুরার ফুল" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন অনেক বস্তু বা বিষয় আছে, যাহাদের ভিতর আমরা সাধারণতঃ উপভোগ্য কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল বিশেষ মনোধর্ম্মবিশিষ্ট কবিগণ Poe বা Baudelaire অসাধারণ কল্পনাবলে এবং সূক্ষ্ম অনুভবশক্তির প্রভাবে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, এবং সেই সকল বস্তু বা বিষয়কে আমাদের পরিচিত উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়ের সহিত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া সাধারণ মানবচক্ষে এই লুকান সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া দেন, এবং একটি অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করেন। ধুতুরার ফুলের "গন্ধ হলাহল" নূতন উপভোগের বিষয়।

রাগরাগিণীর উপর লিখিত সনেট্গুলিও ফুলের সনেট্-সমূহের ন্যায় সমান উৎকর্ষপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে "পূরবী", বিশেষত্বে "ধুতুরার ফুলে"র তুল্য-প্রকৃতি।

"পরিচয়ে" প্রকৃত প্রেমের একটি বিশেষ ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে পূর্ব্ব-স্মৃতি আহরণ করিয়া প্রেমপাত্রকে পূর্ব্বজন্মের সহিত গাঁথিয়া দেয়। প্রেমিক কোনও মতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, প্রেমের পাত্রের সহিত এই জন্মেই তাহার প্রথম পরিচয়। যে প্রেম এখন সমস্ত জীবন—সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত এবং পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বে একেবারে ছিল না, তাহার কল্পনাই অসম্ভব। প্রেমিক হৃদয় তাই গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভবের উন্মাদনায় গাহিয়া উঠিয়াছে—

তোমা সনে ছিল জানি পূর্ব্বপরিচয়,—
মন কিন্তু যুগস্মৃতি করে না সঞ্চয়।

রবীন্দ্রনাথও গাহিয়াছেন—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

এবং পূর্ব্বজন্মে অবিশ্বাসী খ্রীষ্টান কবিও গাহিয়াছেন :—

Has this been thus before ?
And shall not thus time's eddying flight
Still with our lives and love restore
In deaths' despite,
And day and night yield one delight once more.

"উপদেশ" নামক সনেটে প্রমথবাবু "প্রিয়কবি" এবং "বড়কবি" হইবার দুরাশায় "উদ্বাহু-বামন" দিগকে তীব্র বিদ্রূপের চিহ্নিত-পৃষ্ঠ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে :—

"কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ,
সে দেশ জানে না কিন্তু মোদের ভূগোল,—
সত্যের সেখানে নেই কোন গণ্ডগোল,
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ !"

পরবর্ত্তী সনেটের বর্ণিত "স্বর্ণলঙ্কা" সেইরূপ একটি কল্পনার দেশ ! সেখানে,

"লীন হ'য়ে প্রিয়া-অঙ্কে, সুবর্ণ পালঙ্কে,
কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে !"

"ব্যর্থজীবন" নামক বিদ্রূপাত্মক সনেট্‌টি সাধারণ বাঙ্গালীবাবুর সুন্দর ছায়াচিত্র, Silhouette,

আমরা "রজনীগন্ধা" সনেটের অপ্রশংসা করিয়াছি। অনেকটা সেইরূপ ভঙ্গী এবং ধরণে লিখিত হইলেও "ভুল" নামক সনেটটি ভাব ও রসের মহিমা ও মোহিনীতে অতুলনীয় :—

"ভাল তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
যেদিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি !—
বকুলের গন্ধ বল কতদিন রয় ?
সেদিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,

ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।
বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয় ?
স্বপ্ন মোরা ভুলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে,
সাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে॥
নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার !"

প্রবন্ধ নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন মোটের উপর প্রমথবাবুর কবিতা ও রচনা-শক্তির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া সমালোচনার উপসংহার করিব। তৎপূর্ব্বে আমাদের একটি নিবেদন আছে। এই প্রবন্ধে অনেক সনেটের বিশেষ উল্লেখ হইল না, তাহাতে পাঠকগণ এমন ভাবিবেন না, তাহারা কোনও অংশে উদ্ধৃতগুলির অপেক্ষা হীনগৌরব।

কবিতার যে তিনটি লক্ষণ মহাকবি Milton চিরকালের জন্য অভ্রান্তরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন—Simple (সরল),— Sensuous (বস্তুতন্ত্র), এবং impassioned (আবেগময়), এই তিনটি লক্ষণই প্রমথবাবুর সনেটগুলির মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা এবং ভঙ্গী যারপর নাই সরল এবং সহজ। তাঁহার ভাব যেমন অকৃত্রিম, পূর্ণ এবং পরিণত, তাঁহার ভাষাও সেইরূপ সরল, প্রাঞ্জল এবং বাহুল্যহীন। তাঁহার সনেটগুলির ভিতর

অস্পষ্ট বা জটিল কিছুই নাই। দিবালোকের স্থায় সকলই স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ। তাঁহার কবিতা Sensuous অর্থাৎ শরীরী, রূপ-রস-বিশিষ্ট, ধরিবার এবং ছুঁইবার—কেবল অপরিণত ভাবের কুজ্‌-ঝটিকা নয়। এবং impassioned—সমস্তই প্রবল ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। পাঠক দেখিবেন, প্রমথবাবুর এমন কোনও কবিতা নাই—তিনি এমন কোনও শব্দই ব্যবহার করেন নাই, যাহা রূপ-রস-হীন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—

"হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর
উঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।"
"নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,—"
"বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিতে বুঝে মুখে লাগে ধন্ধ॥"

শুধু পণ্ডিতে নয়—উল্লেখযোগ্য সকল-কবিই—Homer হইতে Swinburn পর্য্যন্ত এবং বাল্মীকি হইতে অক্ষয়কুমার পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাব্যে এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। এই "অশরীরী মনঃ স্পন্দনে"র আতিশয্য হেতুই রূপ-রস অর্থাৎ Sensuousnessএর অভাবে Emersonএর কবিতা সাহিত্যে আদর পায় নাই। রহস্তের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আমাদের দেশে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা এতই নিরাকার-পরায়ণ এবং অরূপের পক্ষপাতী যে, তাঁহারা সাহিত্যে sensuousness কেন, senseএর গন্ধ পাইলেই ক্ষেপিয়া

উঠেন। বোধ হয়, এই সাধু-সম্প্রদায় sensuous এবং Sensual এই দুই কথার অর্থ-বিভিন্নতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কবির কার্য্য শব্দ এবং বাক্য লইয়া। এখন দেখা যাক, প্রমথ-বাবুর এ বিষয়ে সৌভাগ্য কিরূপ। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি এবং মনীষী Coleridge বলেন,—"Good Prose is proper words in their proper places; good verse is —the most proper words in their proper places— উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল গদ্য—সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল পদ্য। এখন শব্দ এবং শব্দ-সমষ্টি, বাক্যের উপযোগিতা কিসে?—ব্যঞ্জনায়। অর্থাৎ, শব্দ এবং বাক্যের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত আভাসে। গদ্যের পক্ষে ইহা অতিমাত্রা। পদ্যে আমরা চাই প্রাঞ্জল বিবৃতি। তৎপক্ষে পরিমিতার্থ শব্দ এবং বাক্য আবশ্যক। আমি এমন বলিতেছি না যে, গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তি-বিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্যের প্রবেশ-নিষেধ। ইহার বাহুল্যই গদ্যের হীনতা-জনক। তাহাতে গদ্যের প্রাঞ্জলতা নষ্ট হইতে পারে। তবে যে গদ্য প্রবল ভাবের আবেগে উদ্দীপ্ত—অর্থাৎ যে গদ্য নিজের সীমানা অতিক্রম করিয়া পদ্যের সীমানা আক্রমণ করে, সে গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তি-বিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্য আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। শব্দের আর একটি শক্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যে অব্যক্ত ইন্দ্রজাল বা মোহিনী আছে, তাহাকে প্রতিফলিত করা। এই অব্যক্ত ইন্দ্রজালকে ভাষায় আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই কবির কার্য্য। একটি ভাবের জন্য—

একটি বিষয়ের অঙ্কন-উপযোগী—একটিমাত্র অদ্বিতীয় কথাই আছে—যাহার সংস্পর্শে প্রণয়িনীর চুম্বনের ন্যায় (the very kiss of the beloved) ভাব জাগিয়া উঠে। এইরূপ কথা-নির্ব্বাচনে অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা দেখিতে পাই—বিদ্যাপতি এবং অপর দুই একটি বৈষ্ণব কবিতে—ভারতচন্দ্রে এবং রবীন্দ্রনাথে। প্রমথবাবুর অনেকগুলি সনেটেও এই শব্দসম্পদের নিদর্শন পাই।

আবার শব্দ অপেক্ষা সুরের ব্যঞ্জনা-শক্তি অনেকগুণে অধিক। ভাব বা অনুভবের আবেগ ও গভীরতা, যাহা ভাষায় অপ্রাপ্য—সুরের অপৌরুষেয় মহিমায় তাহা অনায়াসলভ্য। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সুর-সম্পদ আশ্চর্য্য। বিদ্যাপতির "সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়"—এই কয়টি সামান্য কথার প্রকাশশক্তি সামান্য,—কিন্তু ইহাদের ভিতর যে সুরের অসামান্য আবেগ আছে—তাহাতে অনুভবের আবেগ পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। কয়টি কথার আকুল স্বরে আমরা প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ের অশ্রুময়ী আকুলতা আমাদের নিজ হৃদয়ে অনুভব করি। যে প্রেম জীবন মরণকে আত্মসাৎ করিয়া রহিয়াছে—যাহার উল্লেখমাত্র হৃদয় বিবশ—নয়নপত্র আর্দ্র হয়,—সেই প্রেমের করুণ-চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। পাঁচটিমাত্র কথা। কিন্তু এমন অশ্রুসিক্ত পদ আর দ্বিতীয় কোথায় ?

প্রমথবাবুর রচনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতায় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যাহা প্রবাদ-বচনের ন্যায় শাণিত—সংক্ষিপ্ত এবং জীবনের অনেক বিষয়ে লাগাইবার

উপযোগী—যাহাকে Mathew Arnold—Criticism of life—জীবন-ঘটিত ব্যাপারের আলোচনা বলেন, এবং প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সেক্ষ-পীয়ার এবং কালিদাসের অসাধারণ সৌভাগ্য। তাঁহাদের নীচেই পোপের নাম করা যাইতে পারে। প্রমথবাবু নিজেই বলিয়াছেন, ভাষার এই চুটকি সম্পত্তির দিকে তাঁহার আন্তরিক টান :—

"আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার,
চুটকিতে রাখি যত আশা ভালবাসা।"

প্রমথবাবুর পুস্তকে আমরা উচ্চ প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ এবং বিস্তারিত সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় পাই। প্রতিভার প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এবং ললিতকলাচর্চ্চার প্রণোদনা দেখি। তিনি স্বভাব-কবি—তাঁহার নিজের খাঁটী বাঙ্গলায় "জাতকবি"—হইলেও কেবলমাত্র বাগ্‌দেবীর "ভর" লইয়া না থাকিয়া নিজের স্বাভাবিক শক্তিসমূহকে বিস্তর অনুশীলনে কর্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার সুন্দর কলাসৌষ্ঠব এই অনুশীলনের ফল। তিনি কবি এবং—Artist—কলানিপুণ। এবং উহারই বলে "সনেট্-পঞ্চাশৎ" তাঁহার প্রথম পুস্তক হইলেও, তাহাতে আমরা শিক্ষানবীশের অনুচিকীর্ষা, অসম্পূর্ণতা বা অক্ষমতা কোথাও দেখিলাম না। সমস্তই পাকা হাতের লেখা। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনার সঙ্গে বহু এবং বহুকালব্যাপী পরিচয় থাকার দরুণ ললিতকলার সকল অঙ্গই তাঁহার সুপরিচিত। লিখিতে

বসিয়া তাঁহাকে আদর্শহীন হইতে বা আদর্শের জন্য হাতড়াইতে হয় নাই। বিস্তারিত সাহিত্যচর্চ্চার ফলে যে কলাসৌন্দর্য্য অতর্কিতভাবে তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছে, তাহাকে তাঁহার সাহিত্যিক "সংস্কার" বলা যাইতে পারে। এই সংস্কার-পুষ্ট প্রতিভাবলে তাঁহার সনেট্‌গুলি, কল্পনাসম্পদে—ভাবপ্রকাশে—ভাষা ও ভঙ্গীগৌরবে এবং শ্রুতিমাধুর্য্যে এক রবিবাবু ছাড়া সম-সাময়িক কোনও কবির রচনা অপেক্ষা হীনশ্রী নহে।

অলীক বাবু

আমি "অলীক বাবুর" প্রথম পরিচয় পাই অভিনয়-মঞ্চে। সে আজ অনেক দিনের কথা। এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবিবাবু অলীকপ্রকাশ সাজিয়াছিলেন। যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে। যিনি সত্যসিন্ধু বাবু সাজিয়াছিলেন, তাঁহার অভিনয় চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অপরাপর পাত্রদিগের অভিনয়ও অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল।

অভিনয়ের গুণে রসহীন, অকিঞ্চিৎকর নাটকও মনোহর হইয়া উঠে। এমন অনেক নাটক আছে, রঙ্গমঞ্চে যাহাদের খুব আদর, অথচ সাহিত্যে তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু কেবলমাত্র অভিনয় চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি প্রথম পরিচয়ে অলীক-বাবুর অনুরক্ত হইয়া পড়ি নাই। গ্রন্থকারের অট্টহাস্যময়ী রঙ্গিণী কল্পনার উল্লাস-লাঞ্ছিত লাস্য-লীলা-তরঙ্গে হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল। ইহার ভিতর একটি নিতান্ত অভিনব রস উপভোগ করিয়াছিলাম। আমাদের সাহিত্যে ইহা একটি নূতন সামগ্রী।

বাঙ্গলায় অনেকগুলি সুন্দর প্রহসন আছে—"একেই কি বলে সভ্যতা", "সধবার একাদশী" প্রভৃতির কৌলীন্য-গৌরব কে না

স্বীকার করে? হালের আমলে "বিবাহ-বিভ্রাট" সম্বন্ধে কোন-রূপ মতবিভ্রাট নাই। ইহারও উপাদেয়তা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু "অলীক বাবু" ইহাদের সকলগুলি হইতে স্বতন্ত্র।

সাধারণতঃ, ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজবিশেষ প্রহসনের লক্ষ্য হইয়া থাকে। সমাজের কোন কুপ্রথা বা কুরীতি, ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন দোষ বা গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া, তাহার হাস্যজনক, বিদ্রূপাত্মক বিকাশই প্রহসনের কার্য্য। আমরা যে কয়েকখানি প্রহসনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদেরই ভিতর প্রহসনের এই ধর্ম্ম বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। "একেই কি বলে সভ্যতায়" পূর্ব্বতন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট, ইংরেজানুকরণপ্রিয়, আমোদরত বঙ্গ-যুবকের "বেলেল্লাগিরির" হাস্যজনক চিত্র। ঐ সকল গুণই বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহমধ্যে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে বিবিধবর্ণে পরিস্ফুট করিয়া "সধবার একাদশী" রচিত। ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিতা, জাতীয়-ভাব-বিচ্যুতা বঙ্গনারীর সহিত শিক্ষাহীন, চরিত্রহীন বঙ্গযুবকের পরিণয় অবস্থা-বৈচিত্র্যে কিরূপ হাস্যজনক হইয়া থাকে, "বিবাহ বিভ্রাট" তাহারই উজ্জ্বল কল্পনা। কিন্তু সমালোচ্য প্রহসনে এরূপ কোন ব্যঙ্গ বা অপর উদ্দেশ্য নাই। ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সরল, উজ্জ্বল, বালক-সুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি—নিছক বিশুদ্ধ হাসি। কল্পনা উদ্ভট হইলেও সুস্থ অবিকৃত বালকহৃদয়ের কল্পনা। এই আনন্দোজ্জ্বল, সরল অথচ উদ্ভট কল্পনাতেই গ্রন্থের গৌরব—গ্রন্থকারের প্রতিভা।

অনেক লোক মিথ্যা কথা কহে, কিন্তু অলীকপ্রকাশের ন্যায় কে কবে অদ্ভুত মিথ্যা বলিয়াছে? ইহাতে তাঁহার বিস্ময়কর পটুতা, প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাবিশেষ। কোথাকার কথা কাহার সহিত সংযোগ করিয়া শ্রোতার "তাক" লাগাইয়া দেন। কিন্তু রহস্যের এখানেই শেষ নয়। তাঁহার সেই উদ্ভট মিথ্যার সূত্র ধরিয়া তাহারই অনুসৃতিস্বরূপ, কোন যাদুকরের মোহমন্ত্র এমন সব ঘটনা ঘটাইতেছে যে, অলীকপ্রকাশ নিজেই তাহাতে বিস্মিত —স্তম্ভিত।

গল্পের একটু আভাস দেওয়া যাক্।

অলীকপ্রকাশ ইংরেজীতে সেক্সপীয়ার-কৃত ওয়েব্‌ষ্টর ডিক্‌সানারি নামক নভেল প্রভৃতি, এবং সংস্কৃতে কালিদাস-কৃত মুগ্ধবোধাদির পাঠ সমাপনে অশেষ বিদ্যা-উপার্জ্জনানন্তর বিক্রমাদিত্যবংশাবতংস কামাখ্যাধিপতির মনোরমা নাম্নী তদ্গত-প্রাণা, অতীন্দ্রিয়সত্তা আত্মজাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, সত্যসিন্ধুবাবুর বঙ্কিমী নভেলে দীক্ষিতা, অনির্দ্দিষ্ট-ভাবি-পতির বিরহ-ব্যাকুলা কন্যারত্ন হেমাঙ্গিনীর পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন। হেমাঙ্গিনী হাতের কাছে ইন্দ্রিয়গোচরে কল্পনার ধনকে অলীকপ্রকাশ-রূপে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় করে আত্মসমর্পণ করিতে অধীরা। কিন্তু পিতা সত্যসিন্ধু নিয়ম করিয়াছেন, "পরীক্ষা না ক'রে কারো সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেবো না।"

আজ কলিকাতার একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে, 'অলীকি' ভাষায় পৈত্রিক ভিটায় বসিয়া, অলীকবাবু সেই পরীক্ষা দিতেছেন।

এই "লম্বা-চৌড়ো" জগতে এবং এই "লম্বা-চৌড়ো" জগৎ ছাড়া যেখানে যত কিছু "লম্বা চৌড়ো" কথা আছে, নিজের অসামান্ত প্রতিভা-বলে তিনি সত্যসিন্ধুবাবুর নিকট অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। যখন কথার পরিমাণ সম্ভবের পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে, তখন অভাবনীয়রূপে অগোচর শক্তি-বলে, কে যেন প্রকৃত ঘটনা সংযোজনে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দিতেছে। সেই অশেষ, অসহ্য হাস্তরসের কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠককে দিব। অলীকপ্রকাশ সত্যসিন্ধুবাবুকে জানাইয়াছিলেন যে, "হদ্দ পাঁচ লাখ" টাকা ব্যয় করিয়া তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় একখানি নূতন বাড়ী করিয়াছেন—এবং তাহার পরেই বাটীর জীর্ণতাবশতঃ তাহা দেড় লক্ষ টাকায় নাটু ভাইকে বিক্রয় করিয়াছেন। এমন সময়ে সত্যসিন্ধুবাবুর হঠাৎ হাজার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি অলীকপ্রকাশের নিকট কিছুদিনের জন্য ঐ টাকা ধার চাহিলেন। পাঠক সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা অবধান করুন :—

"সত্য। (একটা কাগজ হস্তে) আমার কাছে দেখ্‌চি এখন বেশি টাকা নেই। ভাল কথা—বাপু অলীকপ্রকাশ, তুমি আমার একটা উপকার কর্ত্তে পার?

অলীক। কি বলুন না মহাশয়—আপনার উপকার আমি কর্‌ব না?

সত্য।—এমন কিছু না—হাজার টাকা আমার প্রয়োজন হয়েছে—এখন আমার হাতে অত টাকা নেই—যদি তুমি বাপু—

অলীক। (মুস্কিলে পড়িয়া চিন্তা) অ্যাঁ—অ্যাঁ। (স্বগত) হাজার পয়সা

নেই তো হাজার টাকা (প্রকাশ্যে) এখন তো আমার কাছে মশায় অত টাকা নগদ নেই।

সত্য। বাঃ সে কি বাপু ? সে টাকাগুল কোথায় গেল ?

অলীক। কোন্ টাকা ?

সত্য। কেন, বাড়ী বিক্রী করে যে টাকাটা পেয়েছ।

অলীক। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) আমার বাড়ী ? (পরে সাম্‌লে নিয়ে) ও ! —হাঁ হাঁ সত্যি—তবে আসল বৃত্তান্তটা শুন্‌বেন ? এইমাত্র আমি—

সত্য। কি !—এত টাকা এর মধ্যেই খরচ করে ফেলেছ ?

অলীক। না-না—হাঁ—এক রকম খরচই বটে।—তবে সত্যি কথা বল্‌ব ? আপনার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে ? (মৃদুস্বরে) আমার কিছু ধার ছিল, তাই ঐ টাকাটা দিয়ে শুধেছি। মশায় সংসারে থাক্‌তে গেলে কিছু না কিছু ধার কত্তেই হয়। আবার হয়েছে কি মশায়, চুনিলাল নামে যে খোট্টার কাছে আমি বাড়ী বিক্রী করেছিলেম—তার কাছে—

সত্য। এই একটু আগে যে তুমি আমাকে বলেছিলে তার নাম নাটু ভাই।

অলীক। কি ?—হ্যাঁ তাইতো। তার নাম চুনিলাল নাটু ভাই। আগে সে একজন মস্ত দালাল ছিল—এখন এখানে বড়বাজারে একটা জুয়া খেল্‌বার আড্ডা করেছে। তা মশায়—এই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমি পূর্ব্বে টাকা ধার করেছিলেম। তা মশায়, সে যখন আমার কাছ থেকে বাড়ীটা কিনে নিলে তখন ঐ বাড়ীর দামের টাকাতে আমার ধারের টাকা শোধ্ বোধ্ হয়ে গেল।

সত্য। ভাল বাপু—কত তার ধার্‌তে ?

অলীক। এক লাখ টাকা।

সত্য। তুমি যে বাপু দেড় লাখ টাকায় তোমার বাড়ী বিক্রী করেছিলে, তা হ'লে এখনও তো তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে পাবে।

অলীক।—হ্যাঁ—আমিও—আমিও—আমিও তো তাই বল্‌তে যাচ্ছিলেম —কিন্তু—কিন্তু—

সত্য। বাপু তোমার এই বাড়ীর গল্পটা সর্ব্বৈব মিথ্যা বোধ হচ্চে। আমার বেশ প্রত্যয় হয়েছে যে নাটু ভাই—না কি ভাই যে তোমার বাড়ী কিনেচে বল্‌চ, সে লোকটী তোমার কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

অলীক। সে কি মশায়!—তা কি কখন হ'তে পারে?—আপনি বলেন কি?—আমার কল্পনা?—তা কি ক'রে হবে?—আপনি প্রণিধান কোরে বিবেচনা ক'রে দেখুন না—আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌বার লোক? আপনি কি শেষ এই ঠাওরালেন? আপনার মতন লোকের এ বিবেচনাটা কি ভাল হ'ল?

প্রসন্ন। (অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া) নাটু ভাই না কি একজন লোক দেখা করতে এসেছে।

(একজন বুড় চসমা নাকে হিন্দুস্থানী দালালের বেশে গদাধরের প্রবেশ)

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি?

সত্য। (অবাক হইয়া) অ্যাঁ? এ কি?

নাটু। (অলীকের প্রতি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে) মশা হামাকে মাপ করতে হোবে—হপনাকে হামি একটু দেক্ করতে আসিছি—হমার দস্তুর আছে কি যে 'আগাড়ি কাম—পিছে সেলাম'—হামি মশায় গোলাম হাজির আছে—একটু উঠ্‌তে আজ্ঞে হোয়—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) অলীকবাবুর সাথ্ হমার কুছ্ বাত চিত্ আছে মশা।

সত্য। কোন গোপনীয় কথা আছে নাকি? আমি তবে যাই।

নাটু। না না মশা হাপনি যাবে কেন?—বইস না—বইস না।

অলীক। এ ব্যাটা কে রে?

নাটু। (কথা টেনে টেনে) ভালা—অলীকচন্দ্র বাবু-উ-উ—হম জান্‌নে কো আয়া-য়া-য়া—তোম্ ও বাড়ীকো বাৎ শেষ করেগা কি নেহি?

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমার বাড়ী?

নাটু। হাঁ বাবু, যো বাড়ী তোম্ হমার কাছে বিক্রি করিয়েছে ঐ বাড়ীর কথা হামি বল্‌ছে—এখন ঐ বাড়ী হামাকে দখল দেলাতে হোবে—এখন বুঝিয়েছে কিনা মশা? জল্‌দি কাম শেষ করিয়ে ফেলো মশা—হমার দস্তুর আছে কি যে—'আগাড়ি কাম্—পিছে সেলামি'।

অলীক। সেই জন্য আপনি বুঝি—ইয়ে কত্তে—ইয়ে হয়েছে—(সত্য-সিন্ধুর প্রতি) মশায় এর কিছু মানে বুঝেচেন? ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারিচিনে—আশ্চর্য্যি!

সত্য। বিলক্ষণ। আশ্চর্য্যটা কিসের?—তুমি তোমার বাড়ী এঁকে বিক্রি করেছ, তাতে আবার আশ্চর্য্য কি?

অলীক। (স্মরণ হওয়াতে) না—এতে আর আশ্চর্য্য কি? (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি না কি? আমি ত কিছুই এর ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যা হোক্ দেখা যাক্ কত দুর যায়। (প্রকাশ্যে) আমি বল্‌ছিলেম কি যে, এত অল্প দামে—

নাটু। বলো কি মশা—সওদা ঠিক হয়ে গেইছে—আর কি ফের ফার হৈতে পারে? টাকা হমার পাস নগদ আছে—যখনি চাবে তখনি হমি দিতে পারে—

অলীক। (স্বগত) এর মানে কি? বোধ হচ্চে সব দম্‌বাজি। রোস্ ওর ফাঁদেই ওকে ধর্‌চি—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা জি তুমি যে বল্‌ছ নগদ টাকা সঙ্গে এনেছ—আচ্ছা টাকাটা দিয়ে ক্যাল দি কি।

নাটু। অল্‌বৎ মশা (পকেট হাতড়াইয়া নস্যের ডিপে বাহির করণ) হামি তোমার কাছে যে এক লাখ টাকা পাব তার কি করিয়েছে মশা?

অলীক। তুমি আমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা পাবে, আমি তোমার কাছ থেকে তেমনি দেড় লাখ টাকা পাব। আচ্ছা তুমি এক লাখ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা আমাকে দেও।

নাটু। তোমার উকিলের পাস্ হামি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দিয়েছে, সেখোগে যাও মশা।

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমার উকিলের কাছে জমা করে দি... (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে যে বর্ত্তিয়ে যাই (প্রকাশ্যে) এ যদি ঐ টাকাটা নগদ দিতে পার জি তা হলে আমারও উপকারে আসে, আর এই বাবু মহাশয়েরও উপকারে আসে, (স্বগত) নগদ টাকাটা পেলে বড় মজাই হয়।

নাটু। ওতো ঠিক বাৎ আছে মশা। তোমার মতন লোকের টাকার বহুৎ দরকার আছে হামি তা জানে ; বিশেষ তোমার আবি টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে না কি।

অলীক। আমার টাকা ডেপজিট্।

নাটু। হাঁ মশা, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দাওয়ানি কাম নিতে হ'লে টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে।

সত্য। কর্ম্মের কথাটাও তবে সত্যি না কি ?

নাটু। সে তো সব কোই জানে মশা যে, হানাবেরল জগদীশচন্দ্র মুখুয্যিয়া উন্‌কো মুরুব্বি আছে। কামের ভাবনা কি ? উঁর সঙ্গে সকালে এই মাত্র হমার দেখা হইছে।

অলীক। (স্বগত) না এ আমাকে হারিয়েছে আমি জান্‌তেম আমার আর জুড়ি নেই কিন্তু এ যে দেখ্‌চি আমার ঠাকুরদাদা—এর মতন কেহোয়া আমি ত আর দুনিয়ায় দেখিনি ; যা হোক্ ভাগ্যি এ লোকটা ছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কিন্তু এ লোকটা কে ?—আমি তো এর কিছুই বুক্‌তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) ভালা ও জি।

নাটু। এখন তবে মশা হামি আসি—হমার বহুৎ কাম আছে—কাম

থাক্‌তে মশা খুট্ মুট্ বাত্‌ চিত্‌ আচ্ছা লাগে না, হামি এই জানে মশা কি 'আগাড়ি কাম পিছে সেলাম' (প্রস্থান)

অলীক। (স্বগত) এ ব্যাটার মতন মিথ্যাবাদী তো দুনিয়ায় দেখিনি।

সত্য। বাপু আমাকে মাপ কর্‌তে হবে। আমি তোমার গল্প মিথ্যা বলে মনে করেছিলেম—কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম ঘুচ্‌ল।

অলীক। আমার কথায় মশায় সন্দেহ করেন?

সত্য। ও বিষয় তুমি কিছু বাপু মনে টনে কোরোনা—আমাকে মাপ কর —জগদীশবাবু তোমাকে যে মস্ত কর্ম্ম জুটিয়ে দিয়েছেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। আর দেখ বাপু আমার সঙ্গে একবার তাঁর আলাপটা করিয়ে দেও।

গদা। এইবার দেখ্‌চি ওঁর দফা নিকেশ হ'ল।"

কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনার আরও হাস্যজনক ইতিহাস পাঠক মূল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিবেন।

এই অপূর্ব্ব কল্পনা হাস্য-রসিকের সৃষ্টি। সাহিত্যে ইহা বিরল। বঙ্গসাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্য-রসিক মোলিয়ের (Moliere) তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকে এইরূপ হাস্যময়ী কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। এ কল্পনার ভিতর কোন বিশাল বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের গূঢ় ছায়া বা নিগূঢ় অভিসন্ধি নাই। হাসিতেও কোন জ্বালা নাই। না থাকিলেও—বা নাই বলিয়াই, ইহা অমূল্য। ইহার প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। এই স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হাসি জাতীয়-জীবনের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক—কল্যাণকর—শোভা-বিধায়ক। ইহা মুক্ত বাতাসের ন্যায় জীবনে বল ও স্ফূর্ত্তি

আনিয়া দেয়। কর্ম্ম-পীড়িত দেহের অবসাদ তিরোহিত করে এবং চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটের ভ্রুকুটি বন্ধন খুলিয়া দেয়। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই নিরানন্দ বাঙ্গলায় এখনও এমন রঙ্গময়ী প্রতিভা বর্ত্তমান, আমাদের ভিতর এমন লোকও আছেন, যাঁহার আনন্দোদ্বেল হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে এমন হাস্যময়ী কল্পনার তরঙ্গ বাহির হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, 'অলীক বাবু' যে কোন লেখকের প্রতিভা-গৌরব বাড়াইতে, এবং যে কোন সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতে সক্ষম।

রস্কিন্

ললিতকলা এবং রচনা-শিল্প।

অনন্যসাধারণ প্রকৃতি বা দুর্লভ প্রতিভার প্রেরণায় যে সকল মহাজন জগতে কোন বিষয়ে নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বা পুরাতনের জীর্ণ স্রোতে নূতন তরঙ্গ তুলিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর জন্ রস্কিন্ (John Ruskin) বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। সূক্ষ্ম-দর্শী সমালোচকেরা বলেন, বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্যে দুই জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের প্রভাব পরিস্ফুট। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল সাধারণ লেখকবর্গকে চিন্তা করিতে, যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিতে শিখাইয়াছেন।—মেকলে তাহাদিগকে প্রাঞ্জল রচনা প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে সংযমহীন বাহ্য ছটাপূর্ণ ভাষার আচার্য্যগিরি করিতে শিখাইয়াছেন। সেইরূপ জন্ রস্কিন্ যে ইংরেজ সাধারণকে সৌন্দর্য্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং ললিতকলার চর্চ্চায় নব-জীবন আনিয়াছেন, তাহাতে মতভেদ নাই। জীবনের শত তর্ক ও পাকের ভিতর, সহস্র জটিলতা ও জঞ্জালের মধ্যে সৌন্দর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—জীবনের অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্য প্রয়োজনীয়—এ শিক্ষা আমরা রস্কিনের নিকট পাই। রস্কিন্ যে শুধু সৌন্দর্য্যের পুরোহিত তাহা নয়—তিনি ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষক, অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী গদ্যলেখক, এবং চরিত্রগৌরবে আদর্শ পুরুষ।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী যেমন শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার জীবনও সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ। তিনি একাধারে জ্ঞানবীর এবং কর্ম্মবীর এবং ইহা আমাদের বঙ্গদেশ ও বাঙ্গলা জাতির কম গৌরবের কথা নয় যে, তাঁহার উদারতা এবং আন্তরিকতা—তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের অনেক সময়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মনে পড়ে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় চরিত্রবান্ ব্যক্তিদিগের পিতা-মাতাও চরিত্রবান্। রস্কিন্ নিজে যেমন অসাধারণ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার পিতামাতারও প্রকৃতি, বিশেষতঃ তাঁহার মাতার প্রকৃতিও অসাধারণ ছিল। তাঁহাদের প্রভাব তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে অনেকটা গড়িয়াছিল। তাঁহার মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও খুব সরল ছিল। তিনিই শৈশব ও কৈশোরে রস্কিনের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার পদ্ধতি সহজ ও যুক্তিযুক্ত। ফাঁকি না দিয়া সহজ অথচ প্রকৃত চেষ্টায় যাহা শিশু-ক্ষমতার আয়ত্তাধীন তাহার অতিরিক্ত পাঠ তিনি কখনও দিতেন না; কিন্তু কড়ায় গণ্ডায়, অক্ষরে অক্ষরে, তাহার হিসাব লইতেন। যতক্ষণ তাহার ভিতর সামান্ত ত্রুটি থাকিত কিছুতেই ছাড়িতেন না। একবার রস্কিন্ একটী ক্ষুদ্র কথা তাঁহার মাতার অনুরূপ হ্রস্বমাত্রায় উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি তিন সপ্তাহ্ ধরিয়া চেষ্টা করাইয়া অভিলষিত ফল লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে কিন্তু পাঠ ও পাঠনার সময় যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক ও দৃঢ়সঙ্কল্প

থাকিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন পড়িলেও বাড়ীর ভৃত্যবর্গ পর্য্যন্ত কাছে আসিতে পারিত না, এবং পরিচিত অপরিচিত যে কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, হয় তাঁহাদের পাঠে যোগ দিতে হইত, না হয় পাঠ সমাপন পর্য্যন্ত অন্যত্র অপেক্ষা করিতে হইত। বৎসরে অন্ততঃ একবার রস্কিন্‌কে বাইবেল গ্রন্থখানি আমূল পড়িয়া শেষ করিতে হইত এবং তাহার দীর্ঘ দীর্ঘ অধ্যায়গুলি কণ্ঠস্থ করিতে হইত। যদি তাহার মধ্যে দীর্ঘ বা দুরুচ্চার্য্য কোন নাম থাকিত, থাকিলই বা, তাহাতে ত উচ্চারণ শিখিবার এবং শিখাইবার সুবিধা হইত। যদি অধ্যায় বিশেষ নিতান্ত রসহীন বোধ হইত, হইলই বা, তাহাতে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় অভ্যাস করিবারই সুযোগ ঘটিত। যদি কোন ঘৃণ্য বা রুচিবিরুদ্ধ কথা থাকিত, থাকিলই বা, সে কথা যে স্পষ্টাক্ষরে ও অসঙ্কোচে বলিবার আবশ্যক হইয়াছিল এ বিশ্বাস অর্জ্জন করিবার অবসর জুটিত। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতার নিকট রস্কিন্ নিয়মিতরূপে প্রতি দিন বাইবেল পাঠ করিয়াছিলেন।

মাতৃ-অঙ্কে এইরূপ বাইবেল অধ্যয়নে তিনি যে বিস্তর শুভফল পাইয়াছিলেন তাঁহার অভ্যস্ত বাক্‌পটুতার সহিত রস্কিন্ নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শুধু যে ইহার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মজীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নয়, তাঁহার চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত নিয়ন্ত্রিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তিও বিশেষ আনুকূল্য পাইয়াছিল। মাতা শিশুপুত্রের জন্য কি সুন্দর পাঠ্যই নির্ব্বাচন

করিয়াছিলেন—হোমারের কাব্য (ইংরেজী অনুবাদ), স্কটের উপন্যাস, রবিন্‌সন্ ক্রুসো, পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্। সরস্বতীর মন্দিরে যাইবার কি উজ্জ্বল, কি মধুর, কি হৃদয়গ্রাহী পথ! প্রলুব্ধ শিশু-হৃদয় কি অব্যর্থ ও স্বাভাবিক আকর্ষণে এই কল্পনা-কুসুমিত পথে অগ্রসর হয়! হায় বঙ্গশিশু!

ইহা অপেক্ষাও মনোহর এবং চরিত্র গঠনে পটু ছিল তাঁহার অপরাপর শিক্ষা। অনেকেই শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, রস্কিনের মাতা নিজে কখন তাঁহাকে কোন খেলনা দেন নাই এবং অপর কাহাকেও এমন অবৈধ ও অস্বাভাবিক কার্য্য করিতে প্রশ্রয় দিতেন না। একবার তাঁহার মাসী রস্কিনের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে এক জোড়া খুব জমকাল পুতুল যৌতুক দিয়াছিলেন। মাতা এই প্রীতিদানে বাধা দিতে পারেন নাই, কিন্তু পরদিনই পুত্রের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর রস্কিন্ সে পুতুল দ্বিতীয়বার দেখেন নাই। রস্কিনের মা বলিতেন, শিশু নিজের খেলা নিজেই ঠিক করিয়া লইবে।

এদিকে তাঁহার কোন সমবয়স্ক মানব-সঙ্গী ছিল না, পালিত পশুপক্ষীও ছিল না। সুতরাং গৃহমধ্যে যাহা পাইতেন এবং বাহ্য প্রকৃতির যাহা কিছুতে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত তাহা লইয়াই তিনি খেলা করিতেন। গৃহের ভিতর গালিচার বিবিধ বর্ণ ও শিল্প শোভা, বিছানার চাদরের বিভিন্ন চিত্র ও কারুকার্য্য নিরীক্ষণ, সম্মুখবর্ত্তী বাটীর বহিঃপ্রাচীরের ইষ্টক শ্রেণী গণনা, ইহা লইয়াই তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। বাড়ীর

চারিদিকে প্রশস্ত সুন্দর উদ্যান ছিল, সেখানে রস্কিন্ বড় আনন্দ পাইতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন ইডন্ কাননের সহিত এই উদ্যানের সকল বিষয়েই সাদৃশ্য ছিল। কেবল ইহার একটি বৃক্ষের নয় সমস্ত বৃক্ষেরই ফল নিষিদ্ধ ছিল, এবং ইহার ভিতর কোন মানবসঙ্গপ্রিয় পশু বা পক্ষী ছিল না।

কল্পনা-চিত্রে আমরা বেশ দেখিতে পাই, শিশু একেলা সেই উদ্যান মধ্যে বসিয়া তদ্গত-চিত্তে, কখন নীল আকাশ—কখন বিবিধবর্ণ-বিচিত্র-মেঘ-শ্রেণী—কখন বায়ু-মুখর-পত্র-রাজির মধ্যে আলোকের চঞ্চল ক্রীড়া—কখন অদূরবর্ত্তী নদী-বক্ষের লহরী-লীলা দেখিতেছে—কখন বা শূন্য-দৃষ্টে স্বপ্নরাজ্যের ব্রজবনে কামধেনু লইয়া বিচরণ করিতেছে। এইরূপে শিশু জীবনেই তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তি অনুকূল অবস্থায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

উপরের লিখিত বর্ণনা পাঠে পাঠক সহসা মনে করিতে পারেন যে, রস্কিনের মাতার হৃদয় বড় একটা স্নেহশীল ছিল না, পাঠক যদি আরও অবগত হন যে, তিনি শিশু পুত্রকে কেবল খেলনা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—তাঁহাকে বাল্যপ্রিয় মিষ্টান্ন হইতেও একেবারে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন (কেবল একবার মাত্র তিনটি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল দিয়াছিলেন)—এদিকে আবার বেত্রব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না—আবদারে বেত্র—ক্রন্দনে বেত্র—অনবধানতাবশতঃ পতনে বেত্র—এই সকল জানিলে পাঠক না জানি বাঙ্গালী মাতার তুলনায় রস্কিনের

জননীকে কি ভাবিবেন। এক বিষয়ে কিন্তু কোমল-হৃদয়া বাঙ্গালী-মাতার স্নেহ-দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল—তিনি তাঁহার পুত্রকে কোন বিপদের সান্নিধ্যে যাইতে দিতেন না। জলাশয় মাত্রের ধারে যাইবার কঠোর নিষেধ ছিল, এবং পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন ইংরেজী মাতার শাসনে তাঁহাকে সত্য সত্যই শত হস্তেন বাজিনঃ এই নিরাপদ বিধান মানিয়া চলিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ রস্কিনের মাতার সন্তান-স্নেহের অভাব ছিল না—একটি ঘটনাতে তাহা বেশ প্রতীয়মান। রস্কিন্ যখন অক্সফোর্ডে (Oxford) পড়িতে যান, পাছে তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দতার ত্রুটি হয় এই ভয়ে তাঁহার মাতা গৃহ ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী পল্লীতে বাসা ল'ন।

যে স্নেহ আপনাকে সহজে সদ্যঃ চরিতার্থ করিবার প্রণোদনে স্নেহপাত্রকে অহোরাত্র লেহন করিতে থাকে—সুদূর পরিণাম দর্শন যে স্নেহের অতীত—দুর্ব্বল-হৃদয়ের সে স্নেহ তাঁহার ছিল না। তাঁহার স্নেহ জ্ঞান-মিশ্র, সংযত, পরিণামদর্শী। সত্য বটে এই নিয়ন্ত্রিত স্নেহ স্নেহপাত্রের হৃদয়ে সহসা প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে না—তাহাকে স্নেহ করিতে শিখাইতে পারে না। রস্কিনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "শৈশবে ভালবাসিতে শিখি নাই—ভালবাসার পাত্রও পাই নাই।" পিতা মাতাকে তিনি নৈসর্গিক শক্তিপুঞ্জের ন্যায় দেখিতেন—যেমন চন্দ্র সূর্য্য। তাঁহাদের বিরহে অবশ্য কাতর হইতেন। কিন্তু শৈশবে তাঁহাদের প্রতি স্নেহাকর্ষণ অনুভব করেন নাই।

কোমল শৈশবে স্নেহ-দীক্ষার এই অভাবে তিনি অপর হৃদয়ের স্নেহ-পিপাসা বুঝিতে পারিতেন না। এমন কি যখন কার্লাইল (Carlyle)—যে কার্লাইলকে অনেকেই মানব-দ্বেষী বলিয়াই জানে—এবং যাঁহাকে রস্কিন নিজ গুরু-পদে বরণ করিয়াছিলেন—যখন কার্লাইল বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ আমি এমন ভাবিতে না পারি যে আমার বিষয়ে অপর কেহ ভাবিতেছে—আমাকে অপর কেহ ভালবাসিতেছে—ততক্ষণ পৃথিবীকে মরু বলিয়াই বোধ হয়, লোক-নিবাস উদ্যান বলিয়া মনে হয় না। রস্কিন্ এই স্নেহগর্ভ উক্তির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উহার সমালোচনাকল্পে বলেন—"আমার যেরূপ শিক্ষা—তাহাতে আমার হৃদয়ে ঠিক বিপরীত-ভাবই উদয় হয়। আমার প্রকৃত সুখ সেই মুহূর্ত্তে যখন আমার জন্য কেহ ভাবিতেছে না। পিপীলিকা বা প্রজাপতি—আমার বিষয় ভাবিতেছে না জানিয়া আমার সেই বাস্ত-লগ্ন উদ্যান মরু বলিয়া ত বোধ হয় নাই; বরং আমার সান্ধ্যবিহারের সুখ আমি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিতাম না, এই ভাবনায় যে, পিতামাতা আমার জন্য ভাবিতেছেন এবং গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে চিন্তিত হইবেন। আমাকে স্নেহ প্রীতি করে এমন লোকের অভাবে পৃথিবীকে শূন্য মনে করা সুস্থ-হৃদয়ের পরিচয় নয়।"

আমরা এ প্রবন্ধে বিস্তারিত বা ধারাবাহিকরূপে রস্কিনের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার জীবন ও জীবনের কার্য্য সংক্ষেপে আলোচনা করিবার

ইচ্ছা করিতেছি। তাঁহার শৈশবজীবন একটু বিস্তৃতভাবে লিখিবার কারণ এই যে, শৈজীবন সাধারণ শিশুজীবন হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক্ ছিল। শিশুর উপর সাধারণতঃ পিতা-মাতার এবং গৃহের প্রভাবই বলবত্তর। রস্কিনের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পিতামাতার প্রকৃতি সাধারণ প্রকৃতি হইতে খুবই স্বতন্ত্র ছিল—তাঁহাদের রচিত গৃহস্থালীও স্বতন্ত্র হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহাদের প্রভাবও স্বতন্ত্র। গৃহ সম্বন্ধে রস্কিন্ কি বলেন শুনুন :—

"আমি গৃহে কখন অশান্তি বা কলহ দেখি নাই—পিতা-মাতাকে কখন পরস্পরের প্রতি বিরক্তি-রুক্ষ ভাষা বা রোষদীপ্ত কটাক্ষ প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। কোন ভৃত্যকে কখন কঠোরভাবে ভৎর্সিত হইতে শুনি নাই। সংসারে কখন ভয় ভাবনার অন্ধকার বা তাড়াতাড়ির বিশৃঙ্খলা দেখি নাই। সর্ব্বত্রই শান্তি এবং সংযম। আমার পিতামাতার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল—কারণ এমন কোন কিছুই আমাকে অঙ্গীকৃত হইত না যাহা আমি পাইতাম না; এমন কোন শাসনের ভয় আমাকে প্রদর্শিত হইত না যাহা প্রযুক্ত হইত না; এমন কোন কথা বলা হইত না—যাহা বাস্তব নয়। সুতরাং আমি তাঁহাদের আদেশ ও বিধান, আমার জীবনের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মের ন্যায় হিতকর ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধে পালন করিতাম।" আমাদের মধ্যে কয় জন এইরূপ—বা ইহার শতাংশের এক অংশ বলিতে পারেন?

শৈশবে রস্কিন্ আর একটী অতি সুন্দর এবং অপরের পক্ষে দুর্লভ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার বিস্তৃত সুরা ব্যবসায় ছিল। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহাকে বৎসরে একবার ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের নানাস্থান পর্য্যটন করিতে হইত। এই পর্য্যটনে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে লইতেন। ভ্রমণ-উপভোগের কাল ত ছিল সেই! তখন রেলপথ ছিল না। শিশু রস্কিন্ ঘোটক-যানের উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া কৌতূহল বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এইরূপে তিনি ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডের অনেক পথ ঘাট দেখিয়াছিলেন এবং গ্রাম্য কুটীর হইতে বিশাল উন্নত রাজ-প্রাসাদ সকলের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিখ্যাত কোন প্রাচীন অট্টালিকা দেখিলে তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ শোভা ও পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতেন এবং কোন গৃহে সুন্দর চিত্রাবলী থাকিলে তাহাও দেখিতে যাইতেন। যে শিশু ভবিষ্যতে অমৃতময়ী ভাষায় চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের গুণকীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করিবেন তাহার পক্ষে এ শিক্ষা অমূল্য।

কলাচর্চ্চায় রস্কিনের পিতা তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত, কাব্যরসজ্ঞ এবং কলাকুশলী ছিলেন। অনেক প্রথিতনামা সাহিত্য-সেবক ও চিত্রকরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। তিনি কাব্যগ্রন্থাদি অতি সুন্দর পড়িতে পারিতেন, এবং পুত্রকে পড়িয়া শুনাইতেন। চিত্রবিদ্যায় তিনি একজন

অভিজ্ঞ সমজদার ছিলেন, এবং নিজেও কিছু কিছু আঁকিতে পারিতেন। টেল্‌ফোর্ড (Telford) নামে তাঁহার একজন অংশীদার, রস্কিনের জন্মোৎসবে প্রসিদ্ধ চিত্রকর টার্ণারের (Turner) দ্বারা চিত্রিত কবি রজর্স (Rogers) রচিত "ইটালী" নামক কাব্যগ্রন্থ রস্কিনকে উপহার দেন। পুস্তকের মধ্যে সেই সকল চিত্র দেখিয়া রস্কিনের সম্মুখে যেন এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল। তিনি টার্ণারের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন, এবং তাঁহার একজন উপাসক হইয়া পড়িলেন।

আর একখানি পুস্তক পাইয়া তাঁহার জীবনের যুগান্তর উপস্থিত হয়। সে পুস্তকের নাম Prout's Sketches in Flanders and Italy. ঐ গ্রন্থের ছবি দর্শনে পিতাপুত্রের উৎকট আনন্দ দেখিয়া মুগ্ধ মাতা প্রস্তাব করিলেন, স্থানগুলি দেখিলে হয় না ? পিতা কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া আনন্দ-প্রদীপ্ত নয়নে বলিলেন, কেনই না দেখিব ? অমনি দিন কয়েকের মধ্যে সব প্রস্তুত হইল। দাসদাসী সমভিব্যাহারে পিতামাতা ও পুত্র ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সে মুগ্ধ ভ্রমণের সুখ এবং তীব্র উপভোগ বর্ণনায় খর্ব্ব হইয়া পড়ে—তাহার মাধুর্য্য অনুভবের বিষয়। স্বদেশ ভ্রমণকালের ন্যায় রস্কিন্ এখন আর শিশু নয়। এখন তাঁহার রসাস্বাদন শক্তি বাড়িয়াছে। কলা-সৌন্দর্য্যে চক্ষু ফুটিয়াছে এবং প্রতিভার নিত্য নবোন্মেষে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ, নববল এবং অমর আশা সঞ্চারিত হইয়াছে।

এদিকে ভ্রমণের সুখ স্বচ্ছন্দতার পক্ষে পিতামাতার অবিশ্রান্ত

চেষ্টা ও প্রভূত আয়োজন। রেলের তাড়া নাই—লগ্নভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। পূর্ব্ব হইতেই পথে পথে বাসা নির্দ্ধারিত। উপস্থিত হইবামাত্র সব প্রস্তুত। বাহির হইবার কালে দ্বারে যান। এইরূপে তাঁহারা মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের গিরি-নদী-হ্রদ-শোভিত কতিপয় রমণীয় স্থান দেখিয়া বেড়াইলেন। পথে রস্কিন্ ও রস্কিনের পিতা কখন বা প্রকৃতির কোন রম্য বা বিরাট দৃশ্য-পটের—কখন বা মানবহস্ত-রচিত বিবিধ-কলা কারুকার্য্যের ছবি আঁকিতেন। আল্প্স্-গিরিশ্রেণী দর্শনে রস্কিনের কি অসীম আনন্দোচ্ছ্বাস! তাহার বর্ণনা তাঁহারই লেখনীর আয়ত্ত ও যোগ্য।

তীর্থযাত্রা করিবার নিমিত্ত যেমন কাহারও কাহারও উগ্র ব্যগ্রতা, উন্মত্ত অধীরতা জন্মিয়া থাকে, আল্প্স্ দেখিবার নিমিত্ত রস্কিনের সেইরূপ আবেগ হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত দিন বন জঙ্গল এবং উচ্চ্চল পার্ব্বত্যভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া রজনীর মধ্য-যামে পর্ব্বত-ক্রোড়লগ্ন অর্গলবদ্ধ নগর বিশেষে উপনীত হইয়া দিবসের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পরদিন অপরাহ্ণে রাইন নদীর নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত কান্তার পরিভ্রমণ করিতে করিতে—দূরে—পর-পারে—"মেঘ বলিয়া কাহারও ভ্রম হইল না"—"স্ফটিকের ন্যায় পরিষ্কার"—"সুনীল আকাশপটে স্পষ্ট অঙ্কিত"—"অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আলোকে আরক্তিম"—আল্প্স্ গিরি। ধ্যান, ধারণা ও কল্পনার বহুদূরে—আয়ত্তচ্যুত ইডন্ কাননের প্রাচীর ইহা অপেক্ষা সমুজ্জ্বল নয়—মৃত্যুর পরপারে স্বর্গের প্রাচীর ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর নহে।

সেই দিন রস্কিনের দ্বিতীয় জন্ম—এত কাল ধরিয়া, এত যত্নে শিক্ষিত হইয়া—দীক্ষা-উন্মুখ পবিত্র-হৃদয় বালক, প্রকৃতির বিশাল অচল মন্দিরে, জীবন-ব্রতের সন্ধান পাইয়া মন্ত্র-জীবনে সেই দিন দীক্ষিত হইলেন—আজ তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সমাধা হইল। সত্য-সৌন্দর্য্য ও শান্তির সাম-গান-মুখরিত আনন্দগ্রন্থি—আজ তাঁহার জীবনে তাঁহার চিন্তা, কথা এবং কার্য্যে আবদ্ধ হইল। সেই সন্ধ্যায় বাগ্দেবী তাঁহার কুসুমাঙ্গুলির আলোকময়ী ইঙ্গিতে, সেই সুস্থ-দেহ প্রতিভার উষালোকে অরুণিত-হৃদয় বালককে তাঁহার জীবনে যাহা কিছু উন্নত, পবিত্র, যাহা কিছু কার্য্যকরী তাহা দেখাইয়াছিলেন। আল্প্স্ দর্শনে শুধু যে তাঁহার নয়নপথে সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত হইল তাহা নয়—তিনি বুঝিলেন সেই অসীম অনন্ত স্বর্গরাজ্যের প্রথম সোপানে মাত্র আরোহণ করিয়াছেন। বহুবর্ষ পরে, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন —"যখনই কোন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কল-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হয়,—বা কোন শান্তিপ্রদ—বলপ্রদ শুভ চিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে, তখনই সেই দিন, সেই দৃশ্য, তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হয়।"

পর্ব্বতদর্শনে রস্কিন্ চিরজীবনই এইরূপ উৎকট আনন্দ পাইতেন। সে আনন্দের আবেগ ও গভীরতা তিনি প্রেম-জনিত আনন্দের সহিত তুলনা করিয়া বলেন, প্রেম-উপভোগেরই ন্যায় ইহা বর্ণনা বা ব্যাখ্যানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। পাঠকের কি বায়রণের (Byron) কথা স্মরণ হয় ?

to me

High mountains are a feeling.

পুত্রের চিত্রাঙ্কনী শক্তির বিকাশের জন্য পিতার যে কিরূপ যত্ন ও আগ্রহ ছিল বেশ বুঝা যাইতেছে। চিত্রবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত আগে হইতেই শিক্ষক নিযুক্ত ছিল এবং প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের রচিত আলেখ্য-সংগ্রহের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তাহা ছাড়া রস্কিন্ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, পিতা তাঁহার জন্য ৩০০০ টাকা (£ 200) বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

কলা বিদ্যায় পিতা পুত্রের একপ্রাণতা সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে—এক দিন কোন নিলামে রস্কিন্ ছবি কিনিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে যে একখানিমাত্র ক্রয়োপযোগী চিত্র ছিল, তাহা বিকাইয়া গিয়াছে, সুতরাং ম্রিয়মাণ হৃদয়ে তিনি গৃহে ফিরিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন সে চিত্র তাঁহারই ঘরে রহিয়াছে। পুত্রের ভাল লাগিবে বলিয়া পিতা ইতিপূর্ব্বেই তাহা কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

শৈশব হইতে রস্কিনের জীবন কিরূপে গঠিত হইতেছিল— তাঁহার হৃদয়-ধাতু যখন কোমল ছিল তখন তাঁহার উপর কি কি প্রভাবের গভীর অঙ্কপাত হইয়াছিল, তাহার আভাস উপরিলিখিত বিবরণে পাইয়াছি। এক্ষণে আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবনের আলোচনা করিব।

১৮ বৎসর বয়সে রস্কিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসর অক্সফোর্ডে বাস করেন, পরে আরও দুই বৎসর

অতীত হইলে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অক্সফোর্ড জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। সে জীবন তাঁহার বড় ভালও লাগে নাই। প্রতিযোগিতা প্রণালীর তিনি বরাবরই বিপক্ষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, আমরা শিখিব এবং শিখিতে চেষ্টা করিব—জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যকে আয়ত্ত করিব, এবং তজ্জন্য সাধনা করিব, ইহাই প্রয়োজনীয়—ইহাই যথেষ্ট, ইহাই শ্রেয়ঃ—প্রতিযোগিতায় হীন ঈর্ষাবৃত্তির উদ্রেক করিয়া কি ফল?

তবে যে তিনি আগ্রহের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহার কারণ পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও স্নেহ। পিতামাতা অনেক আকাজ্ক্ষা করিয়াই তাঁহাকে অক্সফোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহারা না দুঃখিত হন, তাঁহাদের হৃদয়ে না ব্যথা লাগে, এই কারণেই তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তৎপর এবং যত্নবান হইয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বড় একটা ছিল না।

অক্সফোর্ড জীবনের আর একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। রস্কিন্ যখন তথায় যান তখন সেখানে ছাত্রজীবনে অনেক দোষ ছিল। মদ্যপায়িতার সীমা ছিল না। কিন্তু রস্কিন্ সকলের সঙ্গে এবং সকল আমোদ-প্রমোদে যোগ দিয়াও চতুরভাবে মদ্যপান হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কঠোর গৃহ শিক্ষার স্থায়ী ফল কোথায় যাইবে? তিনি সকলের সঙ্গে বসিয়া, পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করিতেন—গলায় ঢালিয়া নয় ভিতরকার জামার মধ্যে। সুরাপানে রস্কিনের এইরূপ বিতৃষ্ণা দেখিয়া আর এক

জন মহত্তর লোকের আরও শিক্ষাপ্রদ উন্নত ব্যবহার মনে পড়ে।

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসলেখক (Balzac) ব্যাল্জার কথা মনে পড়ে। ব্যালজা এক জন অসাধারণ প্রতিভা এবং প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় এবং উদ্যম বিস্ময়কর—অমানুষিক। তিনিও মাদকসেবী ছিলেন না। যখন তাঁহার নিতান্ত প্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা (Haschich) মাদক-জনিত নেশার তীব্র সুখ উপভোগে মত্ত এবং তাঁহাকে তাহার রসাস্বাদন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তিনি তাঁহাদের নিকট জানিতে চাহিলেন, উক্ত নেশার প্রভাবে মনের কিরূপ অবস্থা হয়।

বর্ণনায় যাঁহারা সিদ্ধহস্ত—কথার উপর যাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতা—যাঁহারা কবি—ব্যাল্জাকে তাঁহারা সেই মাদকতার মোহিনী চিত্রময়ী ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন। কৌতূহলী শিশুর ন্যায় তিনি মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন যে, এই মাদকের প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সকলের ক্ষমতা কল্পনাতীত মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়—তুমি শুনিতে পাইবে বর্ণ সকল হইতে স্বরলহরী উত্থিত হইতেছে। বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র কলরোল। তোমার অন্তরে বাহিরে চারিদিকে অনন্ত প্রসারিত—তুমি এক অপূর্ব্ব স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছ—তোমার কর্ত্তৃত্ব নাই—অহংজ্ঞান তিরোহিত, নিজের ইচ্ছা নিজের অধীন নয়। তুমি যেন সাগর-মধ্যস্থ স্পঞ্জ—আনন্দস্রোত সহস্র রন্ধ্রে একবার তোমার ভিতর প্রবেশ করিতেছে আবার চলিয়া যাইতেছে। এই অপূর্ব্ব অবস্থা উপভোগ করিবার নিমিত্ত

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেও, ব্যালজা হস্তস্থিত মাদক দ্রব্য রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"যে অবস্থায় আমার নিজের উপর প্রভুত্ব চলিয়া যায়, আমার ইচ্ছাবৃত্তি আমার আয়ত্ত নহে, তাহা অপেক্ষা জগতে ভয়াবহ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না।"

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রস্কিন্ উপাধি লাভ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৪৩ সালে আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায় (Modern Painters) নামক তাঁহার প্রথম পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেই অবধি ১৮৬০সাল পর্য্যন্ত, অবিশ্রান্ত ধারে, অনুপম সুন্দর ভাষায়, কলা বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথম পুস্তকে তিনি সাধারণ রুচি ও মতের বিপক্ষে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করেন। যৌবনের একটি নিঃসঙ্কোচ বিশ্বাস আছে, সে বিশ্বাস সে সকলের সম্মুখে সহজে ব্যক্ত করে। রসোপভোগের একটি অকপট তীব্র আনন্দ আছে, সে আনন্দ বিশ্বসংসারকে মগ্ন করিতে চায়। প্রতিভার একটি স্বাভাবিক বিকাশ এবং অপ্রতিহত প্রভাব আছে, সূর্য্যালোকের ন্যায় তাহা আপনা আপনি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। রস্কিনের প্রথম পুস্তকে আমরা এই তিনটিই দেখিতে পাই। কি সুন্দর ভাষা—কি দেবোপম নির্ভীকতা—কি বিশ্ববিজয়ী বিশ্বাস! আবার এই সকলের উপর গৈরিক প্রস্রবণের ন্যায় কি আনন্দ স্রোত! আর এই পুস্তক রচনার মূলই বা কি? (Turner) টার্ণারের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার রসগ্রাহিতা—তাঁহার উপর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। 'তদগুণকর্ণমাদায় চাপলায় প্রণোদিতঃ।' বাস্তবিক

সমালোচনার প্রকৃত এবং মূল কারণ সমালোচ্য বস্তুর রসাস্বাদন— তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ এবং তজ্জনিত আনন্দ। কাব্য হউক, চিত্র হউক, ভাস্কর্য্য হউক তাহার সৌন্দর্য্যে যখন আমি মুগ্ধ, তখন আমাকে 'বাহবা' দিতেই হইবে এবং অপরকে ডাকিয়া সেই আনন্দ সংবাদ দিতে হইবে। আমি যে সুখ উপভোগ করিতেছি, তোমাকে তাহার অংশ না দিয়া আমি থাকিতে পারি না। দানে আমার সুখ বাড়িবে বই কমিবে না।

Modern Painters পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রকাণ্ড পুস্তক। সাহিত্য ও কলাজগতে ইহা বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ইহার ভিতর কলা-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রস্কিন্ অনেক মূল-তত্ত্ব এবং মৌলিক নিয়মের আলোচনা এবং অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমে পুরাতন মতবাদীরা তাঁহার বিপক্ষে তাঁহাদের চিরপরিচিত হুঙ্কার ছাড়িতে এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে বিরত হন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন নামাবলী ঝাড়িয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে এবং অভিশাপ দিতেও ছাড়েন নাই। জগতের নিয়মই এই, যাহা আছে তাহা সহজে যাইতে চাহে না। জীর্ণ অট্টালিকাও পড়িবার কালে তাহার বিচ্ছিন্ন শিথিলতার মধ্য হইতে বজ্রধ্বনিতে যেন সেই পতনেরই প্রতিবাদ করে। কিন্তু সময় হইলে সকলকেই সরিয়া পড়িতে হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে রস্কিন্ যখন তাঁহার সমালোচকদিগের মত সকল তাঁহার প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকে শরৎকালের মেঘরাশির ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সকলে এই নূতন দেবতার পূজা আরম্ভ করিলেন। ১৮৬০

সালে Modern Painters সম্পূর্ণ হয়। তাহার পূর্ব্বে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি একাধিক বৃহদায়তন গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের সমালোচনা প্রবন্ধের সীমার মধ্যে অসম্ভব—তাহার জন্য এক খানি পুস্তকের বিস্তৃতি আবশ্যক। আমরা ললিত-কলা সম্বন্ধে তাঁহার গুটিকতক মুখ্য মত স্থূলতঃ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইব।

প্রস্তাবিত বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক এবং বলিবারও সময় আসিয়াছে—কলাবিদ্যায় রস্কিনের নিজের কিরূপ পারদর্শিতা ছিল। স্থাপত্যে যে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃষ্টি-নিপুণ কল্পনা ছিল না, তাহা তিনি আপনিই স্বীকার করিয়াছেন। চিত্রাঙ্কণে তাঁহার নিতান্ত সামান্য ক্ষমতা ছিল না এবং তাঁহার রচিত চিত্র সংখ্যাও সামান্য নয়। সকল চিত্রেই আমরা তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য—অশ্রান্ত অধ্যবসায় এবং একপ্রাণ কার্য্যনিষ্ঠা দেখিতে পাই। প্রদর্শনীতে তাঁহার কোন কোন চিত্র বিশেষ সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছে, এবং কোন কোন সমালোচকদিগের মতে তাঁহার নৈসর্গিক দৃশ্যপটসকল এত ভাল যে তাহাদের অপেক্ষা আরও ভাল আমরা কল্পনা করিতে পারি না। তাঁহার গ্রন্থসমূহে তাঁহার স্বহস্ত প্রণীত কতকগুলি ছবি বড়ই সুন্দর—আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায় নামক পুস্তকে তিনি আল্‌স্ পর্ব্বতের স্থান বিশেষের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা কাহারও কাহারও মতে পার্ব্বত্য চিত্রাঙ্কণের আদর্শ। এদিকে হুইস্‌লর (Whistler) প্রমুখ চিত্রকরেরা বলেন, রস্কিনের চিত্রবিদ্যায় অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং কলারসে বিলক্ষণ প্রবীণতা থাকিলেও কার্য্যে তিনি কিছুই

করেন নাই। এ দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা প্রবন্ধলেখকের আয়ত্তের ভিতর নয়। তবে মোটের উপর ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন কলাজগতে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই।

রস্কিন্ যে ললিত-কলার বিজ্ঞান অবধারণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রত্যুত, বিজ্ঞান নিরূপণের পক্ষে যে মানস-শক্তি ও মনোধর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। অনেকের মতে তাঁহার প্রভূত বিশ্লেষণ-শক্তি ছিল। অপর কেহ নয়, স্বয়ং ম্যাটসিনি (Mazzini) বলিয়াছেন যে, সমসাময়িক সমগ্র ইউরোপে বিশ্লেষণে রস্কিন্ অদ্বিতীয়। কিন্তু, উপরোক্ত মত অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, বিজ্ঞান-গঠনে যে সংযম, সমস্ত-দৃষ্টি, ও পূর্ব্ব-সংস্কার-বিবর্জ্জিত মুক্ত হৃদয়ের আবশ্যক, কেবল যে সে সকলের অভাব তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় তাহা নয়, বরং ইহাদের বিপরীত-ধর্ম্মী গুণ ও মনোবৃত্তি প্রকৃতি তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বিষয়ে বিজ্ঞান নিরূপণ করা এক কথা, এবং সে বিষয় উপভোগ বা তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করা আর এক কথা। তুমি উত্তম বৈয়াকরণ বা ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ হইতে পার—কিন্তু সাহিত্যে, রচনাশিল্পে তোমার কোনরূপ প্রতিষ্ঠা না থাকিতে পারে। কেহ কবিতার সুন্দর সমজ্‌দার—কিন্তু নগণ্য কবি। রস্কিনের কলা-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে—কিন্তু সৌন্দর্য্যের সন্ধান, সম্ভোগ, ও সমালোচনায়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে তদ্‌বিষয়ে পার-

দর্শিতায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা—প্রতিভা ছিল। তাঁহার রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে কলা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহার বিভিন্ন উক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। রস্কিনের সেই বিবিধ-মত-সঙ্কুল অসীম গ্রন্থসমুদ্র হইতে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় মন্থন করা নিতান্ত সহজ নয়—প্রায় অসম্ভব। যাঁহারা তাঁহার পক্ষ, তাঁহারাও তাঁহার মত বুঝাইতে গিয়া অনেক সময় এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা তিনি নিজে বলেন নাই—তাঁহাদের নিজ মত তাঁহার মতে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন ; এবং তাঁহার বিরোধী পক্ষও তাঁহার ভ্রান্তি দেখাইতে গিয়া এমন অনেক কথা রস্কিনে আরোপ করিয়াছেন যে, সে সকল কথা শুধু রস্কিন্ বলেন নাই তাহা নহে, বরং তাহাদিগকে তিনি ভ্রমাত্মক এবং অসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহাদের দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইবে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, মোটের উপর তাঁহার মত পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা পাইব।

কলা সম্বন্ধে রস্কিনের মত খুব প্রশস্ত এবং উদার। তাহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। কলা সম্ভোগ হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চাহেন না। ধনী নির্ধন সকলেই তাহাতে আমন্ত্রিত। কেবল তাহাই নহে, পরম ভক্ত ভাগবৎ-কার যেমন বলেন, "ধর্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হইয়াও, যদি ভগবানে ভক্তি উৎপাদন না করে, তবে তাহা 'শ্রম এব হি কেবলং,' " রস্কিন্ও

সেইরূপ বলেন, "যে জীবনে পরিশ্রম নাই, সে জীবন যেন একটা গুরুতর অপরাধ; এবং যে পরিশ্রমে কলা-সম্পর্ক নাই, তাহা পশুত্ব।" তাঁহার সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এই একটা কথা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত—মানব-চরিত্রের উন্নতি সাধনে কলাবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সহায়। তাই, তিনি জীবনের সকল কার্য্যে সকল বিষয়েই ললিত-কলার বিকাশ দেখিতে চান। তিনি আরও বলেন, কলা-বিদ্যায় শিক্ষাদান করা, এবং সকল বিষয় শিখান একই কথা। কারণ, এই জগতে যাহা কিছু আছে—অসীম বাহ্য প্রকৃতির বিরাট ব্যাপার হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্য্যন্ত, এবং অনন্ত দুরবগাহ মানব-হৃদয়ের সুখ দুঃখের গভীর আলোড়ন হইতে সামান্য সাধটী পর্য্যন্ত—সকলই কলাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারে! ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কলাব্যবসায়ী যে বিষয় লইয়া কলাচর্চ্চা করিবেন সে বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তথ্য অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এই পর্য্যন্ত রস্কিনের সঙ্গে কাহারও বা কোন সম্প্রদায়ের বিবাদ নাই। কলা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর মত থাকিতে পারে না। কিন্তু কলা-বিদ্যা বলিলে আমরা কি বুঝি? কলাবিদ্যা কাহাকে বলে? এই লইয়া তাঁহার সহিত অনেকেরই মতভেদ আছে। রস্কিন্ প্রথমে বলেন যে, কলা মাত্রই একটা উন্নত এবং প্রশস্ত ভাষা—ভাব প্রকাশের পক্ষে অমূল্য। অতি সুন্দর কথা! সকলেরই গ্রাহ্য। কিন্তু, তৎপরেই জিজ্ঞাস্য, কোন্ শ্রেণীর ভাব প্রকাশ? রস্কিন্ যদি বলিতেন, সৌন্দর্য্যের ভাব* প্রকাশ করা, তাহা হইলে

কাহারও সহিত তাঁহার বিবাদ থাকিত না। যদিও তিনি সৌন্দর্য্যকে কোথাও বাদ দেন নাই, কিন্তু কোথাও তাহাকে কলা বিদ্যার সর্ব্বস্ব—মর্ম্ম—প্রাণ—বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, এবং তাহাকে মুখ্য স্থানও দেন নাই।

তাহা ছাড়া ললিত-কলা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে উদার মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার মত ঠিক বিপরীত। তাহা অনুদার, সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ—সুতরাং ভ্রমাত্মক। রস্কিন্ কোথাও ললিত-কলার লক্ষণ বা সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নাই! উচ্চকলা (great art) বলিলে তিনি কি বুঝেন তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "উচ্চকলা আমি তাহাকেই বলি, যাহা মানবের মনে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম ভাবসকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় উদিত করে।" এবং সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়া, ললিত-কলাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রকেই আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত করিয়াছেন ;—"এমনও কলা আছে যাহার কার্য্য আনন্দ দান করা নয়, পরন্তু শিক্ষা দান করা" (There is some art whose end is to teach and not to please)—ভয়ানক কথা! রস্কিনের মুখ হইতে যে ইহা নির্গত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে ঐ উক্তি স্বচক্ষে না দেখিলে, কোনরূপে প্রত্যয় করা যায় না। কিন্তু উপরোক্ত উক্তি যে মুহূর্ত্তের খেয়াল বা অনবধানতা-জন্য তাহা বলা যায় না। কারণ, তাঁহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোনও গ্রন্থে * তিনি সমস্ত

* Lectures on Art.

কলাবিদ্যা সম্বন্ধে খুব দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, "আমি আজি পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দিতে চেষ্টা পাইয়াছি তাহার অধিকাংশ সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত করা হয় যে, কলাবিদ্যাকে প্রাকৃতিক ঘটনার বা তথ্যের প্রকটন বলিয়াই আমি তাহার অত্যধিক আদর করিয়াছি, তাহার চিত্তরঞ্জিনী প্রকৃতির অত্যল্প আদর করিয়াছি। আমি এক্ষণে নিসংশয়ে বলিতে চাই এবং তোমাদিগকে বুঝাইতে চাই যে, কলাবিদ্যার সমস্ত জীবন—সত্তা—তাহার সত্যপূর্ণতার উপর বা ব্যবহার্য্যতার উপর নির্ভর করে, এবং উহা নিজে যতই কেন চিত্তরঞ্জক, বিস্ময়কর বা গভীরভাবব্যঞ্জক হউক, যদি ইহার উদ্দেশ্য কোন প্রকৃত তথ্যের প্রকাশ বা কোন ব্যবহার্য্য পদার্থের অলঙ্করণ না হয়, তাহা হইলে ইহা নিকৃষ্ট কলা, এবং ক্রমে আরও নিকৃষ্ট হইতে চলিবে।" রস্কিন্ এইরূপে কলাবিদ্যার আনন্দদায়িনী প্রকৃতিকে একেবারে উপেক্ষা বা তাহাকে অত্যন্ত গৌণ স্থান দিয়া তৎসম্বন্ধে মৌলিক—মর্ম্মগত ভ্রান্তি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার এ ভ্রম দেখা দূরে থাকুক, তিনি যে এমন ভ্রমাত্মক শিক্ষা দেন নাই বরং তাহার বিপরীত শিক্ষাই দিয়াছেন, তাঁহাদের রস্কিন্ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিতে অম্লান বদনে এবং বিশদ চিত্তে বলিয়া থাকেন। এড্‌বার্ড কুক এম, এ, মহাশয় (Edward Cook M. A.) তাঁহার রস্কিনের শিক্ষা ও কার্য্য সমালোচন গ্রন্থে *

* Studies in Ruskin.

লিখিয়াছেন—"রস্কিন্ বলেন, কলা-বিদ্যা কেবলমাত্র অবকাশ রঙ্গিনী নহে, ইহা কেবলমাত্র আমোদ বা কৌতুক নহে, অসুস্থ হৃদয়-বৃত্তির পরিচর্য্যা করা ইহার কার্য্য নহে বা আত্মার নিদ্রা সংসাধন করা উদ্দেশ্য নহে। ইহার অর্থ নয় যে, কলা-বিদ্যা আনন্দ বিধান করিবে না, বরং যাহা আনন্দ দেয় না তাহা ললিত-কলাই নয়।" কিন্তু শেষোক্ত কথাটী ভক্তের টিপ্পনী—গুরুর কোন মূলগ্রন্থে উহা নয়নগোচর হয় না; এবং এই টিপ্পনীতেই ললিতকলার সর্ব্বস্ব উক্ত হইয়াছে। কলা-বিদ্যার কার্য্য ও উদ্দেশ্য চিত্তরঞ্জন, রস্কিন্ স্পষ্টতঃ এ কথা অস্বীকার করিলেও বা আনন্দকে নিতান্ত গৌণ স্থান দিলেও, চিত্তরঞ্জন যে কলার প্রকৃত ধর্ম্ম ইহা তাঁহার সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে অতর্কিতভাবে পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, ইহা অনিবার্য্য। যেমন আকাশ হইতে নীলিমা—জল হইতে তরলতা বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেইরূপ কলা হইতে আনন্দকে বাদ দেওয়া যায় না।

এখন এই আনন্দ আসিবে কোথা হইতে? ইহার মূল কোথায়? রস্কিন্ যদি বলিতেন, সৌন্দর্য্যে, তাহা হইলে সকল মিটিয়া যাইত। কিন্তু সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তিনি সত্যের এবং অপরাপর বিষয়ের যোজনা করিয়া ললিতকলাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন। এ দিকে আবার, যাহা সত্য তাহাকেই তিনি সুন্দর বলেন, কোথাও বা ইহার প্রতিবাদ করেন, এবং স্থল বিশেষে এমন উক্তিও দেখা যায় যে, সত্যের অভাব বা অপলাপ কোনরূপ উৎকর্ষের দ্বারা মিটিতে পারে না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে

তাঁহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কথা ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি সৌন্দর্য্যকে মুখ্য স্থান দেন নাই—সে স্থান তিনি দিয়াছেন সত্যকে। তিনি বলেন, সত্য এবং সৌন্দর্য্য পরস্পর স্বাধীন এবং তাহাদের যোগ্যতা বা মূল্য অনুসারে তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সত্য—সৌন্দর্য্য তাহার পর। ইহা ছাড়া, রস্কিন্ সৌন্দর্য্যকে নীতি ও ধর্ম্মের অধীন করিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক উপাদান (The highest moral element) বলেন, এবং তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তকে তিনি সৌন্দর্য্যের যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে, সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভূত বিভিন্ন ভাবসকল ঐশীগুণের ছায়ামাত্র। তাঁহার ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার (গোঁড়ামি) এতদূর গড়াইয়াছিল যে, তিনি নিম্নলিখিত হাস্যজনক অসত্যকে লিপিবদ্ধ করিতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই—"যে লোক ঈশ্বর বা তাহার নিজ সহোদরকে স্নেহ করে না, সে তাহার চরণতলে আস্তীর্ণ শ্যাম শষ্পরাশিকেও ভালবাসিতে পারে না।"*

রস্কিন্ এই স্থলে বিভিন্ন বিদ্যার কার্য্য এবং উদ্দেশ্য লইয়া গোলযোগ বাধাইয়াছেন। সত্যনিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য—শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাহা সাধ্য। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বা উদ্ভাবন কলা-

---

* Modern Painters নামক পুস্তকের ২য় ভাগের ৯৭ পৃঃ। ১৮৮৩ অব্দে রস্কিন্ উল্লিখিত মতের অসারকর্তা গ্রন্থশেষে টিপ্পনীতে স্বীকার করেন।

বিদ্যার উদ্দেশ্য—রুচি আমাদিগকে তাহার পথ দেখাইয়া দেয়। নীতি আমাদিগকে কর্ত্তব্য বিষয় শিক্ষা দেয়—এবং ইহা বিবেকের কার্য্য। এমন হইতে পারে যে, সত্য বা নীতির অপলাপে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বা অবিকৃত বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কলাশাস্ত্র হইতে আমরা সত্যের উদ্ভাবন বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় ঠিক করিয়া লইতে পারি না। বিজ্ঞান বা নীতির উদ্দেশ্যের সহিত যখনই কলা-বিদ্যা সঙ্গত হইয়াছে তখনই তাহার নিজ উচ্ছেদ বা বিলোপ অনিবার্য্য। সত্যেরও মর্য্যাদা আছে; কর্ত্তব্যেরও মর্য্যাদা আছে; সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা তাহাদের অপেক্ষা কোনরূপে ন্যূন নহে। কলা-শাস্ত্রে সৌন্দর্য্যের স্থান সকলের উপর। বালকজীবনের সমস্ত মধুময় মোহ, উজ্জ্বল কল্পনা, বিচিত্র শোভা, ও অর্দ্ধ-স্ফুট-কুসুম-কোরকবৎ কোমল ও কমনীয় কবিত্বের সারাদান করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভা-শালী লেখক কেনেথ্ গ্রেহাম (Kenneth Grahame) মহোদয় যে "গোল্ডন্ এজ্" (Golden Age) নামক অতি সুন্দর ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই পুস্তকের মধ্যে আমরা কল্পনা-প্রিয় বালকের এই অমূল্য আবিষ্কারের সন্ধান পাই, "সত্যের অপেক্ষাও উচ্চতর পদার্থ আছে—(There are higher things than truth) ইহার উদাহরণ কলাশাস্ত্রের প্রতিছত্রে—সে শাস্ত্রে সৌন্দর্য্য সত্যের অপেক্ষা উচ্চতর।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সৌন্দর্য্যকে আবদ্ধ রাখিয়া রস্কিন্ তাহাকে আংশিকভাবেই দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দুই বিভিন্নজাতীয় মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, যাঁহারা ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য্য ছাড়া অপর কোন সৌন্দর্য্য দেখেন না। ভর্ণন লী (Vernon Lee) নাম্নী বিদুষী লেখিকা 'রস্কিনি' (Ruskinism) নামক তাঁহার প্রবন্ধে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আকৃতি-গত সৌন্দর্য্যেরই ধ্যান-ধারণায় তাঁহারা মগ্ন, তাঁহাদের নিকট এই নদ-নদী-গিরি-তরু-সঙ্কুলা সাগরাম্বরা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ বিবিধ পশু-পক্ষী-পতঙ্গাদির বিচিত্র দেহাবয়ব ও নর-নারীর সুগঠিত আকৃতি সৌন্দর্য্যের একমাত্র বিকাশের স্থল। এই শ্রেণীর মুখপাত্র হইয়া ফরাসী কবি আর্মা সিলভেষ্টর (Armand Sylvestre) বলিয়াছেন :—

"রমণীসৌন্দর্য্য—একা সৌন্দর্য্য প্রকৃত।" এবং আমাদের একজন বঙ্গীয় কবিও সেই সুরে গাহিয়াছেন :—

"রমণি রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
সৌন্দর্য্য-জগত হ'তে তোমারে রাখিলে দূরে,
সে জগতে থাকেনাও আধা।"

—অক্ষয়কুমার বড়াল।

আবার আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাঁহারা, শিশুরই হউক বা রমণীরই হউক, নগ্ন মূর্ত্তি দেখিলেই একেবারে অন্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের চক্ষে মানবঁ দেহের কোন সৌন্দর্য্য বা গৌরব

নাই। তাঁহারা সকল স্থানেই আধ্যাত্মিকতা দেখিতে চান—দেখিবার আর যে কোন সামগ্রী আছে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যে সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গকে আমন্ত্রণ করে—যাহা ইন্দ্রিয় অবধি পৌঁছায়—অসীম মানবাত্মার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গভীরতা আলোড়িত করিয়া অপার্থিব ভাবতরঙ্গ না তোলে—তাহা সৌন্দর্য্য নয়; রস্কিনের মত অনেকটা এই জাতীয়। তিনি বলেন, "তাহাই সৌন্দর্য্য, তাহাই কলা-উপভোগক্ষম বৃত্তিকে আনন্দ দেয়, যাহা কোন উন্নত উদার ব্যক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট, এবং সমধর্ম্মা অপর ব্যক্তির দ্বারা উপভুক্ত বা দৃষ্ট!" তিনি স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "উচ্চ অঙ্গের কলা মাত্রই স্তুতিবাদ;" "উচ্চ কলা ঐশী-নির্দ্দেশ;" এই সকল কথা শুনিতে খুব ভাল, এবং জগতে এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের এইরূপ শ্রুতি-মধুর কথা বিশ্বাস করিতে স্বাভাবিক ধাতুগত প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা তাঁহাদের এত মধুর ও শোভন বলিয়া বোধ হয় যে, সে গুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহাদের বাস্তবিক কষ্ট হয় এবং অশান্তি বোধ করেন—সুতরাং সত্যানুসন্ধায়ীর কঠোর পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা একেবারে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন; কিন্তু রস্কিনের ঐ উক্তিগুলির ভিতর যে ধর্ম্মভাব ও আস্তিকতার বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা কি সত্য? এমন ভক্ত আস্তিক কি নাই, কলাপারদর্শিতা ত দূরের কথা, সৌন্দর্য্য জ্ঞানই যাঁহার নাই? আস্তিকতা, ভক্তি,

বা ধর্ম্মভাব কলাজ্ঞান বা কলা-রচনা-শক্তি উদ্বোধিত করে না। কলা-রচনার পক্ষে সৌন্দর্য্য-জননী শক্তি আবশ্যক—এমন অনেক কলা-রসিক জগতে আছে এবং ছিল, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে যাহাদের সমকক্ষ নাই কিন্তু যাহারা ঘোরতর নাস্তিক এবং নীতি সম্বন্ধে যাহাদের জীবন জঘন্য। রস্কিনের উচ্চ কলা সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তি চার্লস্ ওয়াল্ড্ষ্টাইন (Charles Waldstein) নামক কোন লেখক রস্কিন্ বিষয়ক তাঁহার পুস্তকে সকল কলা সম্বন্ধে আরোপিত করিয়া রস্কিনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মিত্রামিত্র অনেকেই যে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন ইহা তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ। সে যাহাই হউক, এই অত্যধিক নীতিবাৎসল্য ও আধ্যাত্মিকতা সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে তাঁহাকে আংশিকরূপে অন্ধ করিয়াছে; কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মতবাদ কালে তিনি যাহাই বলুন, তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থাবলীর অনেক স্থানে প্রকৃত কলা-রসিকের সৌন্দর্য্যোপভোগে স্বাভাবিক প্রবণতা নিবন্ধন, তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হইয়া প্রায় সকল শ্রেণীর সৌন্দর্য্য গ্রহণে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, এবং কখন কখন তৎতৎ বিষয়ে নিজের ভ্রান্তিও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থমধ্যে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই নিসর্গের সুন্দর বা উদাত্ত (Sublime) মূর্ত্তির এমন সরস বর্ণনা আছে, যাহা বিপুল ইংরেজী সাহিত্যেও দুর্লভ। নিম্ন-লিখিত উদাহরণ পাঠককে রস্কিনের উদার প্রকৃতির কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারিবে,—রস্কিন্ বরাবরই বলিয়া আসিয়াছেন যে,

একেবারে ধর্ম্ম-ভাব বিবর্জ্জিত কোন কলা-রচনা সম্পূর্ণ সুন্দর হইতে পারে না ; কিন্তু পরে নিজ মতের প্রতিবাদ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, টিশিয়ান (Titian) নামক খ্যাতনামা চিত্রকরের চিত্রসকলে ধর্ম্মভাবের গন্ধ পর্য্যন্ত না থাকিলেও তাহারা কলাসৌষ্ঠবের পূর্ণ ও অদ্বিতীয় আদর্শ।* বাস্তবিক, কলা-লক্ষ্মী নীতি বা ধর্ম্মের তৌল করিয়া সৌন্দর্য্যের ওজন করেন না। মানব-জীবনে নীতি ও ধর্ম্মের মূল্য যে খুব বেশী, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। উচ্চ দরের কলার দ্বারা যে মানবের সৌন্দর্য্যোপভোগক্ষম বৃত্তির সঙ্গে অপরাপর উচ্চতর বৃত্তিও চরিতার্থ হয়, সে কথাও কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু, তাই বলিয়া, যাহা নীতি বা ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, তাহা যে সৌন্দর্য্য নয় বা ললিতকলার বিষয়ীভূত হইতে পারে না ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত।

নীতিসম্বন্ধে ললিতকলার উদাসীনতা উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক তেন্ (Taine) যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমন সত্য তেমনই সুন্দর—"সুসংলগ্ন বাহু ও সুদৃঢ় মাংসপেশী মানবকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেও, প্রকৃত চিত্রকর তাহাদিগকে আনন্দ-পূর্ণ লোচনে নিরীক্ষণ করেন।" বাস্তবিক কলাশাস্ত্রে সকলশ্রেণীর সৌন্দর্য্যই আদরণীয়। সৌন্দর্য্যোপাসক কবি (Keats) যথার্থই বলিয়াছেন যে "ইয়াগো (Iago) সৃষ্টিতে কলাকুশলী যে আনন্দ পান, আইমোজেন (Imogen) সৃষ্টিতেও সেই আনন্দ পান।"

* Fors Clavigera দেখুন।

নীতি বা ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া বা তাহার ভাণ করিয়া, নগ্ন মূর্ত্তিকে চিত্রশালায় স্থান না দেওয়া কলাবিষয়ে বর্ব্বরতার লক্ষণ। সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে যে পবিত্রতা জড়িত আছে, সৌন্দর্য্য-উপাসক তাহা নগ্ন মূর্ত্তিতেও বেশ দেখিতে পান। তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু নাই বলিয়াই, তুমি তাহাতে সৌন্দর্য্যও দেখ না এবং তৎসংলগ্ন পবিত্রতাও দেখ না। সৌন্দর্য্য-উপভোগে, সৌন্দর্য্যের পূজায়, নগ্ন মূর্ত্তিতেও কলা-রসজ্ঞ যে বিমল তীব্র আনন্দ পান, বহুদিন পূর্ব্বে নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশ-পদীতে তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম ;—

বিবসনা

কিসের পূর্ণিমা আজ ! কোথাকার জ্যোতি
নামিল এ ধরামাঝে—কাহার মহিমা ?
মানবী ?—না দেখি কোন অমর-মূরতি ?
অগ্রসর-পদ কেন জড়িত-জড়িমা ?
আলিঙ্গন-প্রসারিত বাহু কে নিবারে !
কি বিস্ময়ে—মন্ত্রবলে—কাহার মায়ায়
তপ্ত প্রাণ অবরুদ্ধ আঁখির মাঝারে !
কোন মহা-জাগরণে দেহ লয় পায় !
এ সুষমা-তীর্থ পাশে বিহ্বল জীবন,
হারাইয়া যায় প্রাণ রূপের উচ্ছ্বাসে—
কবি শুধু জাগে হৃদে—নির্ব্বাণ বাসনা।

কি মহান্ মুহূর্ত্তেরে—জীবনের কোন্
সুতুঙ্গ সোপানে—আজি সাক্ষাৎ প্রকাশে
সৌন্দর্য্যের দেব-মূর্ত্তি—ব্যক্ত—বিবসনা।

ললিতকলায় সুনীতি কুনীতি নাই; যদি থাকে, তবে তাহাই সুনীতি যাহা সুন্দর, যাহা অসুন্দর তাহাই কুনীতি। সৌন্দর্য্য লইয়া তাহার কায—তুমি তোমার প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে তাহা হইতে সুনীতির সুধা বা কুনীতির হলাহল সঞ্চয় করিতে পার। কলাশ্রী সে বিষয়ে প্রকৃতিরই ন্যায় মূক। প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের নিকট সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কখন চিন্ময়ী—কখন মৃণ্ময়ী। রবীন্দ্রনাথের "রাত্রে ও প্রভাতে" নামক মধুরার্থ-পূর্ণ সুন্দর কবিতায় যেমন একই নায়িকা নিশা ও উষা ভেদে ক্রোড়-লগ্না সোহাগ-চুম্বিতা প্রেয়সী ও মঙ্গলময়ী ভক্তি-পূজিতা দেবী, তেমনই প্রকৃত কলারসজ্ঞের নিকট সৌন্দর্য্য কখন শরীরী, কখন চিন্মাত্র,—কখন রতি, কখন বিশ্বলক্ষ্মী। ফল কথা, সৌন্দর্য্য—কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য—প্রত্যেক কলা ব্যবসায়ীর মূলমন্ত্র হওয়া চাই—তাহা হইলেই কলা-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। য়িহুদীর ঈশ্বর জিহোবার (Jehova) ন্যায় কলা-লক্ষ্মীও তাঁহার উপাসককে আদেশ করেন, "আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বর তোমার যেন না থাকে—আমাতে একনিষ্ঠ হও, তবেই আমাকে পাইবে।"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহার সারমর্ম্ম এই:—কলা-বিদ্যার কার্য্য চিত্তরঞ্জন; সে চিত্তরঞ্জন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা সাধ্য। সৌন্দর্য্য বলিলে আমরা সকল প্রকার সৌন্দর্য্যই বুঝিব—কেবল-

মাত্র রস্কিনের ন্যায় নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বুঝিব না, বা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবলমাত্র ভৌতিক বা শারীরিক সৌন্দর্য্য বুঝিব না। কারণ, ললিতকলার অধিকারের সীমা নাই। সমস্ত মানবজীবনই ইহার ক্ষেত্র। বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই ললিতকলার বিষয়ীভূত হইতে পারে। যখনই যাহা তুমি সুন্দর করিয়া মানবের চক্ষে ধরিবে, তখনই তুমি ললিতকলার সৃষ্টি করিলে। সৌন্দর্য্যের জন্যই ললিত-কলা ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ।

এই সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ-জনিত আনন্দের ন্যায় তীব্র মধুর অথচ পবিত্র আনন্দ জগতে আর নাই। যদিও কলা-বিদ্যা মুখ্যতঃ ও স্পষ্টতঃ নীতি শিক্ষা দেয় না, কিন্তু ইহার বিশুদ্ধ আনন্দোপভোগে মানব-হৃদয়ের পবিত্রতা ও উন্নতি সাধিত হয়। সৌন্দর্য্য উপদেশ দেয় না, মধুর আকর্ষণে তোমাকে সুন্দর করিয়া তোলে। এই সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এবং সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জাতীয় গৌরব শুধু বাহুবলে নয়, সৌন্দর্য্য-অনুশীলনেও বটে। ইংরেজ আমাদের বাহুবলে জিতিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে তর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর এমন কোন লোক নাই যিনি স্বীকার করিবেন না যে, যে শ্রেণীর কলা-বিদ্যায় ইংরেজ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ কাব্যকলায়), তাহা দ্বারা ইংরেজ আমাদের প্রত্যেককে জয় করিয়াছে—কবিতার স্বর্ণবীণার মোহময় তানে আমাদিগকে মুগ্ধ ও পরাজিত করিয়াছে।

এমনও একদিন ছিল যখন ললিতকলার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও বিকাশে আমাদের এই ভারতভূমি সমুদয় জগৎকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তখন প্রথম শ্রেণীর কবি, ভাস্কর, এবং স্থপতি ভারতকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। সে একদিন ছিল, যখন ভারতের কলা, দর্শন ও বিজ্ঞান, ভারতের শিল্প, সুদূর সাগরপারে—দেশ দেশান্তরে—আদরে গৃহীত হইত। এখনও বর্ত্তমান যুগের সভ্য জগৎ তাহাদের উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত। সে দিন ভারতের সকল ছিল। 'ব্রিটিশ রাজত্বে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না', ইংরেজের বল-দর্প এবং সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধি সম্ভূত এই যে গর্ব্বিত বাণী আজ আমরা শুনিতেছি, তাহার বহু পূর্ব্বে—ভারতের সেই গৌরবের দিনে—ভারতের সূর্য্যবংশীয় অধীশ্বরও বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা" *

এখন ভারত ললিত-কলার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছে—ইংরেজী Fine Art কথার স্থলে আমরা তাহার অতি অশোভন অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্ম শিল্প" লিখি এবং বলি। বঙ্কিম কি সাধ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে, কালিদাস যদি প্রেতাবস্থায় শুনিতে পান কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা শিল্পবিদ্যামাত্র, তবে তিনি রাগ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু, "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি রস্কিনের কলাবিজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক হইলেও তাঁহার রসগ্রাহিণী শক্তি অনিন্দ্য এবং অসাধারণ। এদিকে

* যতদূর সূর্য্যমণ্ডলের আবর্ত্তন, ততদূর আমার অধিকার।

তিনি কলা-শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, যাহাতে গৃহে গৃহে, প্রতি সংসারে, প্রত্যেক লোকের জীবনে কলা-লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত হয়—সৌন্দর্য্যের অমরালোকে প্রত্যেক জীবন সুন্দর হইয়া উঠে—আমাদিগের দৈনিক কর্ম্মকাণ্ডের সামান্যতম ব্যাপারটীও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার আজীবন চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ ছিল। প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছি তিনি একাধারে জ্ঞানবীর ও কর্ম্ম-বীর। সাহিত্যে তিনি অমর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—কিন্তু কলা-শিক্ষা প্রচার সম্বন্ধে তাঁহার অশ্রান্ত অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ তৎ-পরতা, অসাধারণ আত্মোৎসর্গ যিনি নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল মহাত্মা মানবের হিতকল্পে এবং বিশুদ্ধ স্থায়ী-সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের জন্য জীবন পাত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রস্কিনের স্থান অতি উচ্চ। অনেক কলাব্যবসায়ীই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নে মগ্ন থাকেন—কিন্তু রস্কিনের কলাশাস্ত্র কেবলমাত্র জ্ঞান এবং ধ্যানময় নয়—ইহাতে কর্ম্মের আবশ্যক—অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। তাঁহার মতে প্রকৃত কলা তাহাই, যাহা সুন্দর বস্তু সৃজনে সক্ষম। এবং যেখানে সুন্দর বস্তুর অভাব, কলা-শিক্ষককে সমাজ সংস্কারকের কার্য্য করিতেই হইবে—স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নহে—অবস্থার অনিবার্য্য বিপাকে। তোমার চারিদিকের বাস্তব জগৎ যখন কুৎসিত—গ্লানিজর্জ্জরিত, তখন তোমার কল্পনা-প্রসূত ছায়া-জগতের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা বিড়ম্বনা মাত্র। রস্কিন্ বলেন, প্রকৃত কলার কার্য্য বাস্তব জীবন" লইয়া—সে জীবনে যতদিন

কুৎসিত অশোভন পদার্থ থাকিবে, ততদিন কলানুরাগীকে তাহার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা পাইতে হইবে এবং তাহার স্থানে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে হইবে। সে চেষ্টা—সে কার্য্য সমাজ সংস্কারকের। যে শিক্ষক নিজের কর্ম্ম দ্বারা শিক্ষা না দিয়া কেবল মুখেই উপদেশমালা আবৃত্তি করিতে থাকেন, তাহার উপর রস্কিনের কেন, কোন লোকেরই আস্থা থাকিতে পারে না; এবং সেইজন্যই রস্কিন্ ইংলণ্ডের যাজক সম্প্রদায়কে নিয়ত এই বলিয়া উপহাস করিয়া আসিয়াছেন যে, ইহারা ধনী গৃহে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া দরিদ্র-গৃহে উপদেশ উদ্গীরণ করেন। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "আমার হাতে যে এই সুন্দর শম্বুকটী রহিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়া ইহার চিত্রাঙ্কন করা এবং বিবিধ বর্ণে ইহাকে বর্ণনা করা আমার অভিলাষ। আমার বন্ধুবর্গ বলেন, 'হাঁ উহা আমারই কায। কেন আমি তাহা করিয়া সুখী না হই?' হায়! বিজ্ঞ বন্ধুগণ, যে সকল বিষয়ে আমার অভিলাষ, তাহার অত্যল্পই আমার আয়ত্ত। কারণ, আমার গৃহদ্বার দিয়া এই যে হরিৎবর্ণ স্রোতস্বিনী তরঙ্গাবর্ত্তে বহিয়া যাইতেছে ইহা ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের গতি না করিয়া আমি কি করিয়া ভোজনে বসি এবং কোথায়ই বা আমার এই শম্বুকটী এবং যষ্টি লইয়া নির্জ্জঞ্জাল নদী-তটের সন্ধানে ঘুরিব?" তাই রস্কিনকে কলা-বিষয়িণী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সংস্কারকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল।

এড্‌বার্ড ডুডেন (Edward Dowden) রস্কিনের এই সংস্কারকার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কি বলিয়াছেন যে, রস্কিনের বিবিধ বিষয়িণীর শিক্ষার ভিতর এই একটা মূল তত্ত্ব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে— "আমাদের স্নেহ, ভক্তি ও যত্ন মানবেই অর্পিত হওয়া চাই—মানবে, মানব-রচিত কার্য্যকলাপে নয়—মানবে, উপাদান পদার্থে নয়— যন্ত্রাদি বা সুবর্ণেও নয় এমন কি চিত্র—স্থাপত্য—বা ভাস্কর্য্যেও নয় ?"

দুই একটী কার্য্যের উল্লেখ করিলেই পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, রস্কিন্ কিরূপে এই সংস্কার ব্যাপারে তাঁহার জীবন এবং সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিত্রবিদ্যার উন্নতিকল্পে তাঁহার অপরিমিত পরিশ্রম ও অজস্র দান সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ যোগ্য। অক্সফোর্ড (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নামে যে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার পাঠশালা আছে তাহার শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি সেখানে কেবলমাত্র রীতিমত উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না—উক্ত শিক্ষাগারে বহুমূল্য, অসংখ্য পট দান করিয়াছেন। কতকগুলি তাঁহার নিজ হস্ত রচিত (বহু পরিশ্রমের ফল)—কতকগুলি তাঁহার ব্যয় ও উপদেশে অপরের দ্বারা রচিত। এবং কতকগুলি তাঁহার স্বকীয় অর্থে ক্রীত। এই শিক্ষালয়ে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহার তত্ত্বাবধারণে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের সীমা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার এই অবি-শ্রান্ত পরিশ্রম ও দানশীলতা কেবল অক্সফোর্ডেই (Oxford) বদ্ধ

ছিল না। যেখানেই ললিত-কলার চর্চা বা তাহার অনুকূল সংস্কার কার্য্যের কোন অনুষ্ঠান হইত, সেইখানেই রস্কিন্ পরিশ্রমে অকাতর—দানে মুক্ত হস্ত।

কেম্‌ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (British museum) তিনি এইরূপ অনেক দান করিয়াছিলেন। অথচ অর্থ-দানেই তাঁহার সাহায্য পর্য্যবসিত হয় নাই। চিত্রাঙ্কন, চিত্র সকলের তালিকাকরণ, এবং সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্য নিজেই করিতেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট জর্জ্জ-মণ্ডলী (St. George's Guild) সংশ্লিষ্ট যে প্রদর্শনীশালা আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য তিনি যেরূপ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য উভয় জগতেই বিরল। তাঁহার দানশীলতার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা ইহা হইতে পাই যে, কেবলমাত্র অক্সফোর্ড (Oxford) এবং সেণ্ট জর্জ্জ (St. George) প্রদর্শনীশালাতে তিনি যে সকল চিত্রাদি দান করিয়াছেন, তাহার মূল্য আড়াই লক্ষ টাকার কম হইবে না।

কলাবিষয়ে সাক্ষাৎ শিক্ষাদান সম্বন্ধে উপরে যে সকল কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়া রস্কিন্ সে বিষয়ে পরোক্ষেও অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধে অসম্ভব। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর কার্য্যকলাপের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের সে কালের সুন্দর সুন্দর ক্রীড়া কৌতুকের

উদ্ধারকল্পে তিনি অনেক চেষ্টা ও প্রভূত ব্যয় করিয়াছেন। মাধবী —May queen—নামক সুন্দর উৎসব তাঁহারই যত্নে ও ব্যয়ে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর মে মাসে পাঠিকাদিগের মধ্যে একজন রাণী নির্ব্বাচিত হন—তিনিই মাধবী। নির্ব্বাচিতাকে রাণীরই যোগ্য বহুমূল্য কারুকার্য্য খচিত সুন্দর অম্বর এবং স্বর্ণ মুকুটে সজ্জিত করা হয়। রস্কিনের ব্যয়ে প্রতি বৎসর, বৎসরের মাধবীকে একটী সোনার ক্রুশ (cross) অর্পিত হয়। তাহা ছাড়া রস্কিন্ নিজ রচিত অতি সুন্দর এবং মূল্যবান বাঁধাই চল্লিশখানি পুস্তক দিতেন। মাধবী আবার সহপাঠিকাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন তাহাদিগকে সেই পুস্তক উপহার স্বরূপ দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রস্কিন্ প্রতিযোগী পরীক্ষার বিরোধী, সুতরাং পরীক্ষা দ্বারা মাধবীকে নির্ব্বাচিত করা হয় না। চরিত্র-মাধুর্য্য বা অপর কোন গুণে মুগ্ধ হইয়া বালিকারা আপনাদিগের মধ্যে যাহাকে মনোনীত করে, তিনিই মাধবী হন। এই উৎসবে কি এক নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ও কোমল মাধুরী বিজড়িত আছে। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র তখন প্রকৃতির আনন্দময়ী মূর্ত্তি। ফল-ফুল-মণ্ডিত-শ্যাম-শ্রী তরুলতা। সুখস্পর্শ বায়ু। সুখস্বপ্নেরই ন্যায় মধুর—সুনীল আকাশ। বিদ্যালয় গৃহ নানা অলঙ্কারে সজ্জিত এবং বসন্তেরও সদ্যঃস্ফুট কুসুম-স্তবক অপেক্ষা দর্শনীয়া বয়ঃসন্ধিগতা কুমারীসকল। তাহাদের আবার বিচিত্র নব সাজ। প্রতিবৎসরে মাধবীরও নূতন ধরণের বেশ। চারিদিক হইতে কি সুন্দর বস্তুর সমন্বয়—সৌন্দর্য্যের কি মনোজ্ঞ

বিকাশ! প্রসাধনকলা শিক্ষা দিবার কি সুন্দর সুযোগ! এই উৎসবের মাধুর্য্য ক্রমে ইংলণ্ডের অনেক স্থলেই অনুভূত হইয়াছে। অর্থশালী ব্যক্তিরা নিজ নিজ গ্রাম ও পল্লীতে ইহার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত রস্কিনের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা রস্কিনের সকল শিক্ষাই আসমানদারী ও আকাশ-কুসুম বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উৎসবের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত রস্কিনের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আয়রলণ্ডে পর্য্যন্ত ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা বাঙ্গালী—অতি-বুদ্ধিমান। আমাদের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, একটি সামান্য উৎসবের পুনঃ প্রতিষ্ঠায়, রস্কিন্ কি এমন কায করিয়াছেন, যে তাঁহার গুণগানে "প্রদীপের" এতটা পৃষ্ঠা নষ্ট হইল? কিন্তু, উৎসব আনন্দ যে, জাতীয় চরিত্রগঠনে একটি প্রধান উপাদান, এবং জাতীয় প্রকৃতির সুন্দর পরিচায়ক, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ইংরেজী প্রবাদে বলে, তোমার সঙ্গ জানিলে আমি তোমার প্রকৃতি বলিয়া দিতে পারি। সেইরূপ একটি জাতির আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা জানিতে পারিলে, সে জাতির জীবনের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই পাশ্চাত্য দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ওগুস্ত কঁৎ (Auguste Comte) তৎপ্রণীত সমাজনীতির মধ্যে জাতীয় উৎসবের বিবিধ বিধান নিরূপণ করিবার নিমিত্ত অনেক চিন্তা করিয়াছেন। পুরাকালের হিন্দুগণও ইহার মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা "বারমাসে তের পার্ব্বণের"

সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের দোহাই দিয়া, সভ্য জগতে খুব বড়াই করিয়া বেড়াই, এবং স্বাভাবিক অতি-বুদ্ধি-সম্পদে ম্লেচ্ছ যবনের পদলেহন করিতে করিতে তাঁহাদেরই প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করি। কিন্তু যে বিজ্ঞান এবং ভূয়োদর্শন হইতে সেই হিন্দুদিগের প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি প্রসূত, তাহার কিছুই বুঝি না এবং বুঝিবার নিমিত্ত চেষ্টাও করি না। আমরা অতি-বুদ্ধিমান।

রস্কিনের এমনও বিশ্বাস ছিল যে, কলা-সম্বন্ধিনী কার্য্য-কুশলতার পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু—কুৎসিত ও অশোভন বিষয়াদি হইতে দূরে অবস্থান—নিষ্প্রয়োজনীয় কল-কারখানা সম্বলিত পরিশ্রমাদি হইতে মুক্তি এবং "সন্তোষামৃত-তৃপ্ত" জীবন একান্ত আবশ্যক। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বিবিধ সংস্কার-কার্য্যে হাত দিতে হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্যের মধ্যে এই সামঞ্জস্য তাঁহার অলৌকিক মহত্ত্বের প্রধান নিদর্শন। এবং তাঁহার প্রকৃতির এই অংশকে লক্ষ্য করিয়াই আমি প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য পর্য্যালোচনা করিলে স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মনে পড়ে। সেণ্টজর্জ্জমণ্ডলী (St. George's Guild) নামক কৃষি, শ্রমজীবন ও তদানুষঙ্গিক বিষয়িণী পরিষৎ এই সংস্কারকার্য্যের উদ্দেশ্যেই রস্কিনের দ্বারা গঠিত হয়। বহু-লোক-নিবাস নগরসমূহের বাণিজ্য-ব্যবসায়, কল-কারখানা, ধূলি-ধূম হইতে সুদূরে অবস্থিত পল্লীগ্রামের মধ্যে এক একটি মানস-কল্পিত সুন্দর সুন্দর লোকাবাস নির্ম্মাণই এই

মণ্ডলীর কার্য্য। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিমিত্ত রস্কিন্ প্রথমে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা (£7000) এবং বাহান্ন হাজার পাঁচ শত টাকার (£3500) মূল্যের জমি দান করেন। কুমারী অক্‌টেভিয়া হিল্ (Miss Octavia Hill) মণ্ডলীর কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। পল্লীগ্রামের ভিতর বিস্তৃত ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় কৃষিকর্ম্ম, উদ্যান-পালন, পূর্ব্বতন গ্রাম্য শ্রমজীবনের পুনরুদ্ধার, এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত, সাধারণ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। যে কেহ তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও উপার্জ্জনের দশমাংশ দিবেন, তিনিই এই মণ্ডলীভুক্ত হইতে পারিবেন। মণ্ডলী-রচিত গ্রামাদির মধ্যে বাষ্পীয় যন্ত্রাদি থাকিবে না। জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া রেলপথে ভ্রমণ চলিবে না। নৌযান বা পশুযানে পণ্যদ্রব্য প্রভৃতি চালান হইবে। সাধ্য হইলে পথঘাটসকল গ্রামবাসীদিগের স্বহস্তেই নির্ম্মিত হইবে। উদ্যান ও ক্ষেত্রাদিতে ফল-ফুল ও শাক-সবজীর চাষ হইবে। গৃহসকল ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে না। তাহাদের ভিতর বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রচুর আলোক প্রবেশের সুবন্দোবস্ত থাকিবে। কিছু কিছু কলা-চর্চ্চাও হইবে। প্রাচীন গ্রীসীয়েরা যেমন ফুল-গাছের জন্য মাটীর টব প্রস্তুত করিয়া তাহার চারিদিকে তাহাদের দেব-দেবীর সুন্দর চিত্র আঁকিত, সেইরূপ মাটীর টব নির্ম্মাণ চলিবে এবং তাহাতে দেব-দেবীর পরিবর্ত্তে বিবিধ কীট-পতঙ্গাদির ও সরীসৃপ প্রভৃতির আলেখ্য রচিত হইবে। এবং ক্রমে কল্পনা-প্রসূত উচ্চ কলারও আবির্ভাব, ও পরে বিজ্ঞান এবং

ইতিহাসেরও চর্চ্চা, আশা করা যাইতে পারে। কাব্যগীত—নৃত্য-কলাদি ত থাকিবেই। ফলে, সুস্থ সরল প্রাচীন গ্রাম্য জীবনের পুনরুদ্ধারই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য। দেখা যাইতেছে, তিনটি বিষয়ে শিক্ষাদান এবং তাহাদের উৎকর্ষ সাধন মণ্ডলীর লক্ষ্য—কৃষিকার্য্য, শিল্পকলা এবং ললিত-কলা। কৃষিকার্য্যে মণ্ডলী এখনও বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, কিন্তু তৎপক্ষে তাহার অতীত এবং বর্ত্তমান চেষ্টা যে শুভফল প্রসব করিবে, এমন আশা আছে। শিল্পকলায় কতকটা কায হইয়াছে। গোড়ায় ইহাতে অনেক বাধাবিঘ্ন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কার্য্যারম্ভে দেখা গেল যে, তাঁত ও চরকা প্রভৃতির ব্যবহার এতকাল বিলুপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের গঠন প্রণালী এবং চালাইবার পদ্ধতি জানে এমন লোকই নাই। এমন কি, ইহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে বারমিঙ্গহাম (Birmingham) ও শেফিল্ডের (Sheffield) কামারেরা পর্য্যন্ত অসমর্থ বা অনিচ্ছুক ছিল। যাহা হউক মণ্ডলীর দ্বারা বস্ত্রবয়নাদির বিশেষ সুবিধা ও উৎকর্ষ হইয়াছে। ম্যান দ্বীপে (Isle of Man) সেণ্টজর্জ্জ ক্লথ (St. George's Cloth) নামে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পশমও যেমন খাঁটি—রংও তেমনি পাকা। কিন্তু ইহার একটি মহৎ দোষ আছে—শীঘ্র ছিঁড়ে না বা খারাপ হয় না। যে সকল সুন্দরী এক বৎসরে তিন চারি দফা নূতন পোষাক করিয়া লন, তাঁহাদের পক্ষে এই বহুকালস্থায়ী কাপড় সামান্য অসুবিধা নয়।

রস্কিনের কার্য্যকলাপের এইরূপ বিস্তৃতভাবে সমালোচনা

করিতে হইলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। এ প্রবন্ধে বিস্তৃত সমালোচনারও প্রয়োজন নাই। রস্কিন্ কি ধাতুর লোক ছিলেন, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার চিত্র পাঠ-কের সম্মুখে ধরিতে চাই। উপরে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক দেখিয়াছেন যে, রস্কিন্ কেবল কলা-খেয়ালি ছিলেন না, পরন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং কার্য্য সাধনের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, তাহার আয়োজনে রস্কিনের চেষ্টা ও ক্ষিপ্রকারিতা আদর্শ-স্থানীয়। শিক্ষা, উপদেশ, চিত্রাঙ্কনের ত কথাই নাই। অর্থসাধ্য বিষয়ে অর্থদানে তিনি সকলের অগ্রে এবং সকলের উপরে। বাস্তবিক, অর্থদানে তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত লোক বড়ই বিরল। কেবল যে প্রিয় এবং প্রেয় বিষয়সমূহেই তাঁহার এই মুক্তহস্ত-বদান্যতা ছিল, তাহা নয়, তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য অসামান্য এবং সে হৃদয়ের নিরতিশয় দয়াপ্রবণতা নিতান্ত গল্পের ন্যায় শুনায়। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি উইল অনুসারে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। কিন্তু যে সকল আত্মীয়স্বজন বৃদ্ধ রস্কিনের নিকট অর্থপ্রাপ্তি আশায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে আশাতীত অর্থ দিয়া তাঁহাদের হতাশ হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা দূর করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে একলক্ষ পাঁচ হাজার টাকা (£7000) দান করিয়াছিলেন। কেবল যদি এই দানেই তাঁহার অর্থসাহায্য পর্য্যবসিত হইত! তেইশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার (£157000) বিষয়ের মধ্যে তিনি নিজের জন্য কেবলমাত্র এক

লক্ষ আশি হাজার টাকা (£12000) রাখিয়াছিলেন। বাকি সমুদয় দানে নিঃশেষিত হয়।

এই উদার প্রীতি আবার, কেবলমাত্র মানবজাতিরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। আদর্শ হিন্দুর ন্যায় তিনি সমুদয় জীবগ্রামকে স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন। অক্সফোর্ডের (Oxford) পল্লীমধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন রস্কিন্ পথের কুক্কুরকে ধরিয়া আদর করিতেছেন। ফলতঃ গ্রাম্য পশুপক্ষীদিগকে তিনি আপন জন বলিয়া জানিতেন। হিন্দুর পূজিতা গাভীকে তিনি ভগিনী (Sister cow) বলিতেন। সুতরাং, তিনি যে ক্রোধদীপ্ত জ্বালাময়ী তীব্র ভাষায় শিকার প্রভৃতি নিষ্ঠুর আমোদের ভূয়সী নিন্দা করিতেন, তাহা বিচিত্র নয়। বাস্তবিক, তাঁহার হৃদয় অনেকটা আদর্শ হিন্দুহৃদয়ের ন্যায় ছিল। হিন্দুরই ন্যায় তাঁহার বাস্তুনিষ্ঠা ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটি মত নিম্নে বিবৃত করিতেছি। তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিবিধ স্থানে বাস্তু সম্বন্ধে তিনি যে সকল হৃদয়স্পর্শী মনোজ্ঞ কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহাদের কতকগুলি এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া, তাহার ভাবানুবাদ পাঠককে উপহার দিতেছি। রস্কিনের মতে, নিজের জন্য একটি বিশ্রামের স্থান—এমন একটি স্থান যেখানে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে পা ছড়াইয়া দিতে পারা যায় —ঠিক করা, আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম শুভ-কৃত্য। এই বাস্তু নির্ম্মাণে সংযম ও মিতব্যয়িতার আবশ্যক। তুমি এমন করিয়া বাস্তু নির্ম্মাণ করিও না যে, তাহার

অভ্রভেদী উচ্চতা, বা পল্লীব্যাপিনী বিস্তৃতি, অথবা গঠনগৌরব লইয়া লোকের কাছে গর্ব্ব করিতে পার। বাস্তটি তোমার অবস্থানুরূপ হওয়া চাই—বরং অবস্থার একটু নীচে হইলে ভাল, ত উপরে নয়। এ জগতে বাস্তই পুণ্যক্ষেত্র—পবিত্রভূমি ("Holy land") এবং তুমি তাহাকে এমন পবিত্র ও সুখের করিয়া তুলিবে যে, যদি দৈবক্রমে বাস্ত ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হও, সে আদেশ পালনে যেন তোমার গভীর মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত হয়। বাস্ত ত কেবল ইষ্টক বা প্রস্তর-রচিত আশ্রয়াবরণ নহে। ইহা তোমার অবস্থার কত পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে, সৌভাগ্য-সম্পদে তোমার হাসির সঙ্গে হাসিয়াছে—বিরহ-বিরোধ-বিপদের অশ্রু-পাতে কাঁদিয়াছে। কত সুখ-দুঃখের—মান-অপমানের—লজ্জা-ভয়ের স্মৃতি ইহাতে বিজড়িত। জীবনের প্রায় সকল অভিনয়ই এই বাস্ত-মঞ্চে। কত চিরবিলুপ্ত মুখের শ্রী—শিশুর কাকলী—যৌবনের উচ্ছ্বাস—বার্দ্ধক্যের শুভ্র উদার প্রীতি ইহার প্রতি কক্ষ অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ হেন বাস্তকে ছাড়িতে চায় কে? কোন্ পিতা ইচ্ছা করে যে, তাহার সন্তানসন্ততি এই বাস্তর প্রতি স্নেহ-শ্রদ্ধা পোষণ করিবে না বা ইহার মঙ্গলময় প্রভাব হইতে শুভ সঞ্চয় করিবে না? এবং কোন্ পিতৃ-মাতৃ-বৎসল সন্তান ইহাকে সহজে বিসর্জ্জন দিতে পারে? যে জাতি কেবল এক পুরুষের জন্য বাস্ত নির্ম্মাণ করে, রস্কিন্ তাহাদের কিছুই ভাল দেখেন না।

আনন্দ উপভোগের বিবিধ উপকরণে গৃহ পূর্ণ থাকা চাই। জগতের আর কোন স্থান বাস্ত অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিপ্রদ বা

চিত্তাকর্ষক না হয়। সংখ্যায় অধিক না হউক সুন্দর সুন্দর পুস্তক থাকাও চাই।

এই গৃহের অধিশ্বরী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন স্ত্রী। "ন তৎ গৃহং যত্র ন সহ-ধর্ম্মিণী"। যে গৃহে স্ত্রী তাঁহার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারেন, সেখানে স্বামী বলহীন, সন্তানসন্ততি দুর্ভাগা। সমাজের সমৃদ্ধি—স্ত্রী ও মাতার গুণে ও ধর্ম্মে। স্ত্রী হইতেই স্বামীর বল, মা হইতেই ছেলেদের আশাভরসা। এই প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে রস্কিনের মতের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, স্ত্রীশক্তি—যুদ্ধ করিবার জন্য নয়, শাসন করিবার জন্য। স্ত্রীবুদ্ধি উদ্ভাবন-পটীয়সী বা সৃষ্টিকুশলী নয়। সে বুদ্ধির কার্য্য মধুর শাসনে, শৃঙ্খলাস্থাপনে এবং মীমাংসা-করণে। রমণী যুদ্ধদ্বন্দ্ব করেন না, কিন্তু যুদ্ধের জয়মাল্য প্রদান করেন। তিনি স্তুতি-নিন্দার দ্বারা তাঁহার জগৎকে শাসন করেন। যে গৃহ তাঁহার দ্বারা সুশাসিত, সে গৃহে বিপদ-আপদ, পাপ-প্রলোভন, ভুল-ভ্রান্তি আসিবার কথা নাই। বাস্তব গৃহের প্রকৃতিই এই। ইহা শান্তির নিকেতন। গৃহমধ্যে তুমি যে কেবল দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রয় পাও, তাহা নয়, দ্বন্দ্ব, সংশয় ও ভীতি হইতেও রক্ষা পাও। এবং যেখানেই আত্মধর্ম্মপরায়ণা-স্ত্রী—সেইখানেই এই গৃহ। যদিও তাঁহার শিরোপরে তারকা-খচিত আকাশ ভিন্ন আর কোন আবরণ না থাকে, এবং পদতলস্থ শিশির-নিষিক্ত ঘাসের উপর খদ্যোতের আলোক ভিন্ন অপর কোন প্রদীপ না জ্বলে, তাহা হইলেও সেই স্ত্রীর চারিপার্শ্বেই গৃহ। অধিকন্তু

যদি তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত আভিজাত্য থাকে, তাহা হইলে ত সে গৃহের পরিসর নিয়তই বাড়িতে থাকিবে, এবং অনেক গৃহহীন তাহার শান্তিপূর্ণ আলোকের নিমন্ত্রণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় আশ্রয় লাভ করিবে।

এই গৃহের সুখ ও সুশৃঙ্খলার পক্ষে পিতাপুত্রের কর্ত্তব্যও নিরূপণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে রস্কিনের নিজের কিশোর জীবন এবং তদানীন্তন গৃহ তাহার আদর্শ। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করা, তাঁহাদের আদেশপালনে অবহিত হওয়া যে, পুত্রকন্যার প্রধান কর্ত্তব্য—একথা আমরা প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষায়ও পড়িয়াছি। রস্কিনের উপদেশ—পিতামাতার প্রতি। তিনি বলেন, সন্তানসন্ততি যে পিতামাতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিবে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং অশেষ মঙ্গলের আকর। কিন্তু এই বিশ্বাস ও নির্ভর পিতামাতার গুণ ও ব্যবহার-সাপেক্ষ। এই অসঙ্কোচ বিশ্বাসের উপযুক্ত হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের কথা। পিতা হইবেন পুত্রের অবলম্বন—মাতা শুভকরী পাবনী শক্তি—এবং উভয়েই সেই নবীন জীবনের দুর্ব্বলতা—অমঙ্গল—বিপদ—ও বিস্ময়ে ঈপ্সিত আশ্রয় হইবেন—ইহা কি সহজে ঘটে? রস্কিনের নিজ গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা, সংযম ও শাসন মনে কর, তবে বুঝিতে পারিবে এই দেব-প্রার্থিত শুভফল আয়ত্ত করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে পিতামাতার কিরূপ আত্মোৎসর্গ আবশ্যক। ইহার জন্য, শিশুর কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই সচেতন হওয়া চাই। কথা কহিতে অসমর্থ হইলেও, যখন শিশু

হাসি দেখিয়া হাসিতে শিখিয়াছে, রাগ দেখিয়া রাগিতে শিখিয়াছে, তুমি কি বলিতে চাও তখনও গৃহে স্নেহ-প্রীতি থাকুক বা না থাকুক, পিতামাতার মুখ শান্তির আলোকে প্রফুল্ল, বা অসন্তোষের ভ্রূকুটিতে নিয়ত অন্ধকার হইয়া থাকুক বা না থাকুক তাহাতে শিশুর কিছু আসিয়া যায় না? কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই যে শিশুর নৈতিক জীবন গড়িতে থাকে, রস্কিনের এই মত গৃহস্থ-মাত্রেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন।

রস্কিনের নিজের পিতামাতার উপর শ্রদ্ধা ভক্তির উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাহা চিরকালই অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৬৪ সালে, যখন রস্কিনের বয়স প্রায় ৪৪ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, কিন্তু মাতা বহুকাল জীবিত ছিলেন। রস্কিন্ নিজে বৃদ্ধ হইলেও, মাতার প্রতি কখনও কোন কারণে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। এবং বন্ধুবান্ধব বা অপর কাহারও মুখ হইতে নিজের অভিলষিত কোন বিষয়ে বা বহুকাল-পোষিত কোন ধারণা সম্বন্ধে অতি ক্ষীণ প্রতিবাদ শুনিলে যে রস্কিন্ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন, মাতার প্রতিবাদ তিনি অবনত মস্তকে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। এস্থলে বক্তব্য, আত্ম-পক্ষ সমর্থনে রস্কিনের কঠোর নির্ব্বন্ধাতিশয় ছিল। তর্কে তাঁহার "গোঁ" ছিল। কিন্তু নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলে, তাঁহার আত্মগ্লানির সীমা থাকিত না।

গৃহের সুখ-শান্তির পক্ষে আর একটি উপাদান—ভাল ভৃত্য। রস্কিন্ বলেন, ভাল চাকর পাঁইবার কেবল একটিমাত্র উপায়

আছে—ভৃত্য যে তোমাকে কায়মনোবাক্যে সেবা করিবে তৎপক্ষে উপযুক্ত হও। ভাল মনিবের সেবা করিতে সমস্ত প্রকৃতি এবং মানবমণ্ডলী তৎপর। অনুদার-কঠোর-হৃদয় প্রভুর সেবা করা দূরে থাকুক, ভৃত্যবর্গ তাহার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। রস্কিন্ নিজে বড় ভৃত্যবৎসল ছিলেন। তাহাদের সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও প্রীতির প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। কোন ভৃত্য কোন সামান্য বিষয়েও ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়েও দৃষ্টি ছিল। রস্কিন্ প্রায়ই বন্ধুবান্ধবকে ভোজ দিতেন এবং ভোজনের অতি বিস্তৃত আয়োজন করিতেন। এত ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত যে, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বা অভ্যাগতবর্গ কেহই তাহার সকলগুলির আস্বাদন লইতে পারিতেন না। ইহাতে পাছে পাচক ভাবে রন্ধনের দোষ হইয়াছে, এই জন্য রস্কিন্ রন্ধনের প্রশংসা করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাইতেন এবং বলিয়া দিতেন "পাচককে গিয়া বল, আমি নিজে এই কথা বলিতেছি।"

নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে রস্কিনের ন্যায়পরতা, দয়া ও ভৃত্য-বাৎসল্যের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার একটি পুরাতন ভৃত্য বহুকাল ধরিয়া শঠতাপূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক টাকা ঠকাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার চাকুরির প্রশংসা না করিয়া, বা সে যে বিশ্বাসযোগ্য এরূপ পত্র না লিখিয়া তাহাকে ছাড়াইলে তাহার অন্যত্র কাজ জুটিবে না এবং সে ও তাহার পরিবারবর্গ খাইতে পাইবে না, এই ভাবিয়া রস্কিন্ বরাবর তাহাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট বেতন দিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব পিতৃমাতৃভক্তি—প্রদীপ্ত বাস্তবনিষ্ঠা—কল্পনাকল্প দান-শীলতা—সর্ব্বজীবে প্রীতি এই সকল গুণে এই অসামান্য লোক ইংরেজ হইয়াও আদর্শ হিন্দু।

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে রস্কিনের মতামত একেবারে প্রচলিত মতের বিরোধী, সুতরাং তাহার আলোচনা নিষ্ফল এবং তর্কজালের কুটিলতায় নীরস। তবে এইমাত্র বলিব যে, তাঁহার মতসকল ভ্রান্ত হইলেও তাহাদের মূলে দয়া, প্রীতি এবং ধর্ম্মভাব প্রোজ্জ্বল রহিয়াছে। যদি কখন আবার সত্যযুগ ফিরিয়া আসে, বা কবিকল্পিত golden age জগতে আবির্ভূত হয়, তবেই সেই সকল মত চলিতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যে দু'একটি যে, কালে চলিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। এখনও কেহ কেহ তাঁহার কতিপয় মতের পক্ষপাতী এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেছে।

রস্কিন্ কুসীদ ব্যবহারের বড়ই বিরোধী ছিলেন। মুসলমান বা য়ীহুদী এমন কেহ নাই সুদ লইতে যাহার এমন ধর্ম্মগত মর্ম্মান্তিক আপত্তি। কিন্তু তাঁহার এই মতও চলিত অর্থ-শাস্ত্র-সম্মত নয়।

রস্কিনের অসংখ্য বন্ধুবর্গ সকলেই একবাক্যে তাঁহার অকৃত্রিম —প্রগাঢ় বন্ধুবাৎসল্যের প্রশংসা করেন। এবং পরিচিত-অপরিচিত যে কেহই তাঁহার আতিথ্য উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার অমায়িক এবং উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

সাধারণের শুভকল্পে তাঁহার বিস্ময়জনক আত্মোৎসর্গ এবং

অর্থদানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ব্যক্তিগত দানপরতাও অদ্ভুত ছিল। সাধারণতঃ, পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের অপেক্ষা পতনশীলের রক্ষার্থই তাঁহার যত্ন ও প্রয়াস ছিল। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। আমরা এইবার তাঁহার সর্ব্বজনমুগ্ধকর অপূর্ব্ব রচনা-শিল্পের আলোচনা করিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব।

কলা-সৃষ্টি-কৌশলে বা কলাতত্ত্ব সমালোচনায় রস্কিন্ সার্ব্বজনীন্ প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলেও, ইংরেজী সাহিত্য-সংসারে গদ্য-রচনা-পটুত্বে তাঁহার আসন খুব উচ্চে। তিনি প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর হউন বা না হউন, তাঁহার কলাবিজ্ঞান নির্ভুলই হউক বা ভ্রমাত্মক হউক, সমাজবিজ্ঞানে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করুক বা না করুক, সকলেই স্বীকার করেন ইংরেজী গদ্য-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ নাই। যাঁহারা নিজে উৎকৃষ্ট গদ্য লিখিয়াছেন—যাঁহাদের গদ্য-রচনা-সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ, তাঁহারাও একমতে রস্কিন্কে গদ্য-শিল্পের রাজসিংহাসন দিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী—আমাদের অনেকেই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা রস্কিনের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা, বোধ হয়, তাঁহার রচনার রসগ্রহণে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মাষ্টার এখনও বঙ্গদেশের মায়া পরিত্যাগ করেন নাই। বরং ভয় হয়, এখন তিনি তাঁহার সেই আদিম গ্রাম্য-স্কুল-মাষ্টার মূর্ত্তি বহুধা বিভক্ত করিয়া নানারূপে দেশের হিতসাধন করিতেছেন। আগে তিনি ছিলেন কেবল স্কুলমাষ্টার, এখন তিনি "প্যাট্রিয়ট"-

সম্পাদক এবং রিডিংরুমের তত্ত্বাবধারক। আদিম তারাচাঁদের বাহুমূলে Citizen of the World এবং Spectator বিরাজ করিত, এখন "মেকলে" (Macaulay) এবং "বায়রণ" (Byron) সেই দিব্যস্থান বাসের সুখ এবং গৌরব উপভোগ করিতেছে।

স্মরণ হয়, যৌবন মুখে যখন রস্কিন্ এবং টেনিসনের প্রথম পরিচয় সৌভাগ্য লাভ করিয়া অপূর্ব্ব রসাস্বাদন জনিত আনন্দোপভোগ-চঞ্চল-হৃদয়ে বন্ধুবর্গকে তৎপ্রসঙ্গে ব্যস্ত করিতেছিলাম, ঠিক সেই সময়ে একজন "তারাচাঁদের" জনান্তিক বিজ্ঞ মন্তব্য শ্রবণের সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি ক্ষুব্ধহৃদয়ে তৎপার্শ্ববর্ত্তী সহচরের নিকট আক্ষেপ করিতেছিলেন, কি গুণে যে লোকে রস্কিনের গদ্যের বা টেনিসনের পদ্যের প্রশংসা করে, তাহা বুঝা যায় না—বোধ হয় ইহা একটি "ফ্যাসান" মাত্র। উহাদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আদরণীয় কিছুই তিনি দেখিতে পান না। সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ মতবাদ বিরল নহে। আমাদেরও মধ্যে এমনও বিজ্ঞ সাহিত্য-রসিক আছেন, যাঁহারা বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহকে জ্যাঠামি বলিয়া নিজেদের জ্যেষ্ঠতাতত্বের পরিচয় দেন—এবং রবিবাবুর অমরভোগ্য কবিতাকে নীরস ভাববিকৃতির ভাণ্ডার বলিয়া তাঁহাদের ক্লেদ-ক্লিন্ন নাসিকা কুঞ্চিত করেন। ফলতঃ "তারাচাঁদ" গোষ্ঠীর ধ্বংস নাই। এক হিসাবে ধ্বংস না হওয়াই ভাল। সংসারে অন্ততঃ তাহারা একটু বৈচিত্র্য রাখিয়াছে। রহস্য ছাড়িয়া রচনার যে উৎকর্ষ সাহিত্য-সেবকের পরম আদরের বস্তু, তাহার রস-উপভোগ করা দীক্ষাহীনের সহজ আয়ত্ত নহে।

শুধু কি তাই? প্রকৃত রসাস্বাদনের নিমিত্ত বোধ হয়, একটু স্বাভাবিক শক্তি—একটু প্রতিভার প্রয়োজন।

আমার বিশ্বাস, যাহাকে ইংরেজীতে—style বলে, রচনার সেই বিশেষত্ব সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ধরিতে পারেন না। বাঙ্গলা সাহিত্যে আধুনিক পাঠ্য গ্রন্থও খুব কম। বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য ত সে দিনকার। আমাদের মধ্যে এমনও লোক এখনও জীবিত আছেন, যিনি এই সাহিত্যকে জন্মিতে দেখিয়াছেন। পাঠ্য গদ্য পুস্তক এত কম যে, বোধ হয় এক হাতের অঙ্গুলি মধ্যেই তাহাদের গণনা নিঃশেষিত হয়। সাহিত্য চর্চ্চার এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে রুচিশিক্ষা দুর্ঘট। যাঁহারা বিশাল ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা অনেক পুস্তক পাঠে এবং বিভিন্ন প্রকার রচনাশিল্পের নিয়ত চর্চ্চায়, ধীরে ধীরে সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রসাস্বাদন শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এই ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চারই ফল। সেই জন্য এই নবজাত সাহিত্যে একটু ইংরেজী গন্ধ থাকিতে পারে, এবং বিদ্বেষীরা এই সাহিত্য সম্বন্ধে যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন, এই বিলাতী গন্ধই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এ দোষ অনিবার্য্য। যখন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য—অন্ততঃ বঙ্গীয় গদ্য—ইংরেজী শিক্ষার নিকট এত ঋণী তখন তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা দোষের হইবে না। যে কারণে শিশু লাটীন সাহিত্যে গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব—যে কারণে শিশু ইংরেজী সাহিত্যে গ্রীক, লাটীন এমন কি প্রাচীন ফরাসী সাহিত্যেরও

প্রভাব—এবং বহু দিনের কথা নয়, এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে আমাদের তদানীন্তন বাঙ্গলা রচনার ভিতর যে কারণে পারসীক সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়, সেই সকল অমোঘ-কারণ-সঙ্ঘাতে আমাদের আজিকার সাহিত্যেও এই বিলাতী গন্ধটুকু দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের গৌরবের কথা এই যে, এ সাহিত্যের জন্মকালেই দেশে এমন ক্ষমতাশালী এবং প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকবর্গের অভ্যুদয় হইয়াছিল যে, তাঁহাদের প্রভাবে ইহার মৌলিকতা এবং দেশীয় বিশেষত্ব আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হইয়াছে। মাইকেল খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও সংস্কৃত এবং পূর্ব্বতন বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার এমন প্রগাঢ় অনুরাগ ও বিস্তৃত পারদর্শিতা ছিল, হিন্দুভাবে তাঁহার হৃদয় এমন পরিপূর্ণ এবং আচ্ছন্ন ছিল, যে তাঁহার রচনাবলী বিলাতী কাব্য-কলার বাহ্য সৌষ্ঠব সম্পদে উদ্ভিন্ন-শ্রী হইলেও, কোথায়ও দেশীয় ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। বিলাত হইতে আনীত তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গলা ভাবের সহিত বেশ মৈত্র্য স্থাপন করিয়াছে। বাগ্‌দেবীর এই বিচিত্র বসন বিলাতী তাঁতে প্রস্তুত হইলেও, এবং বিবিধ বিলাতী কারুকার্য্যে খচিত হইলেও, ইহা আমাদের দেশীয় ভাব সৌষ্ঠবের কোন হানি না করিয়া বরং তাহার গৌরব এবং সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসাদি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। এবং পরবর্ত্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগেরও ভিতর বিলাতী ভাবের আমদানী খুব কম। ফলতঃ, পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, এই বিদেশী ভাবের উৎপাত এবং উচ্ছৃঙ্খল ঘটা অযোগ্য

লেখকবর্গের ভিতরই বেশী। মুখে তাঁহাদের জলন্ত দেশানুরাগের বহ্নি জ্বলিতে পারে—দেশীয় সকল বিষয়েই তাঁহাদের খুব উচ্চ-কণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকিতে পারে—কিন্তু লিখিবার কালে তাঁহাদের স্পর্দ্ধিত দেশ-বাৎসল্য ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে, দেশীয় ভাবকে লেখনীর মুখে অক্ষুণ্ণ অক্ষত রাখা তাহাদের ক্ষমতায় কুলায় না। এদিকে প্রতিভার ত অসংখ্য দোষ ও ত্রুটি আছেই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার নাড়ী-জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না। প্রতিভা কখন শিব গড়িতে বানর গড়ে না। যিনি এই দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহার অশেষবিধ অমূল্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু যে পদার্থটাকে প্রতিভা বলা যায়, তাহার ক্ষীণ ছায়া পর্য্যন্তও তাহাকে স্পর্শ করে নাই।

কথায় কথায় আলোচ্য বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। রচনার যে বিশেষ উৎকর্ষকে style বলে, তাহারই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছিলাম।

রস্কিনের প্রতিপত্তি এই style লইয়া। ইহাতেই তাঁহার গৌরব এবং সাহিত্যকলায় শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। রস্কিনের styleই কলা-বিশেষ। এই style কথাটির ঠিক প্রতিবাক্য আমাদের বাঙ্গলায় নাই। রচনা বলিলে composition বুঝায়। এদিকে আমরা বলিয়া থাকি অমুক লেখকের ভাষাটি বেশ, তখন আমরা ভাষা শব্দটি style অর্থেই অনেকটা ব্যবহার করি। কিন্তু ভাষা শব্দের অপর একটি অর্থ আছে—language। ইংরেজীতেও কখন কখন language, style অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তথাপি style কথাটির ইংরেজীতে একটি স্বতন্ত্র এবং বিশেষ অর্থ আছে।

বাঙ্গলায় তদনুরূপ বিশেষার্থবোধক শব্দ নাই। নামাবধারণে যখন গোল, তখন ভাবাবধারণে একটু গোল থাকিবারই কথা। বাস্তবিক style অর্থে প্রতীচ্য সাহিত্য-রসিকেরা যাহা বুঝেন, আমাদের পাঠক সাধারণের তাহার স্পষ্ট ধারণা নাই। বোধ হয়, আমাদের লেখক সাধারণের লেখায় উক্ত পদার্থের অভাব আছে। সুতরাং style কাহাকে বলে আমরা তাহা এখন বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

মনোগত ভাবসকল যখন অর্থগর্ভ শব্দ-সঙ্কেতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাই, তখন আমরা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। প্রকাশের প্রাঞ্জলতার জন্য হৃদগত ভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন—অর্থাৎ বক্তব্য কথা তোমার হৃদয় মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হওয়া চাই। যাহা তোমার মনোমধ্যে অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ—যাহার পরিষ্কার ধারণা তোমার নিজেরই নাই—তাহার স্পষ্ট প্রকাশ অসম্ভব। ভাব পরিস্ফুট হইলে তাহার একটি ক্রম থাকে; শব্দক্রম যখন সেই ভাবক্রমের অনুবর্ত্তী হয়, তখনই প্রকাশের প্রাঞ্জলতা লব্ধ হয় অর্থাৎ সমীচীন ভাষার উৎপত্তি হয়। কোন্ ভাবার্থক শব্দ কাহার পর বসিবে, তাহার একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, এবং সেই নিয়ম অনুসারেই ভাষার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ সেই সকল নিয়ম, ভাষালোচনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া, লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নিয়ম গড়েন না—অনুসন্ধানে তাহাদের আবিষ্কার করেন মাত্র। এই সকল নিয়মই ভাবপ্রকাশের মৌলিক সহায় এবং তদনুবর্ত্তী ভাষাই নির্দ্দোষ এবং প্রাঞ্জল। ইহাই রচনার

প্রথম স্তর। কিন্তু ভাব নানা জাতীয়। যেখানে রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, সেখানে শব্দ চয়ন, ছন্দ, ঝঙ্কার প্রভৃতি নানা অলঙ্কারের প্রয়োজন। কোন সত্য বা তথ্যের পরিষ্কার এবং যথাযথ প্রকটনে আবার অন্যবিধ শব্দ নির্ব্বাচন এবং বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন। রচনার দ্বিতীয় স্তর এই। কিন্তু style এই দুটি হইতে আরও কিছু, অর্থাৎ styleএ এই দুইটিও আছে এবং এই দুটি হইতে অতিরিক্ত আর একটি পদার্থ আছে। এমন অনেক রচনা আছে যাহা বেশ প্রাঞ্জল—শব্দনির্ব্বাচন ও বাক্যবিন্যাসে যাহা নির্দ্দোষ—রসোদ্ভাবনে যাহার অমোঘ সন্ধান—কিন্তু যাহাকে style বলে তাহার কিছুই তাহাতে নাই। এই যে অতিরিক্ত পদার্থ উহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি মনোহর। তাহাতেই লেখকের বিশেষত্ব। সেটি লেখকের নিজের বলিবার প্রথা—তাঁহার ভঙ্গী। এই বিশেষত্ব—লেখকের এই ভঙ্গী—ইউরোপীয় সাহিত্যে style বলিয়া অভিহিত। ইহা শিখিবার বা বাহির হইতে অর্জ্জন করিবার বিষয় নয়—স্বভাবসিদ্ধ গুণ, যাহার আছে তাহার রচনাতে প্রকাশ পাইবেই। কলা-ব্যবসায়ীর গৌরব যেমন সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ বিকাশ-সাধনে, তেমনই লেখকের গৌরব—রচনায়, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব বা ভঙ্গীপ্রকাশে।

কথাটি আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইলে, উপমান বিষয়টির আর একটু বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এবং যদিও উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত তাহার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ নয়, সাহিত্য সমালোচনায় উহা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলা-

ব্যবসায়ীর কার্য্য সৌন্দর্য্য লইয়া—অর্থাৎ প্রত্যেক কলা-ব্যবসায়ীকে তাঁহার স্বকীয় ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বা সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখাইতে হইবে। তাহা না পারিলে কলা-জগতে তাহার স্থান নাই। কবির কথাই ধরা যাক্। যিনি ভাষা, ছন্দ, মিল ও ঝঙ্কার, প্রভৃতি উপাদান সংযোগে সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া পাঠকের হৃদয়ে রস-তরঙ্গ তুলিতে অক্ষম, তিনি কবি নন। কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, এই সৌন্দর্য্য বিকাশ এবং রসোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজের বিশেষত্ব দেখাইতে হইবে—অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য রচনার ভিতর এমন একটি সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য থাকিবে, যাহা অপর কবিদিগের সৌন্দর্য্য রচনা হইতে তাহাকে বিভিন্ন এবং পৃথক্ করিয়া তুলিবে। এই বৈলক্ষণ্যই কবির স্বকীয় অভিব্যক্তি। ইহারই অভাবে পো (Poe) ছাড়া মার্কিন দেশীয় কোন কবিই সাহিত্য সমাজে আভিজাত্য গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। লঙ্‌ফেলো (Longfellow), এমার্‌সন্‌ (Emerson) ব্রায়ণ্ট (Bryant) প্রভৃতি সুন্দর কবি। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও তাঁহাদের অনেক কবিতা পাঠেই হৃদয় রসসিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সে সকল কবিতা সাধারণ ইংরেজী কবিতা হইতে বিশেষরূপে বিভিন্ন নয়। তাহারা পরের ছাঁচে ঢালা। তাহাদের ছন্দ বা ঝঙ্কারে অভিনবত্ব নাই—স্বরভঙ্গীতে নূতন কণ্ঠের পরিচয় নাই। কিন্তু পোর (Poe) কবিতা পাঠে আমরা যেন একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব জগতে যাই—নূতন রসের আস্বাদন পাই—অপরিচিত স্পর্শের পুলক-হর্ষ অনুভব করি। পাঠমাত্রেই বোধ হয় ইহার তুল্য বা

অনুরূপ কিছুই ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। তাই মার্কিন সাহিত্যে, পদ্যে পো (Poe) এবং গদ্যে হথরন্ (Hawthorne)—কেবলমাত্র এই দুই জনই—মৌলিক গৌরবে গৌরবান্বিত। ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহাদিগের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর অনেক লেখক আছেন, কিন্তু ইঁহারা যেমন তেমনটি আর নাই। ইঁহাদের কাছে আমরা যাহা পাই, অপর কাহারও কাছে তাহা পাই না। তাহাতেই ইঁহাদের বিশেষত্ব, তাহাতেই ইঁহাদের এত আদর। কারণ যে কবিরই এই বিশেষত্ব আছে, তাঁহারই তজ্জনিত একটী চিরন্তন এবং অমোঘ আকর্ষণ আছে। তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি উন্নত আয়ত না হইলেও, অন্যত্র অপ্রাপ্য। গোলাপের বর্ণ-গৌরব বা পরিমল-গর্ব্ব না রাখিলেও, মৃদুবাসকামিনী তাহার জ্যোৎস্না-কোমল-মাধুর্য্যে হৃদয়কে মুগ্ধ করে। এই বিশেষত্ব বলেই—এই নিজস্ব গৌরবে—মাইকেল এবং হেমচন্দ্রের অনুকরণ-প্লাবিত বঙ্গদেশে "বঙ্গ সুন্দরীর" কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী রসগ্রাহী উপযুক্ত পাঠক মাত্রেরই নিকট বিশেষ আদর ও পূজা পাইয়াছেন—এবং সে আদর, সে পূজা ক্রমশই বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। তাই বলিতেছিলাম, কলানুকূল উপাদান-সমূহের বিশেষ সদ্ভাব সত্ত্বেও সৌন্দর্য্য বিকাশে ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য না থাকিলে যেমন কলা-রচনার প্রকৃত গৌরব নাই, সেইরূপ শব্দ-নির্ব্বাচন, পদবিন্যাস, বাক্যের প্রবাহ, ছন্দ ও ঝঙ্কারে বিশেষ সমৃদ্ধি থাকিলেও লেখকের বলিবার প্রথায় যদি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—নিজের ভঙ্গী না থাকে, তাহা হইলে সে রচনা-শিল্পেরও প্রকৃত গৌরব নাই। এই

ব্যক্তিগত রচনা-ভঙ্গী প্রকার-বিশেষে যে কেবলমাত্র মনোহর তাহা নহে, সময়ে সময়ে ইহার আবির্ভাব, ভাষা ও সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। একই রচনা-প্রণালীর মধ্যে বহুদিন বদ্ধ থাকিলে ভাষার জীবনীস্রোত ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম হয়। সেই সময়ে এই ব্যক্তিগত নূতন ভঙ্গী-বৈচিত্র্য আসিয়া ভাষাকে আবার জাগাইয়া তুলে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী গদ্যে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিয়ৎকাল ধরিয়া ফরাসী গদ্য একই ছাঁচে গঠিত হইয়া বৈচিত্র্য-হীন, সঙ্কীর্ণ এবং নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে জর্জ সাঁ (George Sand) এবং তদানীন্তন সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক প্রতিভাশালী তরুণ লেখকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ নূতন রচনা-ভঙ্গী দ্বারা সাহিত্য ও ভাষায় নবপ্রাণ সঞ্চারিত করিলেন। ইহা হইতেই সহজে বুঝা যায় রচনা-ভঙ্গী—style—কি অমূল্য পদার্থ—ইহার প্রভাব কিরূপ সুদূরব্যাপী—প্রয়োজনীয়তা কিরূপ বিস্তৃত।

রচনা-ভঙ্গী—Style—ভাবপ্রকাশে লেখকের ব্যক্তিগত বিকাশ হইলেও এমনও রচনা-রসিক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের রচনা-শিল্পে আত্মগোপন করিতেই চান—রচনা-ভঙ্গীতে যাহাতে ব্যক্তি ব্যক্ত না হয়, ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা এবং উদ্দেশ্য। এবং অনেক সাহিত্য-রসজ্ঞের মতে ইহাই রচনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ললিত-কলার মূল ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত লইয়া রচনা-ভঙ্গী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি—তাঁহার আর একটি ধর্ম্ম লইয়া রচনা-ভঙ্গীর এই আদর্শ বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

যে কলারচনায় কলাচেষ্টা একেবারে প্রচ্ছন্ন তাহাই প্রকৃত কলা। Art is to conceal art—অর্থাৎ তোমার কলাসৃষ্টি আয়াস-সম্ভূতই হউক, বা অনায়াস-লব্ধই হউক, অপরের চক্ষে তাহা প্রকৃতির সহজ সঞ্জাত পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়া চাই —তোমার বক্তিগত চেষ্টা যেন তাহার কোথাও কোন প্রকারে না বাহির হইয়া পড়ে। সেইরূপ রচনা-ভঙ্গী ভাবপ্রকাশে ব্যক্তিগত প্রথার বিকাশ হইলেও তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষত্ব না প্রকাশ পায়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক সেণ্ট ব্যূভ্ (St. Beuve) এই জাতীয় রচনার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—"সে রচনা-ভঙ্গী লেখকের নিজের, অথচ অপর সকলে প্রত্যেকেই তাহাকে তাহাদের আপন আপন রচনা-ভঙ্গী বলিয়া মনে করে—তাহা একাধারে আধুনিক এবং প্রাচীন এবং সকল যুগেরই সমসাময়িক।" বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক এবং অসাধারণ রচনাশিল্পী ফ্লোবের (Flaubert) এইরূপ রচনা-ভঙ্গীর গুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং উহাকেই নিজের আদর্শ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, রচনা যখন চরমোৎকর্ষ লাভ করে, তখন তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সৌন্দর্য্যের উদার বিশ্বজনীন অবারিত মাধুর্য্যে পরিণত হয়। তাহার ব্যক্তিগত ভাব সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন—মগ্ন—লীন হইয়া যায়। লেখক যখন নিজে ভাববিভোর, সৌন্দর্য্যমোহে আচ্ছন্ন, তখন তাঁহার আত্ম-বিলোপই সম্ভব। তখন তাঁহার জ্ঞাতসার চেষ্টা এবং জাগ্রত প্রকাশ বেদনা আনন্দোপভোগে পরিণত হইয়া অতর্কিতভাবে সাফল্যসম্পদ আনিয়া দেয়। ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপকরণসকল

অজ্ঞাতসারে—যেন কোন অপূর্ব্বশক্তি ঐন্দ্রজালিকের মহীয়ান্ মন্ত্রবলে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইতে থাকে। তখন রচনা-ভঙ্গী—যাহা মূলে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—সৌন্দর্য্যের দেশ-কাল-পাত্রহীন অবিশেষত্ব লাভ করে।

এই ন-ব্যক্তিগত—impersonal—রচনা-ভঙ্গী পরিপূর্ণ সুগভীর রসভোগের উপর নির্ভর করে। ইহাতে লেখক আবেশে মগ্ন—রসেরই প্রাধান্য—রসই সর্ব্বত্র। তাই ইহা অনেকটা কবিতার কাছা কাছি যায়। ফরাসী সাহিত্যে জর্জ সাঁর (George Sand) এবং ইংরেজী সাহিত্যে নিউম্যানের (Newman) গদ্য ন-ব্যক্তিগত রচনার উত্তম দৃষ্টান্ত। প্রথমোক্তের সম্বন্ধে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলিয়াছেন, "ইহা পাঠককে সঙ্গীতের ন্যায় বিচলিত করে"—It stirs you like music—এবং শেষোক্তের রচনার ছন্দ-মাধুর্য্য ইংরেজীতে প্রবাদ বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রস্কিনের রচনায় আমরা উভয়বিধ ভঙ্গীই দেখিতে পাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যে তাঁহার ন-ব্যক্তিগত ভঙ্গীরই প্রাধান্য। ব্যক্তিগত ভঙ্গীতে তাঁহার চরিত্রগত অধৈর্য্য—একদেশদর্শিতা—তর্কপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ অনেক স্থলেই তাঁহার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রস্ফুটিত হইয়া পাঠককে মুগ্ধ না করিয়া হৃদয়ে আঘাত দেয়।

আমরা বলিয়াছি যে, রচনা-ভঙ্গীর উৎকর্ষের জন্য লেখকের শব্দবিন্যাসে ও শব্দনির্ব্বাচনে বিশেষ ক্ষমতা থাকা চাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রচনার প্রাঞ্জলতার জন্য শব্দক্রম ভাবক্রমের অনুসরণ

করিবে। প্রত্যেক জাতির, সুতরাং প্রত্যেক ভাষার, এক একটি ক্রম আছে। কথোপকথনের ভাষার শব্দক্রমই সর্ব্বাপেক্ষা সরল; সুতরাং ভাবপ্রকাশে অধিকতর উপযোগী। রচনা-কুশলী তজ্জন্য সে ক্রমকে কখন লঙ্ঘন করেন না বা তাহা হইতে দূরে যান না। তাঁহার বাক্যাবলী যতই কেন দীর্ঘ—কুণ্ডলায়িত—বহুধাবিভক্ত হউক, কথিত ভাষার শব্দক্রমানুযায়ী বলিয়া, কথিত ভাষারই ন্যায় সুখবোধ্য। রস্কিনের এক একটি বাক্য নিতান্ত সুদীর্ঘ। বোধ হয় ডি কুইন্‌সি (De Quincy) ছাড়া অপর কোন ইংরেজী গদ্য-লেখক এমন যোজনব্যাপী বাক্যাবলী ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু উপরোক্ত নিয়মে গঠিত বলিয়া তাহাদের অর্থ সংগ্রহে কষ্ট পাইতে হয় না। ইরেজীতে মেকলের (Macaulay) ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। তাহার এক কারণ তাঁহার বাক্যসকল নিতান্ত ক্ষুদ্র আয়তনের, এবং তিনি কোন জটিল বিষয়ের দার্শনিক বা বিজ্ঞান-বিদের ন্যায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা করেন না। তিনি সকল বিষয়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার একটি মোটামুটি মীমাংসা করেন। 'আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কোন কোন স্থান ব্যতিরেকে রস্কিনের বাক্যাবলীর অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত একাধিকবার পাঠের প্রয়োজন হয় না। অথচ প্রাঞ্জলতাই মেকলের (Macaulay) বাক্যাবলীর প্রধান—এবং বোধ হয়—একমাত্র গুণ। কিন্তু রস্কিনের সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর অনন্ত কুণ্ডলীর মধ্যে শব্দের কি ইন্দ্রজাল—কল্পনার কি লীলা—ভাবের কি আবর্ত্ত—রসের কি আভোগ—সৌন্দর্য্যের কি উচ্ছ্বাস।

তাহাদের কি সুমিষ্ট ছন্দ—সুখপাঠ্য যতিবিচ্ছেদ—সমুদয়ে কি ঝঙ্কার। অর্থগ্রহণের নিমিত্ত যদি কখনও দুইবার পড়িতে হয়—সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পিপাসু হৃদয়ে শতবার—সহস্রবার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা যায়।

শব্দনির্ব্বাচনেও রস্কিনের অদ্ভুত ক্ষমতা। এ বিষয়ে তাঁহার দেব-দুর্লভ সৌভাগ্য। তিনি যেখানে যে কথাটি বসাইয়াছেন তাহা এমন সুন্দর বসিয়াছে! হৃদ্গত ভাবের সকল দিক্ তাহাতে এমন ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা এমন স্বচ্ছ, সুন্দর এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যময়—ভাব-গৌরবে এমনি উজ্জ্বল—যে পাঠকালে উপ-ভোগাধিক্যে প্রতি মুহূর্ত্তে রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

শব্দনির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গলার ন্যায় ইংরেজীতেও একটি পুরাতন তর্ক এবং মতবৈচিত্র্য আছে। আমাদের ভাষায় যেমন কেহ বাঙ্গলা শব্দ, এবং কেহ বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী, ইংরেজী ভাষায়ও সেইরূপ কাহারও অনুরাগ লাটীন এবং গ্রীক্ ধাতুমূলক শব্দের দিকে এবং কাহারও বা স্যাক্সন্ (Saxon) শব্দের দিকে। এ বিষয়ে—অপর সকল বিষয়েরই মত—যিনি একদেশদর্শী তিনিই ভ্রান্ত। বঙ্গভাষায় যেমন সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা উভয় শ্রেণীর শব্দের তুল্য প্রয়োজন এবং একই মূল্য, ইংরেজী ভাষায়ও সেইরূপ একদিকে গ্রীক্ ও লাটীন শব্দের, অপর দিকে খাঁটি ইংরেজী শব্দের, তুল্য প্রয়োজন—একই মূল্য। তাহা হইলেও, ইংরেজী এবং বাঙ্গলা ভাষায় এমনও খেয়ালি লেখক আছেন, যাহার অনুরাগ কেবল এক শ্রেণীরই শব্দের প্রতি।

আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে এমনও লেখক দেখিয়াছি, যিনি কেবল অসংযুক্ত বর্ণে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য দরবারে তাহা জাহির করিতে উৎসুক। সাহিত্যে কিন্তু এরূপ পালোয়ানি কসরত বা কুস্তিগিরির স্থান নাই। ভাব প্রকাশে সর্ব্বাঙ্গীন পটুতাই পরিণত ভাষার লক্ষণ। যে শ্রেণীর শব্দ যে ভাব প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সেই ভাব প্রকাশের জন্য সেই শ্রেণীর শব্দই অবলম্বনীয় —সর্ব্বথা অবলম্বনীয় এবং নিঃসঙ্কোচে অবলম্বনীয়। তাহা না করিয়া লেখক যদি তাঁহার ঝোঁক বা খেয়ালের অনুগামী হন, তাহা হইলে রচনার বৈচিত্র্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ অসম্ভব। ভাবের স্বর-গ্রামের সহিত ভাষার স্বর-গ্রামের মিলন বাঞ্ছনীয়। যাঁহার বাগর্থ প্রতিপত্তি আছে, তিনি কি আভিধানিক, কি চলিত —সকল শ্রেণীর শব্দই ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাস্থানে ব্যবহার করিতে সক্ষম। আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের পদ্য-বিভাগে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা। "স্বপ্ন প্রয়াণের" ন্যায় বাঙ্গলার অপর কোন পদ্য-কাব্যের অভিধান এমন বিস্তৃত নয়।

বঙ্কিমবাবু শেষাশেষি বাঙ্গলা শব্দেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহাতে যে তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছিল বলিতে পারা যায় না। যেখানে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে ভাব পরিস্ফুট হয়—পদসমষ্টি শ্রুতিমাধুর্য্য লাভ করে—রচনার সৌন্দর্য্য এবং গৌরব বর্দ্ধিত হয়—সেখানে সংস্কৃত শব্দই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সংস্কৃতের স্থানে বাঙ্গলা, বাঙ্গলার স্থানে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার

ভাষার অপব্যবহার বই আর কিছু নয়। পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু ইহা বেশ বুঝিতেন। তাঁহার মৃণালিনী উপন্যাসে মনোরমার যে রূপ-বর্ণনা আছে, তাহা আমূল সুনির্ব্বাচিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে তারকা-খচিত নিশীথ আকাশের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং বিবিধ যন্ত্র মিলিত ঐক্যতান বাদনের ঝঙ্কার-বিশিষ্ট। মৃণালিনীর সেই অধ্যায়টি যেন উচ্ছ্বসিতহৃদয়-কবি-রচিত রমণী-সৌন্দর্য্যের স্তবগান। কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্করণে স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা শব্দ যোজনায় সেই অনিন্দ্য-রচনা হতশ্রী হইয়াছে। সেই সংস্কৃত শব্দের মর্ম্মর-নির্ম্মিত অট্টালিকা স্থানে স্থানে ভগ্ন করিয়া তাহার ভিতর বাঙ্গলা শব্দের উলু খড় সংযোগে না তাহাতে রাজ-প্রাসাদের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে—না পর্ণশালার সহজ শিষ্ট শোভা প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু শব্দ নির্ব্বাচনে কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশ-পটুত্বের উপর দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। বাক্যের ছন্দ এবং শ্রুতিসুখের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উপরে ফ্লোবের (Flaubert) নামক যে ফরাসী লেখকের উল্লেখ আছে, তিনি বলিতেন, বাক্যাংশ বা পদ সমষ্টি এমনরূপে গঠিত হওয়া চাই যে, পাঠকালে শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মের সঙ্গে তাহা যেন বেশ সুমিলিত হয়। পড়িবার সময় যে বাক্যাংশ বুক চাপিয়া ধরে—হৃদয়ের উত্থান-পতনের তালে ব্যত্যয় ঘটায়—তাহা সুগঠিত নয়। সুতরাং প্রতি কথার ভাব-পটুতার সঙ্গে সঙ্গে, বাক্যের শ্রুতি সুখের প্রতি সে কথা কি পরিমাণে অনুকূল, তাহাও তুল্যরূপে দেখিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন

উপযোগিতার প্রতি নজর রাখিয়া তিনি শব্দ চয়ন করিতেন। এবং একটি কথার অন্বেষণে দিন—মাস—কখন বা বর্ষ কাটিয়া যাইত। ফ্লোবের (Flaubert) বলেন, একটি বিষয় বলিবার জন্য একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট ভাষা আছে—নামকরণে একটিমাত্র বিশেষ্য—তাহার গুণ নির্দ্দেশে একটিমাত্র বিশেষণ—এবং তাহাকে জীবিত জাগ্রত করিয়া তুলিতে একটিমাত্র ক্রিয়া। ভাষা ছাড়া ভাব নাই—ভাব ছাড়া ভাষা নাই। সুতরাং কোন একটি ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, সে ভাবের সঙ্গে যে ভাষার আজন্ম বন্ধন, সেই ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে শব্দ নির্ব্বাচনে লেখকের নিজের খেয়াল বা ঝোঁক চলিবে না। যে কথায় ভাবের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণ প্রতিভাত—ভাবপ্রকাশে এবং রসবিকাশে যে শব্দের নৈসর্গিক উপযোগিতা, তাহাই ধরিতে হইবে। রচনা-ভঙ্গী তখন ব্যক্তি-প্রধান না হইয়া রস-প্রধান হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রস্কিনের গদ্যে দুই প্রকার রচনা-ভঙ্গীই দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার রসপ্রধান ভঙ্গীই ব্যক্তি-প্রধান ভঙ্গী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শেষোক্ত ভঙ্গীর অনেক স্থানই তাঁহার চরিত্রের অসঙ্গতা-দোষের ছায়াপাতে দুষ্ট—তৎসত্ত্বেও তাঁহার গদ্যের তুল্য সর্ব্বগুণোপেত গদ্য ইংরেজী সাহিত্যে নাই। অপরাপর ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে অন্য সাহিত্যেও নাই। কেবল প্লেটোর (Plato) গদ্যের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। শব্দ-সম্পদে তিনি রাজা। সকল প্রকার শব্দই তাঁহার লেখনীমুখে যথাস্থানে এবং সুসঙ্গতরূপে প্রযুক্ত। কথিত ভাষার অনলঙ্কার

পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জলতা—তীরের ন্যায় তাহার "চুটকি" সন্ধান—এবং ভাবোচ্ছল—রসোচ্ছল গদ্যের ঝঙ্কার এবং রোল সকলই তাঁহার আয়ত্ত।

বাস্তবিক সে ভাষা—সে গদ্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা অসাধ্য। যেমন কোন সুদূর সাগর-সঙ্গম-বাহিনী স্রোতস্বিনী তুষার-মণ্ডিত স্বীয় পর্ব্বত-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া লীলাঞ্চিত গতিতে, ছায়া-লোক-বিচিত্র ধরণী-পৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া, উদ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয় —সে নদী যেমন কখন গিরি-সঙ্কট-মধ্যগতা—প্রখর—ফেনিল—আয়সবর্ণা ; কখন বীচি-বিক্ষোভ-সংক্ষুব্ধা—কখন বা অসীমকান্তার-মধ্যগতা—নিঃশব্দবাহিনী—কখন উপল-আস্তরণ মধ্যে বিস্তীর্ণ-দেহা—কখন ছায়া-বহুল—পত্রমর্ম্মরসঙ্কুল-বিটপশ্রেণী-পাদদেশে কলনাদিনী—আবার কখন তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণা—সেইরূপ রস্কিনের গদ্যরচনা বিচিত্রকলাসৌষ্ঠবে প্রস্ফুটশ্রী, বিবিধরসে আপ্লুতা। সে রচনা কোথাও সৌন্দর্য্যোপভোগ-পুলকে রোমাঞ্চিতদেহা, কোথাও ঘৃণায় কুঞ্চিতাননা, কখন বা আশীর্ব্বাদে কুসুমিতকলেবরা, কখন বা অভিশাপে অনলময়ী, কোথাও বা হর্ষে গদ্‌গদ্‌ভাষিণী, কোথাও ক্রোধে মেঘ-মন্দ্রিতা—ফলতঃ, সর্ব্বত্র প্রতিভার জ্বালাময় ফুৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতনা, জীবনের হিল্লোল ও কল্লোলে স্পন্দমানা, এবং মানব-হৃদয়ের শোণিমায় রক্তিম-বর্ণা।

আচার্য্যের রসগ্রাহী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, তাঁহার রচনার দুইটি বিভিন্ন যুগ আছে। প্রথম যুগ তাঁহার (Modern Painters) আধুনিক চিত্রকর সম্প্রদায় নামধেয় পুস্তকের ১ম

খণ্ড প্রকাশের সময় হইতে অর্থাৎ ১৮৪৩ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করেন, সে সকল সৌন্দর্য্য ও কলাশ্রীর অভিব্যক্তির নিয়মাদি নিরূপণ ও ব্যাখ্যান সম্বন্ধে রচিত। এবং ইহাদেরই ভিতর আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শক্তির পূর্ণবিকাশ ও চরম উৎকর্ষ দেখিতে পাই। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ২য় যুগ। নীতি, সমাজ, ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি ২য় যুগের রচনা। প্রথম যুগের গদ্যের বিশেষত্ব— ভাব ও ভাষার তীব্র-জ্বালাময়ী গতি ও উচ্ছ্বাসে—আবর্ত্ত ও উন্মাদনায়, কলাসৌন্দর্য্য-বিকাশে, ও নৈসর্গিক চিত্রাঙ্কণের মোহিনীতে। তাহার অন্তরে বাহিরে ভূমার ভাব। ভূমৈব সুখম্। সেই ভূমার সুখ প্রতি কথায়—প্রতি ছত্রে—প্রতি চিত্রে। সুদূর-প্রসারিত সূক্ষ্ম দৃষ্টি—অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার, রস-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া—কথার উপর কথার তরঙ্গ তুলিয়া—প্রতিভা-দৃপ্ত—বাক্য-বিভবে উন্মত্ত যুবালেখক ভাবপীড়িত, উপভোগ-বিহ্বল, উচ্ছল হৃদয়ের রুদ্ধ প্রকাশবেদনা উন্মাদিনী ভাষায় উন্মুক্ত করিয়াছেন। সুদীর্ঘ পদাবলী—দুইশত, চারিশত, কখনও বা তাহারও অধিক শব্দ-যোজনায় গ্রথিত। কিন্তু দীর্ঘ হইলেও সূত্রভ্রষ্ট নহে—আবর্ত্তিত হইলেও জটিল নহে। শব্দবহুল হইলেও প্রতি শব্দের পার্থক্য এবং সার্থকতা সুরক্ষিত এবং উপযুক্ত পাঠকের নিকট সুলভার্থ। কিন্তু মানবসংসারে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অনেক বিড়ম্বনা—ক্ষমতাশালী সুলেখকও সে বিড়ম্বনার

অতীত নহে। যাঁহার প্রচুর বাক্যসঙ্গতি আছে, সমালোচক অসঙ্কোচে তাঁহাকে বাক্যসর্ব্বস্ব বলিয়া বসিলেন। কত অক্ষম-পাঠকের হস্তে ফরাসী সাহিত্যে Victor Hugoকে এবং ইংরেজী সাহিত্যে Swinburneকে এই নিগ্রহ ভুগিতে হইয়াছে। আমাদেরও বঙ্গসাহিত্যে পাঠক কখন কখন লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, রবীন্দ্রনাথ যখন অনুপম বাক্য-ছটায় বর্ণবৈচিত্র্যে বসন্তের বিবিধ-কুসুম-সুষমাকে, ও অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে বসন্তের বিচিত্র কূজন-কাকলীমর্ম্মরকে লাঞ্ছিত করিয়া মানবহৃদয়ের নিভৃত আকাঙ্ক্ষাকে মুখরিত করিয়া তুলেন, তখন কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সেই অমর কবিতার গুঞ্জন ঝঙ্কারে কেবল কথারই লীলা-চাতুর্য্য দেখিতে পান।

রস্কিনের রচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা অনিবার্য্য—গদ্য কতদূর পদ্যের অনুসরণ করিবে। অনেক গদ্য আছে, যাহা পদ্যাকারে প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু মূলে—গদ্য এবং পদ্যের অভিব্যক্তি একেবারে পৃথক্। এ কথা স্মরণ রাখিলে রসাত্মক গদ্য লিখিতে গিয়া অক্ষম লেখক পদ্য লিখিয়া ফেলিবেন না। পদ্যপ্রকৃতিক বা পদ্যানুসারী গদ্য (poetical prose) ইংরেজী এবং বাঙ্গলাতে অনেকেই লিখিয়াছেন। কিন্তু কবিত্বময় এবং শ্রুতিমধুর হইলেও যে গদ্য নিজ প্রকৃতি এবং ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পদ্য-ছন্দের অনুকরণ করে এবং ভাবাতিসারের (sentimentalism) শূন্যগর্ভ ফুৎকারে ফাঁপিয়া উঠে, অচিরেই তাহার জীবন-বুদ্বুদ ফাটিয়া শূন্যে বিলীন হয়। গদ্যের ছন্দ পদ্যের ছন্দ

হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। Dickensএর গদ্যে অনেক স্থানে এই পদ্য-ছন্দের অযথা সমাবেশ আছে। তাঁহার Little Nellএর মৃত্যুবর্ণনায় পদ্য ছন্দের এত বাহুল্য যে তাহাকে সহজেই পদ্যাকারে লেখা যায়। রস্কিনেরও গদ্যে কচিৎ এ ত্রুটি দেখা যায়, কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে, গদ্য রচনায় রস্কিনের সমকক্ষ নাই। প্রবন্ধ শেষে, পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, ও আনন্দবিধানকল্পে, এবং সমাপ্তিরও মধুরত্বের জন্য রস্কিনের গদ্যের নমুনা স্বরূপ তাঁহার 'Modern Painters' গ্রন্থ হইতে সামান্য একটি অংশ উদ্ধৃত হইল :—

Gather a single blade of grass, and examine for a minute, quietly, its narrow sword-shaped strip of fluted green. Nothing, as it seems there, of notable goodness or beauty.. A very little strength, and a very little tallness, and a few delicate long lines meeting in a point,—not a perfect point neither, but blunt and unfinished, by no means a creditable or apparently much cared-for example of Nature's workmanship ; made, as it seems, only to be trodden on to-day, and tomorrow to be cast into the oven ; and a little pale and hollow stalk, feeble and flaccid, leading down to the dull brown fibres of roots. And yet, think of it well, and judge whether of all the gorgeous flowers that beam in summer air, and of all strong and goodly trees, pleasant to the eyes or good for food,—stately palm and pine, strong ash and oak,

scented citron, burdened vine,—there be any by man so deeply loved, by God so highly graced, as that narrow point of feeble green. It seems to me not to have been without a peculiar significance, that our Lord, when about to work the miracle which, of all that He showed, appears to have been felt by the multitude as the most impressive,—the miracle of the loaves,—commanded the people to sit down by companies "upon the green grass." * * Consider what we owe merely to the meadow grass, to the covering of the dark ground by that glorious enamel, by the companies of those soft, and countless, and peaceful spears. The fields ! Follow but forth for a little time the thoughts of all that we ought to recognise in those words. All spring and summer is in them,—the walks by silent, scented paths,—the rests in noonday heat,—the joy of herds and flocks,—the power of all shepherd life and meditation,—the life of sunlight upon the world, falling in emerald streaks, and failing in soft blue shadows, where else it would have struck upon the dark mould, or scorching dust,—pastures beside the pacing brooks,—soft banks and knolls of lowly hills,—thymy slopes of down overlooked by the blue line of lifted sea,—crisp lawns all dim with early dew, or smooth in evening warmth of barred sunshine, dinted by happy feet, and softening in their fall the sound of loving voices ; all these are summed in those simple words ; and these are not all. Go out,

in the spring-time, among the meadows that slope from the shores of the Swiss lakes to the roots of their lower mountains. There, mingled with the taller gentians and the white narcissus, the grass grows deep and free ; and as you follow the winding mountain paths, beneath arching boughs all veiled and dim with blossom,—paths that for ever droop and rise over the green banks and mounds sweeping down in scented undulation, steep to the blue water, studded here and there with new mown heaps, filling all the air with fainter sweetness,—look up towards the higher hills, where the waves of everlasting green roll silently into their long inlets among the shadows of the pines ; and we may, perhaps, at last know the meaning of those quiet words of the 147th Psalm, "He maketh grass to grow upon the mountains."

গীদে মোপাসাঁ

কেবলমাত্র সমালোচনা দ্বারা একজন অপরিচিত গ্রন্থ-কর্ত্তাকে পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত করা বড় কঠিন। গ্রন্থ-পাঠেই গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে যদি আবার সেই অপরিচিত গ্রন্থকার পাঠকের অপরিজ্ঞাত ভাষায় লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিচয় দেওয়া সমালোচকের পক্ষে কঠিন নয়—অসম্ভব। অনুবাদে আমাদের বিশ্বাস নাই। সত্য বটে, সাহিত্য-সংসারে দু একটি সুন্দর অনুবাদ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কাব্যসৌন্দর্য্য ভাষান্তরিত হইবার নহে—অনুবাদে তাহার মৌলিক গৌরব কোথায় চলিয়া যায়। পদ্যকাব্যের ত কথাই নাই—ভাবপ্রকাশে কবির প্রধান অবলম্বন ছন্দ, কিন্তু অনুবাদে ছন্দের মাধুরী একেবারে বিলুপ্ত হয়। Carey সাহেব দান্তের মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন—অতি উপাদেয় অনুবাদ, সাধারণ্যে তাহার বহুলপ্রচার। কিন্তু গোষ্পদে যদি সাগরের মহিমা অনুভূত হয়, তাহা হইলে ইংরেজ অনুবাদকের অমিত্রাক্ষর পয়ারেও ইতালীর কবিগুরুর অমর ছন্দের মহাসঙ্গীত শুনিতে পাইবে। পাঠক বলিতে পারেন, Carey সাহেব কবি নন—একজন প্রকৃত কবি যদি Divina Comediaর অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে ছন্দঃসৌন্দর্য্য বজায় থাকিত। কিন্তু কোন দুটি ভাষায় একই ছন্দ প্রচলিত থাকিলেও এক ভাষায় সে ছন্দ যেরূপ শুনাইবে, অপর ভাষায় তাহা কখনই

সেরূপ শুনাইতে পারে না। সাহিত্যানুরাগী পাঠক অবগত আছেন যে, Byron, Mrs. Browning, William Morris প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় শ্রেষ্ঠ কবিগণ দান্তের ছন্দের অনুকরণে সফল-মনোরথ হন নাই। এবং কতকগুলি ফরাসী ও ইংরেজী ছন্দের পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, Swinburneএর কবিতার যে ফরাসী অনুবাদ হইয়াছে, তাহা পদ্যে নয়, গদ্যে। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির বিশ্ববিজয়ী সঙ্গীতের গদ্যানুবাদ! হায় অনুবাদ!! এ দিকে Swinburne এত বড় একজন উচ্চদরের কবি হইলেও, গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার অলোকসামান্য পারদর্শিতা থাকিলেও, এবং গ্রীক্ ভাবে পূর্ণপ্রাণ হইলেও, তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, না অনুবাদে না অনুকরণে Saphor গীতিকাব্যের ঔদার্য্য, মহত্ত্ব এবং মাধুর্য্য ইংরেজী ছন্দে আনিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে কিন্তু আমাদের বিশেষ গৌরব আছে—বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে, অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির কয়েকটি কবিতার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন।* তাহাতে ছন্দের সুষমা, ভাবের মাধুর্য্য এবং পদের মহত্ত্ব, সকলই রক্ষিত হইয়াছে। কোন্‌টি অনুবাদ, কোন্‌টি মূল, তুমি বলিতে পারিবে না। যেন দুইখানি সমুজ্জ্বল মুকুরে একই সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে।

পদ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট গদ্যেরও রাগিণী আছে। "Prose has its cadences" সে রাগিণীও লেখকের ভাষার সহিত আজন্ম

---

* প্রভাত সঙ্গীতে "তারা ও আঁখি" এবং "সূর্য্য ও ফুল" দেখ।

মিশ্রিত। ভাব ও রস প্রকাশের জন্য তাহা ভাষারই সহিত, কেবল এক সঙ্গে নয়, একই অঙ্গে আবির্ভূত। তোমার অনুবাদ যদি ভাষান্তরমাত্র হয়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তুমি লেখকের রচনার অর্দ্ধাঙ্গমাত্র অনুবাদ করিলে। ইহা ছাড়া আর এক কথা এই,—প্রত্যেক ভাষাতেই এমন অনেক কথা দেখিতে পাইবে, যাহাদের স্বতন্ত্র প্রতিকৃতি—নিজস্ব চেহারা আছে। অপর ভাষায় তাহাদের প্রতিবাক্য কখনও তাহাদের সমগ্র অর্থ, তাহাদের সমস্ত প্রাণ যথাযথ প্রতিবিম্বিত করিতে পারে না। হয় ত কোন ভাষায় একটি আদরের কথার অন্তরালে ঈষৎ ব্যঙ্গের বঙ্কিম হাসি প্রচ্ছন্ন আছে। অপর ভাষায় তাহার প্রতিবাক্যে তুমি আদরটুকু পাইবে, ব্যঙ্গটুকু পাইবে না। কিন্তু বোধ হয় সেই ব্যঙ্গের রঙ্গতেই আদরের বেশী আদর। রচনার অর্দ্ধেক শ্রী—শব্দনির্ব্বাচনে—এক একটি কথার সহিত কত স্মৃতিই জড়িত। সেই জন্য প্রবীণ ফরাসী কবি Gautier একজন নবীন লেখককে পরামর্শচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি অভিধান পড়িয়া থাক ত? কথার যদি মূল্য এত অধিক হইল, এবং ভাষা হইতে ভাষান্তরে যদি সকল কথার অর্থসর্ব্বস্ব অক্ষুণ্ণ রাখা এক প্রকার অসাধ্য হয়, তাহা হইলে অনুবাদে আমাদের শ্রদ্ধার অভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু দেখিতেছি, আমরা প্রবন্ধের দ্বারদেশেই পাঠককে আবদ্ধ রাখিতেছি। আমরা আজি একজন খ্যাতনামা ফরাসী উপন্যাস-লেখকের সহিত পাঠকের পরিচয় করিয়া দিতে চাহি; কিন্তু

সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক ফরাসী ভাষায় অনভিজ্ঞ। আমরাও অনুবাদে বিশ্বাসহীন। সুতরাং কি করিয়া আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইব, ঠিক করিতে পারিতেছি না। সম্প্রতি গ্রন্থকারের মৃত্যু হইয়াছে, এবং সমস্ত সভ্য-জগতে তাঁহার কাব্যনিচয়ের সমালোচনা হইতেছে। আমরাও সমালোচনাচ্ছলে পাঠকদিগের সমীপে এই লেখকের বিশেষত্ব নিরূপণ করিতে চেষ্টা পাইব। সকল প্রথম শ্রেণীর লেখকদিগের ন্যায়, তাঁহারও বেশ সুন্দর এবং সুস্পষ্ট বিশেষত্ব ছিল।

আধুনিক ফরাসী লেখকদিগের মধ্যে Guy de Maupassant একজন অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রতিভাশালী। ছোট গল্প-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি বড় উপন্যাসও চারি পাঁচ খানি লিখিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে দুই একখানি সাহিত্য-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছে। কিন্তু Maupassantর অসাধারণ গুণপণা—ক্ষুদ্র গল্পরচনায়। তাঁহার উপন্যাসসমূহের মধ্যে এমন এক এক অধ্যায় আছে, যাহা সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর যে কোন উপন্যাসের সমান। তাহাদের ভিতর দুই একটি চরিত্রসৃজনও অতি চমৎকার। এবং ভাষা ও বর্ণনায় Maupassantর এমন একটু অসাধারণ বিশেষত্ব আছে, সৌন্দর্য্য উদ্ভাবনে তাঁহার এমন বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে যে, ফরাসী ভাষার প্রথম শ্রেণীর লেখকদিগকে তাঁহার কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়। কিন্তু তবুও তাঁহার উপন্যাসগুলি তাঁহার গল্পসমূহের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নয়। তাহাদের কোথায় একটু খুঁৎ—একটু অভাব আছে।

তাহারা বেশ সুগোল নয়। পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব তাহাদের নাই। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের ভিতর কেমন একটি ক্রমবিকাশ আছে, নৈসর্গিক সৃষ্টির ন্যায় তাহারা কেমন ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। একটির পর একটি ঘটনা নিতান্ত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্যভাবে সংযোজিত হইয়া কাব্যের অঙ্গসমূহকে পুষ্ট করিতে থাকে। Maupassantর উপন্যাসসমূহে এই মৌলিক নিয়ম লক্ষিত হয় না। তাহাদের ভিতর একটি সমগ্র ভাব পূর্ণস্ফূর্ত্তি পায় নাই, একটি পরিপুষ্ট জীবন গঠিত হয় নাই, ঘটনাসমূহের মধ্যেও নৈসর্গিক সংলগ্নতা নাই। তাহারা একজাতীয় হইলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যেটি আগে আছে, সেটি পরে যাইতে পারে, এবং যাহা পরে আছে, তাহা আগে যাইতে পারে, ইহাতে গ্রন্থের কিছু আসিয়া যায় না। এমন কি, অনেকগুলি ঘটনা একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। ইহাতে কি বুঝায়? ইহাতে বুঝায় যে, গ্রন্থের বন্ধনসকল অতিশিথিল। কোন পূর্ণাবয়ব পূর্ণপ্রাণ কাব্য হইতে যদি একটি সামান্য অংশ বিচ্ছিন্ন কর, দেখিবে, তাহাতে সমগ্রের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে।

Maupassantর দুই একখানি উপন্যাস লইয়া একথা আরও কিছু বিশদ করা যাক। ইহাঁর সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস Une vie "একটি জীবন"। ইহাতে একটি দুর্ভাগা স্ত্রীলোকের অসামান্য দুঃখের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। কেবলমাত্র তাহার শৈশবকাল মাতাপিতার স্নেহময় অঙ্কে সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু যেদিন জনকজননী তাহাকে তাহার স্বামীর হস্তে সমর্পণ

করিলেন, সেই দিন অবধি তাহার জীবন অন্ধকার হইয়া আসিল। বিবাহ উৎসবের কিছু দিন পরেই স্বামীর পিশাচ প্রকৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সদ্যোবিবাহিতা যুবতী স্বামী বর্ত্তমানে বিধবা হইল। কিছুদিন পরে স্নেহময়ী জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী নিজ কর্ম্মফলে কাহার দ্বারা হত হইল। অনন্তর পিতা মরিলেন। রহিল কেবল একমাত্র স্নেহের অবলম্বন একটি পুত্র। সে আবার বিকলবুদ্ধি হৃদয়-হীন জড়বৎ। তবু তাহাকেই কাছে পাইয়া মায়ের হৃদয় শান্ত। কিন্তু এ সুখটুকুও বিধাতার প্রাণে সহিল না। পুত্র অসৎসঙ্গে পড়িয়া ঋণদায়ে দেশত্যাগী। অভাগিনী মরিলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বিদেশে নীচজাতীয়া একটি স্ত্রীরত্নের সহিত পুত্ররত্নের শুভ বিবাহ হইয়াছে, এবং বধূ একটি কন্যা প্রসবের পর মরিয়াছেন। পৌত্রীকে কোলে পাইয়া অভাগিনী আবার মৃত্যুর দিক হইতে জীবনের দিকে মুখ ফিরাইল। এই সময়ে তাহার স্বগত উক্তিটি বড় স্বাভাবিক—"যাই বল, তুমি আমি যতটা ভাবি, এ জীবনটা তত সুখেরও নয়, তত দুঃখেরও নয়।" এইখানে Maupassant সত্যের সুন্দর শ্রী আঁকিয়াছেন। এ জগতে মরিতে চায় কে? তুমি কি প্রতিদিন দেখিতেছ না, কত লোক শাখাপল্লবহীন বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় জীবনমরুভূমিতে একা দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু একদিন একটু বসন্তের হিল্লোলে বা নববর্ষার বৃষ্টিসম্পাতে, তাহার দগ্ধ অঙ্গে কোথায় দুটি শ্যাম পল্লব দেখা দিল—অন্ততঃ তাহার পাদদেশে স্নিগ্ধশ্যামল নশ্বর শৈবালরাশি

অঙ্কুরিত হইল ? কিন্তু এই সকল ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোন নৈতিক সম্বন্ধ নাই। তাহারা কেবলমাত্র পরের পর ঘটিয়া যাইতেছে। ইচ্ছা করিলে আরও দু দশটা দুঃখময় ঘটনা যোজনা করা যাইতে পারে। তাহাদের ভিতর কোন সংঘর্ষের স্রোত, বেগ বা আবর্ত্ত নাই। ঘুরাইয়া পাকাইয়া তাহারা নায়িকার জীবনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে না, বা নায়িকার জীবন হইতে কোন অপূর্ব্ব অদম্য মানসিক শক্তি উদ্ভাবিত করিতেছে না। এক কথায়, ইহাতে বাহ্য এবং অন্তর্জগতের সংগ্রাম নাই—ঘাতপ্রতিঘাত নাই। কবি ইহার নাটকত্ব কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। এত দুঃখের চিত্রে পাঠকের হৃদয়ে করুণার তরঙ্গ উঠে না, চক্ষে এক বিন্দু অশ্রুর উদয় হয় না।

Maupassantর দ্বিতীয় উপন্যাস Bel-Ami—এমন নিষ্ঠুর ও লক্ষ্যহীন পুস্তক বোধ হয় জগতে আর একখানি নাই। ইহার নায়ক এক জন অতি অসার, অপ্রিয়, হৃদয়হীন নরাধম। গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, সে নিরুপায় দরিদ্র। পরে একের পর এক করিয়া তাহার প্রভু এবং সুহৃদ্‌বর্গের স্ত্রীসমূহের প্রেম অর্জ্জনে নিজের অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে না আছে ঘটনার বৈচিত্র্য, না আছে ক্রমাভিব্যক্তি। ইহার অগ্রও যাহা, পশ্চাতও তাহা। গ্রন্থের যে কোন স্থান আরম্ভ বা শেষ হইতে পারে। বাস্তবিক ইহাতে কিছুই আরম্ভ হয় নাই, কিছুই পরিণাম পায় নাই। আমরা নায়ককে প্রথম পরিচয়ে যেরূপ দেখি, বিদায়কালেও সেইরূপ দেখি। যদি পাপেরই জীবন

দেখাইবার গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল—এবং কাব্যের এমন সুন্দর ও উপাদেয় বিষয় আর কি হইতে পারে ?—তাহা হইলে তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। গ্রন্থের কোথায়ও পাপের প্রলোভন, তাহার আশু-মিষ্টতা, তাহার মায়াময়ী মরীচিকামূর্ত্তি—দেখিলাম না। অপর দিকে পাপের বিভীষিকা—তাহার বিষ-দংশনের সর্ব্বগ্রাসী পরিণাম—তাহার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের করুণ চিত্রও দেখিলাম না। Romola নামক উপন্যাসে George Eliot কেমন অসামান্য ধৈর্য্য এবং নৈপুণ্য সহকারে দেখাইয়াছেন, তুমি কি করিয়া, ধীরে ধীরে, তোমার অজ্ঞাতসারে একটি সামান্য ক্রটী হইতে আরম্ভ করিয়া পরে গভীর এবং গভীরতর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হও। অবনতির পিচ্ছিল এবং নিম্নাভিমুখ পথের কি সুন্দর চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু Maupassantর উপন্যাসে ইহার কিছুই নাই—সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠা গ্রন্থের ভিতর তোমাকে কাহারও দুঃখে দুঃখিত বা কাহারও সুখে উল্লসিত হইতে হয় না। এমন কেহ নাই, যাহার সুন্দর শ্রী দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হও—যাহার গুণে তুমি তাহাকে ভালবাসিতে পার। গ্রন্থের কোথাও দয়া দাক্ষিণ্য বা প্রেম নাই—মানবসুলভ ভ্রমপ্রমাদ বা দুর্ব্বলতা নাই—কোথাও শিশুর প্রফুল্ল মুখের হাসির আশীর্ব্বাদ নাই, এবং বৃদ্ধের স্নিগ্ধ দৃষ্টির অমূল্য প্রীতি-উপহার নাই। এমন একটি চরিত্র নাই যে, মনোরাজ্যে তোমার চিরসহচর হইতে পারে—যাহাকে তুমি জীবনের আপদবিপদে, সুখে দুঃখে স্মরণ করিতে পার। পাপেরও যে চিত্র আছে, তাহা বিশাল—আসুরিক বা

অমিত দুষ্কর্ম্ম অর্জ্জনে দর্পিত নয়। সে চরিত্রের কোথাও উদ্দাম সাহস বা অবিচলিত নির্ভীকতা দেখিলাম না। তাহাতে Don Juan বা Cenciর দানব প্রকৃতির কিছুই নাই। সকলই তুচ্ছ দীন ঘৃণ্য—ঘৃণ্য—ঘৃণ্য। গ্রন্থের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল ঘৃণার কুৎসিত নাসিকাকুঞ্চন। নায়ক ঘৃণ্য—অপর পাত্রপাত্রী ঘৃণ্য এবং যে সকল স্বৈরিণী তাহাদের অমূল্য স্ত্রী-সৌভাগ্য অবাধে বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহারা ঘৃণ্য হইতেও ঘৃণ্য।

কিন্তু এই উপন্যাসের ভাষা মোহমন্ত্র বিশেষ। Maupassantর কোন গ্রন্থেরই ভাষা এত সুন্দর নয়। তাহাতে আবার ইহার স্থানে স্থানে অতি মনোরম বিষয় সকলের অবতারণা আছে, এবং বর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায়। তাঁহার প্রথম উপন্যাসের এরূপ ভাষাসৌভাগ্য নাই। বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই গ্রন্থকার সেই দুঃখের চিত্রকে একটু শান্ত, একটু অনুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। শুনিতে পাই, ফরাসীরা Bel Amiর বড় ভক্ত। ভাষার গুণে, সুন্দর বর্ণনার জন্য, জ্ঞানগর্ভ উক্তিসমূহের জন্য, এবং জীবনের অপরূপ চিত্র অঙ্কনের জন্য, এই পুস্তক যে ফরাসীদের চির-আদরণীয় হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়।

Maupassantর একখানি উপন্যাস সকল দেশেই বিশেষ আদৃত হইয়াছে, এবং ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু এ খানি আকারে একটি বড় গল্পমাত্র, এবং বেশী বড়ও নহে। তাঁহার দুই একটি উৎকৃষ্ট গল্প L'heritage বা

Boule de Suif আয়তনে ইহা অপেক্ষা সমধিক ক্ষুদ্র নহে। তাহা ছাড়া যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি গল্প রচনা করেন, সেই প্রণালীতেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছোট গল্প লিখিতেই Maupassant সিদ্ধহস্ত। গল্পতেই তাঁহার বল।

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেই শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন। প্রথম হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে। কি গদ্যে—কি পদ্যে তাঁহার একটি অভিনব সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রথম গদ্য-প্রবন্ধে—তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার নবীন উন্মেষ পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিশোর-প্রতিভা প্রায়ই পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের পদানুসরণ করে। আমরা তাঁহার তরুণ কণ্ঠস্বরে পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই—ভাষা-গঠনে পরিচিত শব্দবিন্যাসপদ্ধতি দেখিতে পাই—এবং ছন্দরচনায় পূর্ব্বতন কবিদিগের শিল্পচাতুর্য্য অনুভব করি। বলেন্দ্র-নাথের ইহা কম প্রসংসার কথা নয় যে, প্রথম হইতেই তাঁহার রচনা-প্রণালী তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত—যখন যে কোন আধুনিক কবিতা পড়িবে তাহারই ভিতর অল্প বা অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাব,ভাষা বা ভঙ্গীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের—তাঁহার সেই শিক্ষা-গুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমি এমন বলিতেছি না যে বলেন্দ্রনাথের গদ্যে বা পদ্যে রবীন্দ্রনাথের
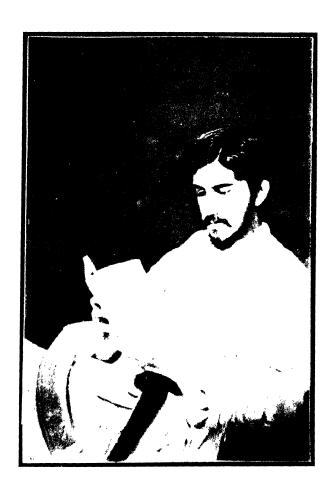
কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। পরবর্ত্তী লেখককে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্ব্বতন সম্পন্ন লেখকের নিকট কিছু না কিছু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইতেই হইবে। তবে যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেন্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। ফল কথা, তিনি জন্মকবি—আজন্ম রচনা-রসিক (stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজস্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। ইহার অর্থ নয় যে তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা অপরিণত বা অসম্পূর্ণ। ✓আমার বক্তব্য এই যে গদ্যের সকল পর্দ্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার পদ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয় কবির অন্তর্লীন ক্ষমতা এখনও সমস্ত বিকাশ পায় নাই এবং কালে এই সৌন্দর্য্য পরিসরে আরও বিস্তৃত হইবে—ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে—এবং ইহার ঝঙ্কার ও উন্মাদনা আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে। গদ্য এবং পদ্যের মৌলিক বিভিন্নতা কিন্তু এইরূপ ভাবিবার অপর কারণ। গদ্যের শক্তি ও উৎকর্ষের সীমা আছে—পদ্যের নাই। গদ্যে মানব-হৃদয়ের সমস্ত উচ্চতার 'নাগাল' পায় না—গভীরতার 'থৈ' পায় না—সৌন্দর্য্যের সমস্ত উচ্ছ্বাস,

ললিত-তরঙ্গ ধরিতে পারে না—জীবনের অসীম বিস্তৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্তু মিল ও ছন্দে—ঝঙ্কার, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায় —কমনীয়তায় ও নমনীয়তায় পদ্য জীবনের সমস্ত অনির্দ্দেশ পরিধি তাহার আলোকময়ী গতির চারু বিকম্পনে উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি ও প্রথম শ্রেণীর গদ্য-লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে পদ্যের পক্ষ ও চরণ দুই আছে—কিন্তু গদ্যের পক্ষ নাই কেবলমাত্র চরণ আছে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যপাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হই। পদ্যপাঠে আনন্দলাভ করিলেও, আরও উচ্চতর রচনার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

"ভারতী"তে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া গদ্যে বলেন্দ্রনাথ একখানি পুস্তক "চিত্র ও কাব্য" এবং পদ্যে "মাধবিকা" এবং "শ্রাবণী" নামে দুইখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন।

"চিত্র ও কাব্য" সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়িণী সমালোচনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রস-গ্রাহিতা শক্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—ততোধিক আশ্চর্য্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে। লেখার ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাঁচ নাই—পাণ্ডিত্য-প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চক্‌চকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য ও কলা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ তন্ময় হৃদয়ের বিভোরতা আছে। এই গ্রন্থে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির কাব্য-সমালোচনায় তাঁহাদিগের প্রতিভার স্বরূপ অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহীভাবে নির্ণীত হইয়াছে।

কাব্যোপভোগ-জনিত আনন্দের সহিত অমৃত-মিশ্রণে প্রোজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত অতি সহজ সরল যুক্তিসকল হৃদয়কে মধুর আকর্ষণে সত্য ও সৌন্দর্য্যের কনকমন্দিরে উপনীত করে। গ্রন্থের ভিতর কোথাও দেখিলাম না, মিথ্যা বাক্‌চাতুরীর জালে চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্যসকলের মর্য্যাদা লোপ করিয়া তাহাদের স্থানে উৎকট অভিনব মত স্থাপনের চেষ্টা—এবং রস ও সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রধান অন্তরায় কাব্য-কলার তত্ত্বোদ্ভাবন-রূপ হালের আমদানী রোগ এ সুস্থ লেখকের লেখায় স্থান পায় নাই।

জয়দেব সম্বন্ধে প্রবন্ধটি কাব্য-সমালোচনার আদর্শ। রসগ্রাহী লেখক জয়দেবের দোষ ও গুণের মর্ম্মস্থান দেখাইয়া দিয়াছেন। "গীতগোবিন্দ" যে প্রকৃত গীত—তাহার ভাব-দরিদ্র, বিরল-চিত্র পদাবলী কাব্যাংশে তেমন উপাদেয় না হইলেও তাহাদের কোমলকান্ত শব্দবিন্যাস এবং বিচিত্র ঝঙ্কার যে গানের সর্ব্বথা উপযুক্ত ইহা দেখাইয়া সন্দিহান পাঠককে জয়দেবের গানের প্রকৃত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন, এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন বিলাসকলাবর্ণনাপটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিভাত হয় নাই—কবিসুলভ স্বাভাবিক আত্মবিস্মৃতি তাঁহার কাব্যকে উজ্জ্বল পবিত্র করে নাই।

প্রবন্ধান্তরে ঐরূপই সুন্দর যুক্তি ও ভাষায় লেখক বুঝাইয়াছেন কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা প্রকৃতির মহান্ ও বিরাট্ রূপবর্ণনে কেন অকৃতকার্য্য, এবং ভবভূতিই বা কেন একটি "মেঘমন্দ্র সমাসে"—নিবিড় শব্দ-যোজনায় তাহাতে সিদ্ধহস্ত।

"চিত্র ও কাব্যে" আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা আছে—ললিত-কলার (Fine arts) আলোচনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিদ্যার তিরোধান হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিয়মবলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের রসাস্বাদনশক্তিও লোপ পাইয়াছে। আজকাল আবার রবিবর্ম্মা—ম্হাত্রে প্রভৃতির শিল্প-চাতুর্য্যে এই দীন দেশের পূর্ব্ব গৌরব জাগ্রত হইবার সূচনা দেখিতেছি। এই পুস্তকে এবং অন্যত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাহাদের নবীন প্রতিভার যথোচিত আদর করিয়াছেন।

"ভারতী"তে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাব-গৌরব ও রচনা-সৌন্দর্য্যে তাহারা বাঙ্গলা সাহিত্যে অতুলনীয়। সে গদ্য সকলকথা কহিতে জানে—সকলভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্র-নাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গলা গদ্যে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ সরল, ভদ্র গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় অলঙ্কারশূন্য—কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোথাও প্রচ্ছন্ন সরসীর ন্যায় স্বচ্ছ স্নিগ্ধ—কোথাও বৃক্ষবাটিকার ন্যায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র—এবং কোথাও নক্ষত্র-নিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল। "বসুমতী"র লেখক যে বলিয়াছেন, "বলেন্দ্র সুলেখক ;

—সুলেখকই নয়, অমন গদ্য লেখা বুঝি আর পড়ি নাই; তেমন শব্দ-লালিত্য, ভাবমাধুর্য্য, অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ," ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়।

বলেন্দ্রনাথের পদ্যগ্রন্থ দুইখানির একটি বিচিত্র আকর্ষণ—অপূর্ব্ব সম্মোহনী আছে।

ইহাদের মধ্যে যে কবিতাটিই পড়িবে তাহারই ভিতর শুনিতে পাইবে—এক নূতন কণ্ঠ—নূতন সুর। এরূপ কণ্ঠস্বর পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই। গদ্যে বলেন্দ্রনাথের সমীচীন প্রাধান্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহার মৌলিকতা পদ্যে—কবিতায়। এই সিদ্ধহস্ত গদ্য-লেখক, মূলে কবি। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের এক একটি কথা এক এক খানি চিত্র, তাহার অর্থই এই। গদ্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বল্প বা অধিক পরিমাণে তাঁহার কলম দোরস্ত করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু পদ্যে একা প্রকৃতি নিজেই তাঁহার শিক্ষক। এই সকল কবিতার বিষয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ইহাদের কবিত্ব ও কল্পনা নিতান্ত অন্তরের। গোলাপ বা পদ্মের সৌন্দর্য্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্তু বকুল বা কামিনীর মৃদুসৌরভ আছে। যাহাদের এই সকল কবিতা ভাল লাগিবে, তাহাদের বড়ই ভাল লাগিবে। ইহাদের মৃদুমদিরার ঘোর সহসা ছাড়ে না।

এই দুই পুস্তকে বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী "দিশে

দিশে গীতে গন্ধে” মুঞ্জরিত। বিরহে—মিলনে, অন্তরে—বাহিরে, শয়নগৃহে—নদীবক্ষে, প্রেমের সেই নিত্য নব বসন্তোৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা-ঘন-নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে—সকল বিলাস কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—

“একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি”

কালিদাসের “ঋতুসংহারে”র সহিত “মাধবিকা” ও “শ্রাবণীর” কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—কিন্তু “ঋতুসংহারে” বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। তাহার অনেক কবিতার ভিতরই একই ভাব—একই বিষয়, কেবল ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু এই দুই পুস্তকের প্রত্যেক কবিতারই প্রাধান্য আছে। তাহা ছাড়া “ঋতুসংহার” বাহ্যশোভা বর্ণনেই পরিপূর্ণ। এই দুই পুস্তকের কবিতা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অন্তরের। ইহাদের ভিতর একটি প্রেমমুগ্ধ হৃদয় জাগ্রত।

ইহাদের ভাষা ও ছন্দ সুন্দর ও পরিপাটী। প্রথম কবিতা-পুস্তকে এমন পাকা হাত প্রায়ই দেখা যায় না। স্বচ্ছ সরল ভাষার অন্তরে কল্পনার স্বর্ণ-রেণু চিক্ চিক্ করিতেছে।

প্রতিভার আর একটি মনোহর এবং প্রকৃত লক্ষণ বলেন্দ্রনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনায় বা মৌলিক রচনায় যখন

যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয় সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক, এবং প্রথম শ্রেণীর কলা-প্রবীণের স্বভাব-গত ধর্ম্ম।

সাহিত্যে এমন অনুরাগ এমন অপূর্ব্ব ক্ষমতার অকাল অবসানে বাঙ্গলা ভাষার, বিশেষতঃ অভিনব ও উপচীয়মান বাঙ্গলা গদ্যের যে সুমহান ক্ষতি হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

কিন্তু বলেন্দ্রনাথকে হারাইয়া শুধু যে বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নয়—বঙ্গদেশ একটি অকপট দেশবৎসল পুত্ররত্ন হারাইয়াছে। 'আর্য্য-সমাজ' ও 'ব্রাহ্ম-সমাজে'র মিলন চেষ্টার উপলক্ষে তিনি পঞ্জাববাসীদের যেরূপ হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন কালে তাহা এই দুই জাতিকে একটি সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে মিলিত করিত। কিন্তু সে আশা সূচনাতেই বিনষ্ট হইল।

এখানেও কিন্তু আমাদের ক্ষোভের শেষ নয়। এই সাহিত্য-কুশলী স্বজাতিবৎসল দেশহিতৈষীর চরিত্র যে কি উদার—কি অনির্ব্বচনীয়-মধুরতা-পূর্ণ ছিল, তাঁহার সহিত যিনিই আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য উপভোগ করিয়াছেন তিনিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, এমন বিনয় কোথাও দেখি নাই। এমন লোক নাই যিনি বলেন্দ্রনাথের মুখে কোন অপ্রিয় কথা শুনিয়াছেন বা তাঁহার সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় কথা বলিতে পারেন। গুরুজনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি—বন্ধুজনে অনাবিল স্নেহ—এবং সর্ব্বজনে প্রীতি ও বিনয় তাঁহার নিঃস্বার্থপর চরিত্রে জাজ্বল্যমান ছিল। কিন্তু হায়, সেই

উজ্জ্বল প্রতিভা—সেই গভীর দেশানুরাগ—সেই দেবোপম সুন্দর চরিত্র অনবসান যৌবনে সেই প্রিয়দর্শন পুরুষোচিত সৌম্য সুন্দর দেহের সহিত চিতার অগ্নিরাশির মধ্যে অবসান প্রাপ্ত হইয়াছে। দুরদৃষ্ট আমরা !

ফলিত জ্যোতিষ

আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা পূর্ব্বেকার হইতে কিয়ৎপরিমাণে অধিকতর হইতেছে। উভয় মহাদেশেই ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে একাধিক সাময়িক পত্র সুচারুরূপে চলিত। এবং সম্প্রতি যে সর্ব্বনাশকর যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহাতে জন-সাধারণের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে ফলিত জ্যোতিষের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়—এমন কি এই জ্ঞানগর্ব্বিত বিংশ শতাব্দীর একাধিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, আগেকার মত ইহাকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেছেন না। পুরাকালেও যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকমাত্রই ইহার বিরুদ্ধ ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ইহাতে বিশ্বাস-পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। Bacon, Kepler এবং Newton ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করিতেন।

আমাদের দেশ, প্রায় সকল বিদ্যারই যেমন, তেমনই ফলিত জ্যোতিষেরও জন্মস্থান। অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই ইহার চর্চ্চা ছিল। বেদে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহা ধ্রুববিদ্যা (Positive Science) বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমাদের আধুনিক শিক্ষাভিমানী-সম্প্রদায় ইহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং যাহারা ইহাতে বিশ্বাস-পরায়ণ বা আস্থাবান তাহাদের লইয়া রহস্য করিতে ছাড়েন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের দেশে ফলিত জ্যোতিষ ধ্রুববিদ্যা এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া আদৃত। আমাদের পণ্ডিতেরা বলেন :—

"চিকিৎসিত জ্যোতিষ তন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি।"

যখন ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে এই উচ্চ দাবী স্পষ্টতঃ পরিষ্কার ভাষায় করা হইয়াছে, তখন বিবাদীর পক্ষে ইহা বড়ই সুবিধার বিষয়। তাঁহারা এক কথায় দ্বন্দ্ব শেষ করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন তোমাদের দলিল দস্তাবেজ প্রমাণাদি উপস্থিত কর—পরীক্ষা করিয়া দেখি। তাহা হইলেই তর্কযুদ্ধ মীমাংসিত হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই প্রমাণাদির আলোচনা করিব। কিন্তু, তৎপূর্ব্বে দেখিব ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কেবলমাত্র যুক্তি কি বলে। ইহার a priori কোন ভিত্তি আছে কি না।

ফলিত জ্যোতিষ বলে, মানুষের জীবনের উপর দুইটি প্রভাব লক্ষিত হয়। (১) তাহার নিজের কর্ত্তৃত্ব—পুরুষকার, (২) অদৃষ্ট। এই দুই প্রভাবের অস্তিত্ব কেবল বিজ্ঞান-সম্মত নহে—সর্ব্ববাদি-সম্মত। নাস্তিক বা অজ্ঞলোকেরা যাহাকে luck বা কপাল বলে, এই অদৃষ্ট সর্ব্বতোভাবে না হউক, আংশিকরূপে অজ্ঞ বিজ্ঞ সকল লোকের দ্বারাই স্বীকৃত। তাহার ভিতর কর্ম্মফল, পরিবেষ্টনী (environment), luck প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানুষের কার্য্যকলাপ এবং চরিত্রগঠন সম্বন্ধে তাঁহার আত্মপ্রভাবকে অতিক্রম করিয়া বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট

অথবা মিলিত হইয়া দেশ, কাল, সমাজ, বংশ প্রভৃতি কার্য্য করে। তুমি দেশবিশেষে যেমন ভারতবর্ষে, কালবিশেষে যেমন আধুনিক কালে এবং বংশবিশেষে যেমন চণ্ডালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তুমি পরাধীন, স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত, নিরক্ষর, সমাজে উপেক্ষিত। তুমি কুষ্ঠীপিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন স্বাস্থ্য-সুখ পাও নাই এবং তজ্জনিত নানা অভাব এবং দুঃখে পীড়িত। অদৃশ্য কারণসঞ্জাত তোমার সেই সকল অবস্থার দরুণ তোমার জীবন বিশেষ বিশেষ ঘটনাসঙ্কুল, তোমার বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখ, তোমার চরিত্রে বিশেষ বিশেষ দোষ গুণ। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে জন্মিলে তোমার জীবনের ঘটনাসকল, সুখ দুঃখ, চরিত্রের বিকাশ বিভিন্ন প্রকারের হইত। কিন্তু দেশ কাল প্রভৃতি নির্ব্বাচনে মানুষের কোন কর্ত্তৃত্ব বা ক্ষমতা লক্ষিত হয় না। আমি কোন্ দেশ, কাল বা বংশে জন্মিব, তাহাতে আমার দৃশ্যতঃ কোন হাত নাই। সুতরাং জীবনের বহুল অংশই অদৃশ্য-প্রভাব বা অদৃষ্টের দ্বারা শাসিত এবং অন্ধকারে আবৃত। ফলিত জ্যোতিষ জীবনের সেই অন্ধকারের কিয়দংশে আলোক প্রদান করে। জ্যোতিষীরা বলেন, গ্রহনক্ষত্রাদি তোমার দেহ এবং মনের উপর শক্তি সঞ্চালন করে এবং দেখাইয়া দেয় তোমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিবে বা ঘটিতে পারে। জীবনের উপর বাহ্যপ্রভাবের মধ্যে সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রাদি অন্যতম। তাহারা মানব-জীবনের ঘটনাদি কতক অংশে পরিচালিত করে এবং পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দেশ বা জ্ঞাপন করে। জ্যোতিষীদের এই

সকল কথার মধ্যে একটিও প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত নহে। আমরা দেখিতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন ঋতু দেহ এবং মনের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে; বসন্ত ঋতু শুধু "তপঃ সমাধে প্রতিকূলবর্ত্তী" নহে।

> In the spring a fuller crimson comes
> upon the robin's breast,
> In the spring the wanton lapwing gets
> himself another crest,
> In the spring a livelier iris changes on
> the burnish'd dove,
> In the spring a young man's fancy
> lightly turns to thoughts of love

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রোগ উৎপাদিত হয়। "সূর্য্যাবর্ত্ত" (Sunstroke) প্রভৃতি রোগ সূর্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, গণ্ডরোগাদি চন্দ্র হইতে সঞ্জাত, ইহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। তবে জ্যোতিষীরা যখন বলেন হাম রোগ মঙ্গল-গ্রহ হইতে উৎপন্ন তখন তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে কেন? চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অনেক রোগই জড়িত; তাহা পাশ্চাত্য-অয়ুর্ব্বেদেও স্বীকৃত। ফলতঃ যতই আলোচনা করা যায় ততই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, চরাচর সৌরজগৎ একটী বৃহৎ পরিবার এবং সেই পরিবারভুক্ত পদার্থ-সমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ আছে—ঘাত প্রতিঘাত আছে।

"Star to star vibrates light"

"তারায় তারায় * * * ব্যথা গিয়া লাগে।"

"We are what suns and winds and
waters make us"

সুতরাং মানবজীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের যে প্রভাবের কথা জ্যোতিষীরা বলেন, তাহা নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত বা বিরোধী নহে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, ফলিত জ্যোতিষের পক্ষে পূর্ব্বযুক্তি অনুকূল।

এ স্থলে আমি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক বহুপূর্ব্বে লিখিত একটি প্রবন্ধের (প্রবাসী চৈত্র ১৩০৫) উল্লেখ করিব। ঐ প্রবন্ধে ত্রিবেদী মহাশয় সতর্ক, সন্দিহান, বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের হাসি হাসিয়া প্রচুর এবং সুলভ ব্যঙ্গের সহিত বলিয়াছেন অবিশ্বাসীরা যে প্রমাণ চান, বিশ্বাসীরা তাহা দেন না, তাহার বদলে বিস্তর যুক্তি দেন। কিন্তু প্রমাণের আসনে বসাইবার জন্য আমি যুক্তির কথা উত্থাপন করি নাই। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, প্রকৃতির নিয়মসকলের মধ্যে এমন অনেক নিয়ম আছে, যাহাদের সম্বন্ধে অনুকুল যুক্তি পাওয়া যায় না ; কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে ফলিত জ্যোতিষীরা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের এজেহার মতে অবিশ্বাসীদের যে দণ্ডপ্রয়োগ করেন, তাহাতেই শাস্তির অবসান হয় না—তোমার পৃষ্ঠ এবং উদরদেশ উভয়ই পীড়িত হয়। যুক্তির কথার উল্লেখের হেতু এই যে, অবিশ্বাসীদের বিজ্ঞ অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার অন্ততঃ কোন বৈজ্ঞানিক

কারণ নাই তাহা বিনীতভাবে দেখাইবার জন্য। পরন্তু রামেন্দ্রসুন্দরবাবু যুক্তিকে যতই হাসিয়া উড়াইয়া দিন, ফলিত জ্যোতিষ পদে পদে যে প্রত্যয় উৎপাদন করিবার দাবী করে, তিনি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ চান। অতএব আমরা সেই প্রমাণের যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

(১) জন্মকালে গ্রহসংস্থান দেখিয়া জ্যোতিষীরা জাতকের সাধারণ জীবন এবং প্রকৃতি নির্দ্দেশ করেন; অর্থাৎ জাতক কি প্রকার লোক, তাহার বুদ্ধি, ধর্ম্ম-ভাগ্য প্রভৃতি কিরূপ বলিয়া দেন। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও সন্তানাদির নির্দ্দেশ করেন। জীবনের বিপদ আপদ, সুখ দুঃখ বলিয়া দেন।

(২) গ্রহগণের রাশিচক্র পরিভ্রমণকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন দশায় জাতকের জীবনে কোন্ কোন্ সময়ে কি কি ঘটনা ঘটিবে, তাহা নিরূপণ করেন। বলা আবশ্যক এই ফলাফল-গণনা গণিত-জ্যোতিষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গণিত-জ্যোতিষ যে মুহূর্ত্ত, জাতকের জন্ম-মুহূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত করে, তাহা নির্ভুল হওয়া চাই—এবং সেই মুহূর্ত্তে গ্রহগণের আকাশের কোন্ অংশে স্থিতি—তাহার দ্রাঘিমা লঘিমা, ইত্যাদি অভ্রান্তরূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। গণিতে ভুল—গোড়ায় গলদ। তাহাতে ফলের তারতম্য হইবেই!

এখন আর সাধারণ কথা না কহিয়া—ব্যক্তিবিশেষের কোষ্ঠী আলোচনা করিব। এক দুই জনের কোষ্ঠী মিলিলে যে ফলিত-জ্যোতিষ ধ্রুব-বিজ্ঞান প্রমাণ হয় না—তাহা আমরা জানি।

বৈজ্ঞানিকপ্রবরদিগকে তাহা বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। কিন্তু এই প্রবন্ধে বহুলোকের কোষ্ঠী পরীক্ষা অসম্ভব। আমরা যদি কোন একখানি কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে পারি যে, তাহা জাতকের প্রকৃতি এবং জীবনের ঘটনাদির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিতেছে, তাহা হইলে অনুসন্ধানের পথ খুলিয়া দিয়া সত্য এবং প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করিব। তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

নিম্নে একটি জন্মকুণ্ডলী অর্থাৎ কোন জাতকের জন্মমুহূর্ত্তে গ্রহসংস্থানের চিত্র প্রদর্শিত হইল।
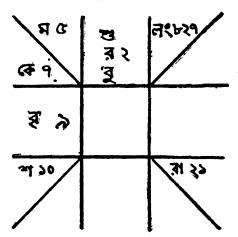
ইহা পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে পাঠকের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থ ফলিত-জ্যোতিষের কতকগুলি মূল-কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। আমরা ধরিয়া লইতেছি, জ্যোতিষশাস্ত্রে পাঠকের বর্ণপরিচয়

পর্য্যন্ত নাই। এই সকল কথা সামান্য ফলিত-জ্যোতিষের গ্রন্থে, এমন কি পাঁজিতেও আরও বিস্তৃতরূপে পাঠক দেখিতে পাইবেন।

উপরে যে চিত্র দর্শিত হইল, তাহা নভোমণ্ডলের চিত্র—আকাশের যে অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর উপরে দৃষ্ট হয় এবং যে অপরার্দ্ধ পৃথিবীর নিম্নে! চক্রটি ১২ অংশে বিভক্ত, এক একটী অংশকে মেষ বৃষ, ইত্যাদি দ্বাদশরাশি কহে। ঐ ১২ রাশি ১২টি মাসের অনুরূপ। অর্থাৎ মেষরাশি বলিলে বৈশাখ মাস বুঝায়—সূর্য্য ঐ মাসে মেষরাশিতে অবস্থান করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে; এবং এইরূপ ক্রমান্বয়ে। রবি প্রভৃতি নবগ্রহ ঐ রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে। ঐ এক-একটি রাশি আবার কোন গ্রহের গৃহ—অর্থাৎ সেই অংশে অবস্থান করিলে গ্রহের স্বকীয় বা স্বাভাবিক তেজ অক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশ পায়—সেই গ্রহকে সেই রাশির স্বামী বা অধিপতি বলে। কোন গ্রহের তুঙ্গস্থান সেই রাশিতে থাকিলে গ্রহের তেজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়,—কোন গ্রহের নীচাংশ, সেই রাশিতে থাকিলে সেই গ্রহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং কোন গ্রহের মিত্র বা শত্রু-গৃহ—সেই সেই গৃহে থাকিলে গ্রহের তেজের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। ইহা ফলিত জ্যোতিষের কল্পিত কথা নহে—নৈসর্গিক পর্য্যবেক্ষণের ফল। দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা সহজে বুঝা যাইবে। মেষরাশি সূর্য্যের তুঙ্গস্থান—অর্থাৎ মেষে অবস্থানকালে সূর্য্যের তেজ সর্ব্বোচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়; তাহা আমরা দেখিতে পাই। বৈশাখ মাসে সূর্য্য মেষরাশিতে থাকে এবং বৈশাখ মাসেই সূর্য্যের প্রচণ্ডতম তেজ। তুঙ্গরাশি হইতে ৭ম রাশি

গ্রহের নীচস্থান। মেষ হইতে ৭ম রাশি তুলা—তুলা সূর্য্যের নীচ স্থান, অর্থাৎ তুলায় অবস্থানকালে—কার্ত্তিক মাসে, সূর্য্য একেবারে নিস্তেজ নিষ্প্রভ। সিংহরাশি সূর্য্যের নিজ গৃহ—তাহাতে স্থিতি হইলে সূর্য্যের তেজ অক্ষুণ্ণ এবং খুব প্রবল থাকে। সিংহরাশির অনুরূপ মাস ভাদ্র মাস। ভাদ্র মাসে সূর্য্যের উত্তাপ অসহ্য। রবির শত্রু শনি—শনির গৃহ মকর এবং কুম্ভ—এই দুই রাশিতে সূর্য্য পৌষ ও মাঘ মাসে থাকে। এই দুই মাসে সূর্য্যের তেজ অপেক্ষাকৃত কম। সেইরূপ অন্যান্য গ্রহের দীপ্তি, ও তেজ নৈসর্গিক নিয়মের ভিত্তির উপর প্রত্যক্ষ-সংস্থিত।

আবার কতকগুলি গ্রহ শুভ—যথা বৃহস্পতি এবং শুক্র। কতকগুলি অশুভ—যথা মঙ্গল, শনি, রাহু। কতকগুলি শুভাশুভ অর্থাৎ বিশেষস্থলে বা শুভাশুভ গ্রহের সংযোগে অথবা অন্যান্য কারণে কখন শুভ, কখন অশুভ হয়। ঐ দ্বাদশ রাশিতে ফলিত জ্যোতিষের দ্বাদশ ভাব স্থিত, অর্থাৎ ঐ ১২ ঘরে জাতকের দেহ-মন, অর্থ, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, বন্ধু, প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। জাতক যে মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে, সে সময়ে যে রাশির পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, তাহাকে লগ্ন এবং যে রাশিতে চন্দ্র থাকে তাহাকে জাতকের রাশি বলে। ভাববিচার অতি দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে নানাদিক দেখিতে হয়—অসংখ্য অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া যাহা বিচারে নিরবশেষ থাকে, তাহা নিরাকরণ করিতে হয়। গুরুশিক্ষা, বিস্তৃত ও গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান ভূয়োদর্শন ত চাই—তাহার উপর বিচারশক্তির প্রাখর্য্য

আবশ্যক। বিচারকার্য্যে পরীক্ষকের নিজ শক্তির যোগ্যতা বা প্রচুরতার অভাব (want of personal equation) ভ্রান্তির প্রধান কারণ। তবে ভাববিচার সম্বন্ধে মোটামুটি এই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত নিয়ম অবলম্বন করিলে যদিও সম্পূর্ণ তথ্য স্থিরীকৃত না হয়, তবুও অনেকটা সত্য জানা যাইতে পারে। সেই নিয়ম এই ;—যে ভাব "সৌম্যস্বামী যুতেক্ষিত" সেই ভাবের পুষ্টি এবং তদ্বিপরীতে হানি। অর্থাৎ যে ভাব, তদাশ্রিত রাশির অধিপতি-গ্রহ কিম্বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তাহার ফল শুভ—অন্যথা বা তদ্বিপরীতে অশুভ।

এখন উপরের কোষ্ঠীবিচার করা যাক্।

এই জাতক যখন জন্মিয়াছিল, তখন পূর্ব্বাকাশে মীনরাশি উদীয়মান ; সুতরাং ইহার লগ্ন মীন। লগ্নে জাতকের আকৃতি, রূপ, স্বাস্থ্য, বল ও বংশ প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। এই প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোষ্ঠীবিচার হইতে পারে না এবং তাহাও আমাদের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নয়। তবে জাতক-জীবনে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহাই বলিব। এবং যে যে ভাব তাঁহাকে অপর সকল লোক হইতে বিশেষত্ব দিয়াছে তাহা দেখাইব। এক কথায় উদ্ধৃত কোষ্ঠী জাতক সম্বন্ধে কি বিশেষ ভাগ্য নির্দ্দেশ করে, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া ফলিত জ্যোতিষ যে ধ্রুববিদ্যা—উপন্যাস বা গালগল্প নহে, তাহা বুঝাইব।

জাতকের লগ্ন মীন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতির গৃহ। মীন-রাশি স্বচ্ছবর্ণ। সুতরাং জাতকের বর্ণ গৌর। সেখানে আবার

গ্রহদিগের মধ্যে যে দুটি গ্রহ গৌরবর্ণ, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি, তাহা-দের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। চন্দ্র মীনরাশিতেই অবস্থিত এবং স্বামীগ্রহ বৃহস্পতি লগ্নকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। তাহাতে বর্ণকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। রূপ এবং আকৃতি কান্ত, মনোহর এবং শোভন। স্বাস্থ্য এবং বলসম্বন্ধে ঐ কথাই খাটে। তিনি সুস্থদেহ এবং বলশালী। তাঁহার বংশ সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং উজ্জ্বল আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত। নৈসর্গিকতেজে সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময় গ্রহরাজ সূর্য্য, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শুভগ্রহ বৃহস্পতি, উভয়েই তুঙ্গী হইয়া জাতককে অপরদিক হইতে উচ্চবংশ গৌরব এবং সুস্থ সুন্দর দেহ, উন্নত মানসিক বৃত্তিসকল দিয়াছে। লগ্ন সম্বন্ধে জাতকের এই বিশেষত্ব।

২য় স্থান বা ধনসম্বন্ধে জাতকের এই অসামান্য সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। তবে জাতক ধনহীন নহেন। তিনি ধনী। তুঙ্গগ্রহ রবি দ্বিতীয়স্থ বলিয়া তাহাকে ধন দিয়াছে, কিন্তু ঐ রবি শত্রু ভাবের অধিপতি বলিয়া মাঝে মাঝে ধনের হানি হইয়া থাকে। ধনভাবস্থ বুধ ও শুক্র দুইটি সৌম্যগ্রহও তাঁহাকে ধন দিয়াছে, শুক্রগ্রহ উত্তরাধিকারীসূত্রে। কিন্তু তাহারা অস্তগত বলিয়া ধনের হানি করিয়াছে। পরন্তু ধনসম্বন্ধে জাতকের বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্র দ্বিতীয়স্থ থাকায় তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবলে ধন উপার্জ্জন হইবে।

৩য় বা ভ্রাতৃস্থান অশুভগ্রহ মঙ্গলযুক্ত এবং শনি কর্ত্তৃক পূর্ণ বীক্ষিত ; তজ্জন্য অনুজ না হইবার সম্ভাবনা,—হইলেও তাঁহার

মৃত্যু সম্ভাবিত ; অন্ততঃ জাতকের অব্যবহিত অগ্রজ এবং কনিষ্ঠের অমঙ্গল স্পষ্টতঃ সূচিত।

৪র্থ অর্থাৎ মাতৃস্থান কেতুযুক্ত। রাহু কর্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। স্বামী-গ্রহ বুধ অস্তগত এবং ষষ্ঠাধিপতি রবি এবং মরণাধিপতি শুক্র-যুক্ত সুতরাং জাতক অল্প বয়সেই মাতৃস্নেহ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। তাঁহার বন্ধুত্ব-সৌভাগ্যও স্থায়ী নয়। একাধিক বন্ধুর সহিত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বা অপ্রীতি ঘটিতে পারে।

৫ম স্থানে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়। "বুদ্ধি প্রবন্ধাত্মজ মন্ত্রবিদ্যা। মুনিঋষিগণ মানসপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের কল্পনা একই স্থানে করিয়াছেন। এই ভাবে জাতকের অসামান্য সৌভাগ্য। ৫ম স্থান কর্কটরাশি, সৌমগ্রহ চন্দ্রের গৃহ এবং চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত। সুতরাং ৫ম স্থান "সৌম্য স্বামী যুতেক্ষিত" বলিয়া জাতকের বিদ্যাবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কর্কটরাশি বৃহস্পতির তুঙ্গ বা সর্বোচ্চস্থান। সে কারণে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গরীয়সী। সেই বৃহস্পতি আবার লগ্নাধিপতি হইয়া পঞ্চমে অবস্থিত ; সুতরাং আজন্ম বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানচর্চ্চায় রত এবং তাহাতে অসীম এবং অসামান্য সৌভাগ্যশালী। এখনও শুভপ্রভাবের শেষ হয় নাই। পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র লগ্নগত। একেত' "লগ্ন-চাঁদা বেদ বাখানে", তাহাতে এস্থানে লগ্ন এবং পঞ্চম ভাবে বিনিময়। ইহা একটি অত্যন্ত দুর্ল্লভ এবং অমৃত-তুল্য যোগ। পঞ্চমভাবে এতগুলি শুভযোগ হাজার, দশহাজার বা লক্ষেও ঘটে না। জাতকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একটি

কথায় এবং কেবলমাত্র একটিমাত্র কথায় দেওয়া যাইতে পারে; তাহা প্রতিভা—অসাধারণ প্রতিভা। এবং লগ্নস্থ চন্দ্র তাঁহাকে সুন্দর এবং অনন্য সাধারণ কল্পনাশক্তি দিয়াছে।

৭ম অর্থাৎ জায়াভাবে তাদৃক্ সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। জায়াভাব গ্রহশূন্য—স্বামীদৃষ্টি বর্জ্জিত। এবং সৌম্য গ্রহদিগের মধ্যে কেবলমাত্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পাদ দৃষ্ট। যেমন জায়াভাব জায়াধিপতির দৃষ্টি রহিত—জায়াকারক গ্রহ শুক্রেরও দৃষ্টিরহিত। এবং জায়াধিপতি এবং জায়াকারক গ্রহ, উভয়েই অস্তগত। অধিকন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থানহেতু জায়া-হানি সূচিত। এবং শুক্র মরণাধিপতি হইয়া জায়াপতি বুধের সহিত যুক্ত। এই সকল প্রবল কারণে জাতক দাম্পত্যসুখ বহুদিন ভোগ করিতে পারেন নাই।

৯ম বা ভাগ্যস্থান উৎকৃষ্ট। স্বামীগ্রহ মঙ্গল এবং সৌম্যগ্রহ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। সুতরাং জাতক ভাগ্যবান। অধিকন্তু ভাগ্যস্থান সর্ব্বগ্রহ বীক্ষিত বলিয়া জাতকের ভাগ্যের পরম উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছে।

১০ম, কর্ম্ম এবং যশের স্থান। ইহার পরীক্ষা করিয়াই এই কোষ্ঠীর সাধারণ বিচার শেষ করিব। ১০ম স্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্র, ধনুরাশি এবং যদিও উহা স্বামীগ্রহের দৃষ্টি বঞ্চিত—কিন্তু অপর সমস্ত গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার কারণ শুভ-ফল-সূচক। পরন্তু ১০ম ভবননাথ বৃহস্পতি তুঙ্গী এবং ত্রিকোণস্থিত বলিয়া জাতক প্রসিদ্ধ "ক্ষেত্রসিংহাসন" যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে জাতকের বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ করিবার কথা। তবে সে স্থানে রাহু

অবস্থিত এবং বৃহস্পতির দৃষ্টি নাই বলিয়া সময়ে-সময়ে জাতকের অপযশ এবং অখ্যাতি ঘটে।

এই ১০ম স্থানে পিতৃ-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। জাতকের পিতা পরম ধার্ম্মিক উন্নত এবং সাধুচরিত্র। এবং যে যে কারণে মধ্যে মধ্যে জাতকের যশের হানি হয়, সেই সেই কারণে তাঁহার পিতারও সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং শারীরিক এবং মানসিক কষ্টও পান।

এখন উপরে দর্শিত কোষ্ঠীবিচারে জাতকের যে জীবন স্থিরীকৃত, চিত্রিত, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলে কি না? আমি বলি, অত্যাশ্চর্য্য রূপে মিলে এবং ফলিত জ্যোতিষে আমার বিশ্বাসস্থাপন করিবার নানা প্রমাণের মধ্যে ঐ কোষ্ঠী তাহাদের অন্যতম।

এক্ষণে পাঠকের স্বভাবতঃই কৌতূহল হইতেছে যে, ঐ কোষ্ঠী-কল্পিত পুরুষ কে? কে সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সুন্দর, উচ্চবংশজাত, আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভার কিরীট মণ্ডিত, বরেণ্য পিতার পুত্র এবং বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি?—তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐ পিতৃদত্ত অনুপম সুন্দর নামের পূর্ব্বে রাজদত্ত গৌরবের কুৎসিত উপসর্গ-অত্যাচার "Sir Doctor" বসাইতে লেখনী সরে না।

পরিশেষে যখন ব্যক্তি ব্যক্ত হইল, তখন পাঠক সহজেই কোষ্ঠীলিখিত নির্দ্দেশসকল জাতকের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

তিনি যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর পুরুষ, উচ্চবংশসম্ভূত,

আভিজাত্য-গৌরবে সমন্বিত, সমাজমান্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতার পুত্র, তাঁহার যে অসাধারণ প্রতিভা এবং বিশ্বব্যাপী যশ ও গৌরব, ইহা সকলেই জানেন এবং সে সকল কোষ্ঠীনির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং পরিমাণ হইতে তিলমাত্র কম নহে। অর্থ সম্বন্ধে ইহা সকলে অবগত আছেন যে, তিনি স্বীয় বিদ্যাবলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু এ কথা সকলে নাও জানিতে পারেন যে, সময়ে তাঁহার অর্থনাশ হইয়াছে।

তাঁহার অনুজ শৈশবেই মারা গিয়াছে এবং তাঁহার অব্যবহিত অগ্রজের শারীরিক এবং মানসিক নিরাময় নহে।

তিনি বালককালেই মাতৃহারা হইয়াছেন। এবং তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে একাধিক পরলোকগত হইয়াছেন এবং একাধিকের সহিত প্রীতির অসদ্ভাব হইবার কথা।

অসময়ে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে। অনেক সময়েই তাঁহার পিতা বিশেষরূপে পীড়িত হইয়াছিলেন, এমন কি স্থায়ী রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে কি কি শুভাশুভ কখন, কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা দশা, গোচর, বর্ষপ্রবেশ ইত্যাদি বিচারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহার জন্য সূক্ষ্ম গণনা ও বিচার আবশ্যক এবং তাহা সময় সাপেক্ষ। পাঠকদিগের কৌতূহল হইলে তাহা প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। কিন্তু উপরে কোষ্ঠীর যে সাধারণফল লিখিত হইল, তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিবেন, ফলিত জ্যোতিষকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর সঙ্গত।

সুলোচনা

আমার অনেক বন্ধু ছিল—অনেক বন্ধু অনেক রকমের। কিন্তু সকলেরই সহিত আমার সমান সদ্ভাব ছিল। সকলে আমায় ভালবাসিত আমি সকলকে ভাল বাসিতাম। কাহারও সহিত শ্মশ্রুপক্ক হইবার দশবৎসর পরে প্রণয়; কাহারও সহিত আমি বালককালাবধি খেলিয়া আসিয়াছি; পরস্পরের মায়ের বক্ষে পরস্পরে স্তনপান করিয়াছি; পরস্পরের মাকে পরস্পরে মা বলিয়া ডাকিয়াছি; পরস্পরের মায়ের আদর পরস্পরে পাইয়াছি; পরস্পরের মাতার চুম্বনে পরস্পরের কপোল পবিত্র এবং প্রফুল্ল হইয়াছে। আবার কাহার সহিত বৃদ্ধবয়সে দাবাবড়ে টিপিতে টিপিতে আলাপ, গুড়ুক্ ফুঁকিতে ফুঁকিতে আলাপ, মাঘমাসে গঙ্গাস্নান কালে "শীতটা এবার বড় পড়িয়াছে মহাশয়" বলিতে বলিতে কাহার সহিত সখ্যভাবে বদ্ধ হইয়াছি অথবা গ্রীষ্মকালে পোড়া দেবতাকে গালি দিতে দিতে চিত্ত বিনিময় করিয়াছি।—

এইরূপ অনেকের সহিত আলাপ হইয়াছিল। অনেকেই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্মৃতি এবং চিন্তা এক এক সময়ে কতই মধুর! আর তোমরা যে গল্প শুনিবার নিমিত্ত আমাকে ঘেরিয়া বসিয়াছ তাহার স্মৃতি! তাহা থাক্—শোন গল্প বলি। কপোলে তোমাদের ঈষৎ হাসি—নয়নে তোমাদের আলোক—গলে তোমাদের পুষ্পমালা—তোমাদের গল্প বলিতেছি শোন।

প্রথম হইতেই আরম্ভ করি—শৈশব হইতে। আহা, সেই মধুর বালককাল!—স্মৃতির আকাশপটে সেই মধুর তারকা! বর্ত্তমান হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু স্মৃতিপটে তেমনি শোভন—তেমনি উজ্জ্বল—তেমনি মধুর! তদপেক্ষা শোভন—তদপেক্ষা উজ্জ্বল—তদপেক্ষা মধুর! হারাণ মাণিক—যখন ছিল তখন ছিল বলিয়া আদর পায় নাই। মৃত বন্ধু!—কে তাহার দোষ স্মরণ করিবে? শৈশব সময় স্মরণ করিতেছি। রাজদণ্ডে চিরনির্ব্বাসিত ব্যক্তি—বিদেশে, বিভূমে, বিভাষীলোকমণ্ডলী মধ্যে—যেমন স্বদেশ স্মরণ করে—সেই নীল আকাশ স্বচ্ছসলীল সংসার কাননে প্রেম-মলয়ে দোদুল্যমানা স্নেহময়ী ভার্য্যা—পুত্রকন্যাদিগকে যেমন স্মরণ করে এবং শিহরিয়া উঠে (পাপী, সেই সকল পদার্থে তাহার আর কি অধিকার? সাবধান চিন্তাও যেন তাহাদের কলুষিত না করে) সেইরূপ আমি স্মরণ করিতেছি। বাইবেলে বলে ঈশ্বর সৃষ্টিকালে আদিপুরুষকে সুরম্য উদ্যান মধ্যে স্থাপনা করিয়াছিলেন। সে উদ্যানে অভাব নাই—সে উদ্যানে ক্লেশ নাই! এই কথার গভীর মর্ম্ম—সকলেই আমরা সেই উদ্যানে স্থাপিত হইয়াছিলাম, সকলেই সেই সুখসদন হারাইয়াছি। শৈশবকাল—ইদন কানন! সে উদ্যানে অভাব নাই—সে উদ্যানে ক্লেশ নাই। এখন আমার লোলিতমাংস, পলিতকেশ, সেই চঞ্চল ক্রীড়াশীল বালককে স্মরণ করিতেছে। আমার পাপকলুষিত মন সেই সরল সহাস বালকাত্মার ধ্যান করিতেছে। লবণাক্ত সাগর-গর্ভে নিমগ্না নদী সেই পর্ব্বতবিহারিণী নির্ঝরিণীকে গভীর কল্লোলে

ডাকিতেছে। কিন্তু সেই পর্ব্বতবিহারিণী নির্ঝরিণী পর্ব্বতবিহারী পবন সনে খেলিতেছে ; মৃদুস্ফুট স্বরে গান গাহিতেছে, তীরস্থ প্রসূনমালে শ্যামকেশ বিনাইয়া নাচিতেছে, ভানুকিরণে ঈষৎ হাসিতেছে। সমুদ্র-কন্দর হইতে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া নদী ডাকিতেছে। নির্ঝরিণী খেলিতেছে, নাচিতেছে, মালা পরিতে পরিতে গাহিতেছে। হায় বালককাল, তোমাকে আর পাইব না। তবে স্মৃতি সতি, কাল-নদীতীরে তোমার রাঙা চরণ স্রোতে অবগাহন করিয়া তরুণারুণাভ করপল্লবে বংশী ধরিয়া মধুর অধরে মধুর ধ্বনি কর ত। মধুর নাদে মধুর শৈশবকালকে ডাক ত। মধুর রবে কে আসিল ?—মধুর রবে, শৈশব মধুরিমা

সুলোচনা !

তখন আমার বয়স পাঁচ কিম্বা ছয় বৎসর ; রথের দিন, মামার বাড়ী গিয়াছিলাম। একখানি লালপেড়ে কোর-মাখান কাপড় পরিয়া পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। ছোট হাতে একটা বড় ভেঁপু, অপর হাতে সন্দেশ কি আর কি ছিল স্মরণ হয় না। এই মাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। গাছের ভিজাপাতাগুলি সূর্য্যের আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আর্দ্র পল্লব হইতে রামধনুক কাটিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে। নীল আকাশখানি—দিগন্তে শাদা মেঘগুলি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বর্ষাবারিনিষিক্ত পৃথিবীর হৃদয় হইতে আনন্দ বাষ্প উঠিতেছে। আমি সেই স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া আছি। পুকুরের

জলে নীল আকাশ কেমন হাসিতেছে। ওমা জলের ভিতর ও গুলি কি! পায়ের কাছে দুই একটা বেঙ থপ থপ করিয়া লাফাইতেছে। নিকটে দুই একটা গেঁড়ি সিং বাহির করিয়া আস্তে আস্তে চলিতেছে সম্মুখে ফড়িং প্রজাপতি উড়িতেছে। আমি ছোট হাতে একটা বড় ভেঁপু ধরিয়া গাল ফুলাইয়া বাজাইতেছি। ধীরে তখন বাতাস বহিতেছে; ধীরে তখন পুকুরের জল নড়িতেছে; ধীরে তখন লোক কোলাহল কানে আসিতেছে। আমি তখন সব ভুলিয়া গিয়াছি—কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ঠাকুরমাকে যে বলিয়া আসিয়াছিলাম তোমাদের বাড়িতে আর আসিব না তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। আমি কেবল সেই ফড়িং প্রজাপতি দেখিতেছি। আমি কেবল সেই পুকুর, গাছ, লতা, পাতা দেখিতেছি। আমি কেবল সেই প্রাসাদ-বিরহিত-হরিদ্বর্ণ-ভূমি-পরিসর দেখিতেছি।

তখন সে ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়িগুলিতে নামিতেছে। আমি প্রায় যেখানে জল সেইখানে দাঁড়াইয়া আছি। সে দুটি সিঁড়ি উপরে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি তাহাকে চিনি না—সে আমাকে চিনে না। বাম হস্তে তাহার একটি নূতন রংচঙ্গে কাঠের পুতুল—দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ কর্ণের উপরিস্থ কেশে আবদ্ধ। কপোলে শিশু যেমন শিশু দেখিয়া হাসে সেই হাসি। দুটি সিঁড়ি উপরে দাঁড়াইয়া—ডাগর নয়ন দুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। আমি ছোট হাতে বড় ভেঁপু ধরিয়া গাল ফুলাইয়া বাজাইতেছি।

সেই সুলোচনা !

নিকটে একটা বড় প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিল, আমি ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। সুলোচনাও দৌড়িল। প্রজাপতি পুকুরের এধার ওধার করিয়া উড়িতে লাগিল। আমি সর্ব্বত্র ভয়ে যাইতে পারিলাম না। সুলোচনা এ গাছটি সরাইয়া, ও গাছটি নাড়িয়া, বেড়ার মধ্যদিয়া গলিয়া, ঝোপের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া প্রজাপতিটি ধরিয়া আনিয়া আমাকে দিল।

পরণে একখানি ডুড়ে শাড়ী ; হাতে দুগাছি সোনার বালা ; পায়ে ছোট ছোট দুগাছি মল ; নাকে একটি জ্বলজ্বলে নোলক দুল্‌দুল্‌ করিতেছে। আসিয়া আমাকে বলিল "এই ধরিয়াছি—প্রজাপতি নাও"। "পদ্মপুকুরে আরো ভাল অনেক প্রজাপতি আছে—ফড়িং আছে চল ধরিগে"। পদ্মপুকুরে গিয়া কত প্রজাপতি কত ফড়িং কত বিবিধ বর্ণের কীট পতঙ্গাদি দেখিলাম ; কত পদ্মের ফোঁপল খাইলাম। কত দোয়েল পাপিয়ার মিঠা গান শুনিলাম। "সু" আমাকে কত ফুল তুলিয়া দিল।

অয়ি বর্ষা-সমাগম-প্রফুল্ল-হৃদয়া বনদেবি, তোমার অঙ্কে আর এমন দুটি আনন্দ বিহ্বল-চিত্ত ছিল না। তোমার কলকণ্ঠ পক্ষিদিগের মধ্যে কোন দুইটি এমন আনন্দধ্বনি বিদীর্ণ করে নাই। তোমার কপোলে এমন দুটি সুরভি বারিবিন্দু ছিল না যাহারা পরস্পরে আমাদের সরল হৃদয় দুটির মত এমন তরল ভাবে মিলিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সুলোচনা আমার সঙ্গে। রাত্রি হইল সুলোচনাকে বাড়ী যাইতে দিব না। "সু"র মা ছিল না। "সু" জন্মিবার দুই তিন মাস পরে তাহার মা মরিয়া যায় এবং সেই অবধি তাহার ঠাকুরমাই তাহাকে মানুষ করিয়া আসিতেছে। তাহারা আমার মামাদের কাছাকাছি জ্ঞাতি, এবং রথোপলক্ষে আমার মামার বাড়ী আসিয়াছিল। আমার কান্না দেখিয়া সুলোচনার ঠাকুরমা তাহাকে আমার মার কাছে রাখিয়া গেল। "সু" রহিল। আমরা একত্র শয়ন করিলাম, কত গল্পই "সু" জানে! তাহাদের বাড়ীর কত কথাই বলিতে লাগিল! তাহাদের পুকুর আছে, গরু আছে, হাঁস আছে, বাবুয়ের বাসা, বাবুই আছে। আমি সেই সকল শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে "সু"র সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যাইলাম। সেইখানে সমস্ত দিন রহিলাম এবং তাহার খেলেনা, পুতুল, পাখী সব দেখিলাম। সন্ধ্যাকালে আবার তাহাকে সঙ্গে লইয়া মামার বাড়ী আসিলাম। তারপর একদিন অপরাহ্নে "সু"র গান ও গল্প শুনিতে শুনিতে বেলা থাকিতে থাকিতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম মামার বাড়ীর সেই সুমন্দ পবনবাহিত মশারি-বিহীন রম্য শয়ন নাই। আবদ্ধগৃহমধ্যে সংকীর্ণ শয্যায় শুইয়া রহিয়াছি; আর সুলোচনার মধুর আলাপের পরিবর্ত্তে হারু গুরুমহাশয়ের শুষ্ককণ্ঠের কঠোর সম্ভাষণ শুনিতেছি। হায় দীর্ঘজীবনে কতবারই না এরূপ নিদ্রাভঙ্গে কত কি হারাইয়াছি।

দিন যায়; বর্ষের পর বর্ষ আসে—রথের পর রথ আসিল।

আমাদের দুইটি হৃদয় আবার সেই আকাশতলে—সেই মনোহর বিপিনে—সেই বর্ষাবারি-প্রফুল্ল দুইটি কদম্বপুষ্পের মত ফুটিতে লাগিল।

মলিন সন্ধ্যার তারাগুলি মলিন। রাত্রি যত বাড়িতে থাকে তাহাদের দীপ্তিও সমুজ্জ্বল হয়। প্রতিপদের মলিন চন্দ্রমা, কলার পর কলা লইয়া গগন-প্রাঙ্গণ কিরণে প্লাবিত করে। আমাদেরও দুটি শিশু হৃদয় দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল, এখন পরস্পরের প্রীতি সাধন করিতে পরস্পরের কতই না উৎসুক। ওগো তোমাদের সুখের ধারা বুঝি ভালবাসিবার নিমিত্তই গঠিত হইয়াছিল। তোমাদের এই প্রীতি-প্রফুল্ল কুসুমিত ভূঅঙ্ক বুঝি শিশুদিগের খেলিবারই প্রাঙ্গণ। পল্লিগ্রামে স্বভাবের কি মধুর উচ্ছ্বাস! তরুরাজির কেমন বিচিত্র শ্যামল শোভা! তাহাতে কমনীয় সুরভি কুসুমকান্তি! কেমন কলকণ্ঠ বিহগ সম্প্রদায়! কেমন সুরচিত কুলায়শ্রেণী! সে সকলি কলিকাতায় আমার বাটীতে কেন?

নগরে কেমন বিবিধ চারু শিল্পীনির্ম্মিত মনোহারী পদার্থনিচয়! কেমন সুচিত্রিত সুন্দর-কল্পনা-গ্রথিত পুস্তক সমূহ! কেমন সুকবির, হৃদয়োন্মাদক কাব্যোচ্ছ্বাস, সে সকল সুলোচনার ক্ষুদ্র কুটীরে কেন?

এখন যে কেবল রথোপলক্ষেই আমাদিগের সন্দর্শন তাহা নহে। নিদাঘ সায়াহ্নে তটিনী-বক্ষে নৌক্রীড়া কেমন! শীতকালে প্রদোষ বা প্রভাতে ঘোটকারোহণে ভ্রমণ কেমন স্বাস্থ্যকর!

বর্ষাকালে স্কুল পালাইয়া ভিজিতে ভিজিতে পাটীগণিতখানি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়া গাছে গাছে নীড়ান্বেষণ কেমন! আর মধ্যাহ্ন সময়ে পল্লব-বহুল বৃক্ষতলে শয়ান থাকিয়া সুলোচনার মুখ হইতে বিদ্যাপতির কান্তপদাবলি শ্রবণ বড়ই মধুর! কখন দেখি সুলোচনা কোন বালিকার কেশ রচনা করিয়া দিতেছে; কখন দেখি কোন বৃক্ষের ডালপালা কাটিয়া দিতেছে; কখন দেখি বৃদ্ধ পিতামহীর কাছে বসিয়া রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিতেছে; কখন বা কোন দুঃখীর সন্তানকে খাদ্য বা বস্ত্র দিতেছে। ফলতঃ সর্ব্ব সময়েই সেই প্রীতিময় সরল স্বচ্ছভাব। সীতাদেবী ভূগর্ভ হইতে উঠিয়াছিলেন, আমার সুলোচনাকে বোধ হয় কোন লাবণ্যময়ী তরল-প্রাণা শিশির-বিধৌতা উষা কোনদিন একটি বৃক্ষতলে প্রসব করিয়া গিয়াছিল।

দিন যায়, বর্ষার পর বর্ষা আসে। প্রতিবৎসরই রথ হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই কেবল রথ দেখা চলে না। তোমার দুঃখের পৃথিবীতে পীড়া আছে, মৃত্যু আছে, পাঠশালা-রাক্ষসী আছে, পরীক্ষা আছে, আর প্রবাস আছে।

জ্যামিতি পড়িতে পড়িতে কি, সুলোচনে, তোমাকে স্মরণ করিতাম? পুস্তকের শিরোভাগে ও পদদেশে এই সব বৃক্ষলতার চিত্রদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিয়া দিবে। বিদেশে পড়িবার সময় উত্তরোত্তর দুইবার কেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই, জিজ্ঞাসা কর জানিতে পারিবে।

দিন যায়—সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসে, মাসের পর মাস।

কত সপ্তাহ!—কত মাস! বর্ষের পর বর্ষ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল। কত বর্ষ!

আজি কত বৎসর পরে আবার সেই পুকুরের ঘাটে বসিয়া আছি। চারিদিকে আবার সেই পূর্ব্বকার প্রাবৃট শোভা! নীল জলে আবার সেই নীল-আকাশ-আর্দ্র রৌদ্রে আবার সেই কীট পতঙ্গাদির কোলাহল। ধীরে আবার সেই বাতাস বহিতেছে। ধীরে আবার পুকুরের জল কাঁপিতেছে, ধীরে আবার জন কোলাহল কানে আসিতেছে। মানব-হৃদয় কে বুঝিতে পারে? প্রকৃতির মহিমা কে কবে জানিয়াছে? কত বৎসর পরে আমি আবার সেই সুপরিচিত পুষ্করিণী-তীরে। নয়নে অশ্রুজল কেন? ধীরে ধীরে হৃদয়ের কোন স্থান হইতে বলিতে পারি না অশ্রুরাশি উত্থিত হইয়া গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতেছে। সে ত শোকের অশ্রু নয়। সে ত বিরহ সন্তাপের অশ্রু নয়। জানিনা হৃদয়ের কোন নিভৃত স্থান হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুরাশি উঠিয়া আমার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে।

সোপানে বসিয়া কাঁদিতেছি। ধীরে একটি ক্ষুদ্র বালিকা পুকুরে নামিতেছে। হরিণ শিশুর মত চকিত দৃষ্টি। কুসুম-কল্প-দেহলতা। দাও না, আমাকে একটি ভেঁপু দাও না, গাল ফুলাইয়া বাজাই।

"একি 'সু' কি মন্ত্রবলে তুমি আবার সেই শিশু হইয়াছ"?

পশ্চাদ্ভাগে—অতি নিকটে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম একটি শীর্ণকায়া বৃদ্ধা আস্তে

আস্তে ঘাটে নামিতেছে। চিনিলাম ঠাকুর-মা—তাহার ঠাকুর-মা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সু" কোথায় ? শুনিলাম ;

"'সু'র যা কিছু আছে বাবা, ওই মেয়েটি। আয় মা জলের ধারে যাস্‌নে পড়ে যাবি।"

ওগো তোমাদের ক্রূর পৃথিবীতে বাল্য-বিবাহ আছে—মাদক-সেবন আছে—স্বার্থপরতা আছে—স্বেচ্ছাচারিতা আছে। তোমাদের পৃথিবীতে রমণীর আদর নাই। সৌন্দর্য্যের পূজা নাই। ভালবাসা নাই। ভালবাসিবার নিমিত্ত এ পৃথিবী গঠিত হয় নাই।

তারপর রৌদ্র বৃষ্টি লইয়া—ছায়া আলোক লইয়া—হর্ষ বিষাদ লইয়া এ জীবন কত দূর কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখন আবার শৈশব জীবনের সেই সুদূর অভিনয়টি স্মরণে আমার হৃদয় যে বিকল হইয়া যাইতেছে। সেই আবেগ—সে উন্মত্ততা—সেই দুঃখস্রোত আবার আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। স্মৃতির উজান ঠেলিয়া যে আর ফিরিতে পারিতেছি না। সংসারকে যে আর প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছি না। যাই আমি—আমি বৃদ্ধ, লোল মাংস, পলিত কেশ। আমি যাই—আমাকে ছাড়িয়া দাও।

স্বপ্ন-প্রয়াণ

স্বপ্ন-প্রয়াণ নূতন কাব্য নয়—নিত্য-নূতন, যাহা কখনও পুরাতন হয় না। "A thing of beauty is a joy for ever!" ইহার ১ম সর্গ ১২৮০ সালে ২য় বৎসরের বঙ্গ-দর্শনে রচয়িতার নাম বিনা বাহির হয়। কাব্যামোদী পাঠকমাত্রই, বোধ হয়, এই অভিনব কাব্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন মৌলিকতা দেখিয়া নূতন কবির পরিচয় পাইবার জন্য আমার মত উৎসুক হইয়াছিল। পরে ১৭৯৭ শকে—অর্থাৎ আজ ৪০ বৎসর হইল সম্পূর্ণ কাব্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এইখানে পাঠকের বিরক্তিকর এবং ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইলেও, সমালোচনার মুখবন্ধ-স্বরূপ ঐ নব-প্রকাশিত কাব্য সম্বন্ধে আমার নিজের একটি স্মৃতির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যখনই স্বপ্ন-প্রয়াণের কথা উঠে, তখনই অবিচ্ছেদ্যবন্ধনে সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়! প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই আমার বিশেষ সৌভাগ্যবলে একখানি পুস্তক নিতান্ত অসম্ভাবিত স্থানে আমার বিস্মিত লোলুপ নয়নকে আকৃষ্ট করে। মানস-সরোবরের তীরে নয়—বটতলার একটি সঙ্কীর্ণগৃহ দোকানে। অসম্ভাবিত কেনই বা বলি? সেদিনকার সময়ে কলিকাতার সারস্বত মন্দির বটতলায়ই ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের অক্ষয়কীর্ত্তি গোত্রপতিগণের সাক্ষাৎ তখন এই বটবৃক্ষের ছায়াতলেই লাভ করা যাইত!

গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়—সুলভ মূল্যে পুরাণাদি শাস্ত্রের বহুল প্রচারের জন্য পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে ভক্তি-প্রণোদিতচিত্তে এই যুগের বেদব্যাসের আসনে বসাইয়াছেন। বটতলার একজন খ্যাতনামা প্রধান পুস্তক-প্রকাশক এবং বিক্রেতা ৺নৃত্যলাল শীল বঙ্গ-সাহিত্যে বেদব্যাসানুরূপ যশের পাত্র না হউন, তাঁহার কিঞ্চিৎ নিম্নের আসন পাইতে পারেন। তাঁহার কল্যাণে আমরা কাশীরাম দাস—কৃত্তিবাস—মুকুন্দরাম—ভারতচন্দ্র—বৈষ্ণবকবিগণ প্রভৃতির পুস্তকসকল সেকালে দেখিতে পাইতাম। সেই সকল বঙ্গীয় সাহিত্য-গুরুদের অমূল্য-গ্রন্থসমূহ, দেশী বিবর্ণ কাগজে ভাঙ্গা অক্ষরে—অনির্দ্দেশ্য চিত্র-সম্পদে রঞ্জিত তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে—(স্পষ্টবাদী দুষ্টলোকে বলিবেন, ভ্রমসঙ্কুল সংস্করণে) রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। বটতলা বঙ্গ-সাহিত্যের পীঠস্থান এবং পরলোকগত নৃত্যলাল শীল মহোদয় সেখানকার মন্দিরের একজন প্রধান পূজারী। উভয়ই বঙ্গীয় পাঠকের নমস্য। সে যাহা হউক, পুস্তকখানির সন্ধান পাইয়া তন্মুহূর্ত্তে তাহা আত্মসাৎ করি এবং বাড়ী ফিরিয়াই অতিশয় উৎসাহের সহিত পড়িতে বসি! এতদিন পরেও সেদিনকার সে উৎসাহ—সে আনন্দ তদানীন্তন গভীর রেখায় এবং উজ্জ্বল বর্ণে আজিও চিত্রের ন্যায় স্মৃতিপটে অঙ্কিত! মনে পড়ে, মানসিক উপভোগে এত মগ্ন ও মত্ত হইয়াছিলাম যে, স্নানাহারের সময় অতীত হইলেও—দ্বিপ্রহরের পরেও—এক স্রোতে পুস্তকের অর্দ্ধাংশ না পড়িয়া ছাড়িতে পারি নাই—বা পুস্তক আমাকে

ছাড়ে নাই! আহারের সময় উপস্থিত হইলে দময়ন্তী তাঁহার বার্ত্তা নলরাজের নিকট উত্থাপিত করিতে হংসদূতকে নিষেধ করিয়াছিলেন—জঠরাগ্নির নিকট প্রেমের আগুনকেও খাট হইতে হয়—কিন্তু কাব্যমোদীর "পিত্তেন দূনে" এ আশঙ্কা নাই।

আজ ৪০ বৎসর পরে স্বপ্ন-প্রয়াণের নবম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আমিও এই শুভ সুযোগে কাব্যের সমালোচনা করিবার চিরপোষিত আশা এবং ইচ্ছা সম্পাদন করিব। তবে যদি একাধিকবার পাঠ এবং তজ্জনিত আনন্দ উপভোগে কোন পাঠককে কাব্যের মর্ম্ম এবং গুণগ্রহণে সক্ষম করে, তবে সে দাবী আমি করিতে পারি—এবং জানিনা কাব্যপাঠ-জনিত আনন্দ ও সে আনন্দে অপরকে আনন্দিত করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা কাব্য-সমালোচনার আর কোন বলবত্তর প্রণোদনা আছে কিনা।

স্বপ্ন-প্রয়াণ একখানি রূপক। ইহার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় লিখিত জগতের দুইখানি উৎকৃষ্ট বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপকের সৌসাদৃশ্য আছে। একখানি কবি **Spenser** কর্ত্তৃক পদ্যে লিখিত **Faerie Queene**—দ্বিতীয়খানি **Bunyan** কর্ত্তৃক গদ্যে লিখিত জগৎ-বিখ্যাত **Pilgrim's Progress**। তিনখানিই সম-শ্রেণীর—এবং সাহিত্য হিসাবে তাহাদের মূল্য এক না হইলেও পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। তাহাদের অন্তর্গত ভাব একই। আধ্যাত্মিক বাঞ্ছিত লাভের জন্য তিনখানি কাব্যেরই নায়কের চেষ্টা এবং উদ্যম। তাহার দরুণ তাহাদের যে মানসিক সংগ্রাম তাহা স্থূল সংগ্রাম রূপে বর্ণিত এবং তাহাই কাব্যের আখ্যান-বস্তু। হৃদয়ের

প্রবৃত্তি সকলও, গল্পের পাত্রপাত্রীরূপে ব্যক্তিগতভাবে রঙ্গমঞ্চে আনীত। কুপ্রবৃত্তি বা প্রতিকূল প্রভাব সকল শত্রুরূপে এবং সুপ্রবৃত্তি বা অনুকূল প্রভাব ও অবস্থা সকল মিত্ররূপে বর্ণিত! বলা আবশ্যক যে তিনখানি রূপকের মধ্যে Faerie Queene অসম্পূর্ণ—ইহা ১২ পর্ব্বে সম্পূর্ণ করিবার কল্পনা হইয়াছিল এবং কাহারও মতে ১২ পর্ব্বই রচিতও হইয়াছিল—শেষ ছয় পর্ব্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পর্ব্বে এক একটি নৈতিকগুণ—(যেমন Holiness=পবিত্রতা, Temperance=মিতাচার, Friendship=মৈত্রী প্রভৃতি) যোদ্ধারূপে চিত্রিত এবং তাহাদের কার্য্যকলাপে তাহাদের নামানুরূপ ধর্ম্ম পরিস্ফুট! ১ম পর্ব্ব আপনাতেই সম্পূর্ণ—গল্প উপভোগের জন্য কাব্যের অপরাপর অংশ পাঠের আবশ্যক নাই। সুতরাং ১ম পর্ব্বকে একটি সম্পূর্ণ রূপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়—ইহার Knight of the Red cross—পবিত্রতার এবং বিশুদ্ধতার উপাসক—নায়িকা (Una) সত্যকে বিপন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী এবং তাহাতে (Duessa) মিথ্যা, (Archimago) কাপট্য প্রভৃতির চক্রান্তে নানা বিপদ্ আপদে পড়িয়া ভ্রান্তির অরণ্যে (wood of errors) পথ হারাইয়া নিরাশার গহ্বরে (cave of despair) পতিত হইয়া পরে অভিলষিত লাভ করেন।

Bunyanএর রূপকের (Pilgrim's Progress) নায়কও Christian মুক্তিলাভের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাপট্য,

মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিশ্বাস (Faithful), আশ্বাস (Hopeful), জ্ঞান (Knowledge), সতর্কতা (Watchful) প্রভৃতির সাহায্যে পথের নানা বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া দিব্যধামে (Celestial City) প্রবেশ করে। পাঠক দেখিবেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী Faerie Queeneএর ভাবের সঙ্গে যেমন Pilgrim's Progressএর আভ্যন্তরীণ সাদৃশ্য আছে—সেইরূপ, অন্য দিকে নায়কের অভিযান এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাসকল স্বপ্নাবেশে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত হওয়ার দরুণ, তাহার পরবর্ত্তী রূপক আমাদের সমালোচ্য স্বপ্নপ্রয়াণের সহিত, তাহার বাহ্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রবাবু এই দুই রূপক হইতে, জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন। করুন বা না করুন—তাঁহার কাব্য আগাগোড়া এমন অসাধারণ মৌলিক ভাবসংগঠিত এবং সৌন্দর্য্যসম্পদে মণ্ডিত যে, ঐ সামান্য বাহ্য সাদৃশ্য উল্লেখ যোগ্যই নয়।

Spenserএর Faerie Queene এবং Bunyanএর Pilgrim's Progressএর নায়কের ন্যায় স্বপ্ন-প্রয়াণেরও নায়ক (একজন কবি বা কবি-প্রকৃতি লোক) তাহার নায়িকা কল্পনাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত। Faerie Queeneএ যেমন Duessa নায়িকা Unaকে নায়কের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল, স্বপ্ন-প্রয়াণে তেমনই লালসাও ফাঁদ পাতিয়াছিল এবং নায়ক অশেষবিধ বিঘ্ন-বিপদে পড়িয়া

সর্ব্বশেষে দীক্ষা, বীররস, সখ্যরস প্রভৃতির সাহায্যে "কল্পনাকে" আয়ত্ত করিয়া শান্তি-নিকেতনে তাহার সহিত মিলিত হইয়া একজীবন হইয়াছিল—ইহাই স্বপ্ন-প্রয়াণের রূপকের সহজ আখ্যানবস্তু।

আমার মতে এবং যতদূর জানি, সাধারণ পাঠকের মতে—স্বপ্ন-প্রয়াণ রূপক। গ্রন্থকারও ১ম সংস্করণে উহাকে রূপক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা করেন নাই। তাহাতে কিন্তু ইহার রূপকত্ব ঘুচিবে না। তবে যখন রূপকের পাত্র-পাত্রী অশরীরী মনোভাব এবং হৃদয়বৃত্তি হইলেও তাহাদের ভিতর গল্পের সাধারণ পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ভাব ও প্রকৃতি বেশ পরিস্ফুট—অর্থাৎ যখন সেই-সকল সূক্ষ্ম ভাব ও হৃদয়বৃত্তি প্রকৃত মানুষের ন্যায় কার্য্য করে—তখন তাহার রূপকত্ব চলিয়া যায়। যেমন স্বপ্ন-প্রয়াণে সখ্যরস বাস্তবজীবনের একজন প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কথা-বার্ত্তা কহিয়াছে এবং কার্য্য ও ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে সখ্যরস নামে আখ্যাত না করিয়া............ বলিতে পার—এবং লালসা না বলিয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশীর' কাঞ্চন নামে ডাকিতে পার।

রূপক হিসাবে Pilgrim's Progress এবং স্বপ্ন-প্রয়াণ Faerie Queene অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমোক্ত দুইখানি রূপকের আখ্যান-বস্তু সহজ এবং সুনির্দ্দিষ্ট; গল্পটি বেশ যথাযথ বলা হইয়াছে। "তারপর কি হইল?" জানিতে পাঠকের ঔৎসুক্য জন্মায়—কিন্তু Faerie Queeneএর রূপক সর্ব্বথা সহজ ও

পরিষ্কার নয়। তাহা একাধিক সূত্রে গ্রথিত ও জটিল এবং তাহার ভিতর একাধিক উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কখনও নৈতিক—আবার কখনও ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জড়িত। কবির সমসাময়িকদিগের প্রতি কোথাও বা স্পষ্ট লক্ষ্য —কোথাও বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তাহাও সব সময়ে পূর্ব্বাপর এক ব্যক্তিরই প্রতি নয়। যদিও Gloriana আর কেহ নয়— সাম্রাজ্ঞী Elizabeth—কিন্তু King Arthur কখনও Earl of Leicester, কখনও Sir Philip Sydney, কখনও বা অপর কেহ।

গল্পের হিসাবে তিনখানি রূপকের মধ্যে লোকরঞ্জনে Pilgrim's Progressএর প্রাধান্য—এবং গদ্যে লিখিত বলিয়া আবালবৃদ্ধ সকলেরই সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য। যদিও পদ্যে লিখিত নয়, Bunyan গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন এবং Lord Macaulayর উচ্চ প্রশংসা সর্ব্বতোভাবে যোগ্য।

আর এক হিসাবেও Pilgrim's Progressএর অপর দুই-খানি রূপকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। Pilgrim's Progressএ মানব-জীবনের সমস্ত পরিসর ব্যাপিয়া আছে। অসম্পূর্ণ Faerie Queeneএর বাকী অংশ রচিত হইলে বা থাকিলে তাহাতে জীবনের আরও বিস্তৃত চিত্র দেখা যাইত; কিন্তু যে পদ্ধতিতে Faerie Queene রচিত তাহাতে একখানি সমগ্র পটে বা একদৃষ্টিতে জীবনের বিশাল ক্ষেত্র দর্শিত হইত না—পৃথক পৃথক

আখ্যানের দ্বারা—ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে তাহা খণ্ডশঃ প্রকাশ পাইয়া সমগ্রের বিশালতায় পাঠককে অভিভূত করিত না। যেমন নানা উপাখ্যানে গ্রথিত Victor Hugoর La legende des sieclesএ আমরা রামায়ণ বা Iliadএর, Divina Comedia বা Paradise Lostএর অখণ্ড বিশালতা অনুভব করি না। স্বপ্ন-প্রয়াণের পরিসর Pilgrim's Progress হইতে সঙ্কীর্ণ—ইহাতে কেবল কলা-বিদ্যার ক্ষেত্রই মুখ্যতররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি বা কাব্যরসগ্রাহী ব্যক্তিকে ইহা যেমন স্পর্শ করিবে, অপরকে তেমন করিবে না—কিন্তু পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্য্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন। কল্পনাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিতে নায়ক-কবির হৃদয় নির্ম্মল এবং পবিত্র করিতে হইয়াছে এবং প্রতিকূল প্রবৃত্তি ও অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাহার বর্ণনায় শ্রেয়ঃ পথের যে সকল অনিবার্য্য বিঘ্ন ও বাধা, তাহা আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। পথের একটিও দিক্ ছাড়া হয় নাই—যেমন করিয়া পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—কোথাও 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'—কোথাও দুরারোহ পর্ব্বত—কোথাও অতল গহ্বর—কোথাও জীবনশূন্য আতপদগ্ধ বালুময় মরু—কোথাও শান্তিরসে সিঞ্চিত ছায়াবহুল কান্তার—সকলই মানচিত্রের ন্যায় কাব্যে সুস্পষ্ট দর্শিত হইয়াছে। এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানব-হৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানব-জীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে

কলাচর্চ্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এক অসাধারণ গুণ—ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা নাই। বাস্তব জীবনের উপর—উদার অ-সীমাবদ্ধ সত্যের উপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত। জীবনে যেমন ঘটে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে—এবং সকলের উপর উজ্জ্বল কল্পনার উন্মাদিনী জ্যোৎস্না বর্ষিত। সেই কল্পনা তুলনারহিত ভাষায় অপ্সরাচরণের নূপুরনিক্কণবৎ শ্রুতিমধুর ছন্দে এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুবিধবর্ণে বিচিত্র শব্দযোজনায় প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিক কল্পনার ঔজ্জ্বল্য এবং ছটায়—শব্দ ও ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে স্বপ্ন-প্রয়াণ—বাঙ্গলা সাহিত্যে একা—ইহার দ্বিতীয় নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে শুধু কেন, ভাষা ও ছন্দ সম্পদে, জগতের সাহিত্যে ইহার আসন—সিংহাসন! অনেকে ইহাকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারেন—কিন্তু যে কেহ কাব্যখানি পাঠ করিয়াছেন তিনিই আমার মন্তব্যকে কবির যথাপ্রাপ্য প্রশংসা বিবেচনা করিবেন। মুক্তকণ্ঠে এই যথাপ্রাপ্য প্রশংসা না করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়।

সমালোচনার মুখবন্ধে আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি—এখন পাঠককে সঙ্গে লইয়া কাব্যের প্রতিসর্গে বিচরণ করিব—এবং যতদূর পারি অসংখ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে কতক চয়ন করিয়া আমার উপরোক্ত উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরূপ দলিল দাখিল করিব।

কাব্যের ১ম সর্গে নায়কের মনোরাজ্যে অভিযান। ইহা আগাগোড়া কল্পনায়—কথায়—ছন্দে পাঠককে অভিভূত করে—

ইহার ছন্দ কবির (নিজের) মৌলিক সৃষ্টি—এ বিষয়েও Spenserএর Faerie Queeneএর সঙ্গে ইহার সমান সৌভাগ্য—Spenserian Stanza, Spenser দ্বারাই গঠিত—কিন্তু তাহার অনেকটা উপাদান Spenser ইতালীয় কবি Ariosto এবং Tasso হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক কবি, যেমন Thompson, Byron, Shelley প্রভৃতি, ঐ ছন্দে লিখিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের ছন্দ পূর্ব্বেকার কোন কবি গড়ে নাই এবং পরবর্ত্তী কোন কবিই এই ছন্দে লিখিতে বা ইহার অনুসরণ করিতে সাহস করে নাই। এমন কি বাঙ্গলায় যিনি অসংখ্য বিভিন্ন নব নব সুন্দর ছন্দ রচনা করিয়াছেন—যিনি অসাধারণ নিপুণতার সহিত বাঙ্গলা শব্দে নূতন নূতন স্বর যোজনায়, ছন্দে নূতন নূতন ধ্বনি এবং ঝঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। কিন্তু ছন্দ নূতন হইলেও উৎকট কিছুই কাণে ঠেকে না—স্রোতঃপুষ্ট প্রফুল্ল প্রবাহিনীর ন্যায় মধুর কল্লোলে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে "স্বপ্ন রমণী" বর্ণিত কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১ম দুই পংক্তিতে কবিতার সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া চিত্তকে আপ্লুত করে।

"সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ—
সাগরসীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন" !

সৌন্দর্য্যে ইহা উপমা-প্রয়োগের রাজচক্রবর্ত্তী কালিদাসের উপমার তুল্য। পর পর দুই শ্লোকে সুপ্তির আনুষঙ্গিক (উপাদান)

সকল এমন সুন্দর সরঞ্জামে সাজান হইয়াছে যে পাঠকালে ঘুমের আবেশ আসিয়া পড়ে। Rossettiর

"Master of the murmuring Court
When the shapes of sleep convene."

চক্ষের সম্মুখে উদয় হয়।

তৎপরে কল্পনা-চালিত মনোরথ উপস্থিত এবং স্বপনের আদেশে কবি তাহাতে আরোহণ করিলেন। Shelleyরচিত Queen Mab নামক কাব্যে এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

(অসম্পূর্ণ)

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

(ক)

পত্রাবলী

ওঁ

জোড়াসাঁকো

২৯শে আষাঢ়

প্রিয় বন্ধু

আমার স্বপ্নপ্রয়াণখানি সমালোচনার অভাবে বেঘোরে পড়ে অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে। এ বিপদে তোমা ভিন্ন তাহার গতি নাই। আমাকে যদি একবার অত্রভবনে চিরাভিলষিত দর্শন দান কর, তবে পরমসুখী হইব। আশা করি তুমি পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দ শরীরে সাহিত্য-কাননে বিরাজ করিতেছ।

তোমার সৌহার্দ্দ্যে বাঁধা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

alias old বড়দাদা

সাহিত্য-রসের রসিক প্রিয়সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন

অভিন্নহৃদয়েষু

ওঁ

জোড়াসাঁকো

প্রিয়বন্ধু

এ দুইদিন তো আমার ভাগ্যে তোমার দর্শন মিলিল না। কাল রবিবার—অতএব আমি ওজর আপত্তি শুনিব না—কাল সকালে বিকালে দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যাকালে অবশ্য অবশ্য অবশ্য আমাকে দর্শনামৃত দান করিতে চাও—আমি উন্নয়নে পথ চাহিয়া রহিলাম।

দর্শনতৃষিত চাতক দ্বিজ

(দ্বিজ শব্দের অর্থ এখানে পক্ষী)

পরম প্রীতিভাজন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন করকমলেষু

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

আমি শনিবারে বেলা দ্বিপ্রহরে বোলপুর রওনা হব। তাহার আগে একবার তোমার দেখা পেলে সমালোচনার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইব মনে করিয়া সেই আশায় বসিয়া আছি।

তোমার old

Bordada

পরম প্রীতিভাজন

প্রিয়নাথ সেন

অভিন্নহৃদয়েষু

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

আমরা তোমার আইরিটোলা ভবনে তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় চাতকের ন্যায় চাহিয়া আছি

চা—দ্বি

Babu

Prionath Sen

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

তুমি স্বপ্নপ্রয়াণের সমালোচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয়। বঙ্গের সাহিত্য-মধুপেরা droneএর জাতি—তাহারা রসও বোঝে না আর ভাল জিনিষের মর্য্যাদাও বোঝে না। তোমার এবং আমার সাধের স্বপ্নপ্রয়াণটি তাই এ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাজে দপ্তরের (waste basket) আবর্জ্জনারাশির মধ্যে মরণাপন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছে —কেহ তাহাকে পোছে না। কোনো কবি গর্ত্তবাসকালে বিধাতাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল

"ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া

বিতর—তানি সহে চতুরানন।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥"

ইহার একটা অনুবাদ—

শত তাপ বিতর সহিব তাহা হে চতুরানন।
লিখোনা লিখোনা শিরে অরসিকে রসনিবেদন।

ব্রহ্মার আশ্বাসবাণী

হইবে তোমার বন্ধু সুরসিক প্রিয়।
কবিত্ব রসের ডালি তারে সঁপি দিও॥

প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেন
অভিন্নহৃদয়েষু

ওঁ

প্রিয়বন্ধু

আমার সাধের স্বপ্নপ্রয়াণটিকে তোমার ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত। সমালোচনার কিরূপে গোড়া ফাঁদিয়াছ—আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ধীরে সুস্থে যেমন চল্‌চে—চলুক; তুমি যখন আমার মানস পুত্রটিকে সভারঞ্জন বেশে সাজাইয়া গুজাইয়া আসরে নাবাইবে—তখন দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ করতালি আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিবে—এই আশায় আমি কৌতূহলের বেগ সম্বরণ করিয়া দিন গুণিতেছি—Green-room এ উঁকি দিয়া তোমাকে অপ্রস্তুত করিব না।

তোমার চিরানুরক্ত
ভাই দ্বিজ

প্রিয়বন্ধু
প্রিয়নাথ সেন
অভিন্নহৃদয়েষু

প্রিয়বাবু—

কাল আপনাদের ওখানে যাই-যাই করিয়া বিশেষ কারণে যাওয়া ঘটিল না। আপনি বোধ করি—বিহারীবাবুর কাছে, আমাদের সমালোচনী-সভার বিশেষ বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন, আপনাকে সেই সভায় যোগ দিতেই হইবে। কি বলেন। আজ আমাদের প্রথম দিন। ২টার সময় আরম্ভ হইবে। আপনি যদি আহার করিয়াই আমাদের এখানে আসেন, তবে আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৃহস্পতিবার

প্রিয়বাবু,

কাল আমাদের এখানে অর্থাৎ (১৪ নং সর্কুলার রোডে) একটা ছোট পার্টি আছে, তাতে ঋষি ও হালদার আসবেন, আপনি এলে বড়ই খুসি হই। মেজদাদার সেই অবসরে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা আছে। আস্‌বেন। কাল দিনের মধ্যে যখন খুসী আস্‌বেন—সন্ধ্যের সময় খেয়ে গান শুনে বাড়ি যাবেন। এবার ভারতীতে যে কবিতা যাবে সেইটে সঙ্গে আন্‌বেন। মেজদাদার Madmoiselle De Maupin খুবই ভাল লাগ্‌চে—কাল এস্‌লে সমস্ত শুন্‌বেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

ভাই প্রিয়বাবু

আমি আজই মেল ট্রেণে রওনা হচ্চি। আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ভয়ানক ঝঞ্ঝাটে কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। আপনি যখন আপনার কবিতার সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন তার বহুপূর্ব্বে সেটা ছাপা হয়ে গিয়েছিল।

আবার তিন মাস পরে দেখা হবে, unless কোন সুযোগে আজ দেখা হয়।

Scripta Urbana আজ পাঠাতে পারবেন? আপনার German Popular Stories আজ পাঠাচ্ছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

ভাই,

কাল, অর্থাৎ শনিবার প্রাতঃকালে আমাদের এখানে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করবে কি? কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও* দেবার ইচ্ছা আছে।—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* চিত্রাঙ্গদার পাণ্ডুলিপি পাঠ।

ওঁ

ভাই

তোমার স্বপ্নলোক এবং কর্ম্মচক্র থেকে শীঘ্র নেমে এস। কাল ত রবিবার আছে কাল কখন্ আস্‌বে লিখে পাঠিয়ো। তুমি যদি না নড়্‌তে পার মহম্মদকে নড়্‌তে হবে—কিন্তু মহম্মদও নড়েচেন ওদিকে পর্ব্বতও সরেচেন এমন ঘটনা ইচ্ছা করি নে। তুমি আস্‌বে, কি আমি যাব ঠিক করে বল। এবং কখন? কাল সকালে নিশ্চয়ই একখণ্ড ক্ষণিকা পাবে। আষাঢ়স্য শেষ দিবসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

ভাই—

আজ ৩৷৷০ বেলায় রেমিনির বেহালা-বাদন হবে। যাঁরা রেমিনির বেহালা শুনেচেন তাঁরা বলেন একবার এই বেহালা শুন্‌লে চিরজীবন সার্থক হয়—এমন মধুর সঙ্গীত তাঁরা জন্মে কখনও শোনেন নি। আমি ছেলেদের নিয়ে আজ শুন্‌তে যাব—তোমারও যাওয়া অত্যন্ত উচিত—এমন সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত হওয়া অন্যায়। আজ যদি ভাই ভাল ছেলের মত আপিস পালাও ও যথাসময়ে কোরিন্থিয়ন্ রঙ্গভূমিতে হাজির হও ত বড় ভাল হয়। আমরা চার টাকা দিয়ে এক একটা seat engage করেচি—তোমার যেখানে খুসী যেয়ো—কিন্তু যাওয়াটা নিতান্তই চাই। আমার যদি নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ থাকৃত তা হোলে আমি

সশরীরে উপস্থিত হয়ে জবরদস্তি করে তোমার সম্মতি নিয়ে আসতুম সন্দেহমাত্র নেই—কিন্তু আমার এই অনবসরের সুবিধা পেয়ে ফাঁকি দিও না।

তার পরে ১১ই মাঘ—সেদিন দু-বেলা নিমন্ত্রণ—সেদিন সকালে যদি ধরা দেও ত সমস্ত দিন ধরে রাখব। ইতিমধ্যে আর একটা কারখানা আছে—তিন সমাজের একত্র উপাসনা হবে—৯ই মাঘ অর্থাৎ কাল প্রাতে অত্রভবনে তিন সমাজের মহারথীরা একত্র হবেন। আপনি এলে—আবার আপনি বল্‌চি—তুমি এলে বড় আনন্দ হয়।

একটা সংবাদ আছে। মেজদাদা এসেছেন।

আমি ভারি ব্যস্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিলাইদহ

কুমারখালি

E. B. S. R.

ভাই,

*   *   *   *

ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে। ইতি

৭ই আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. R.

ভাই,

আমি সাহিত্য পড়ি নাই। কিন্তু তুমি যে নিন্দুক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সান্ত্বনা পাইলাম। তোমরা আমার হইয়া রাগ করিলে, মনে হয়, আমার আর রাগ করিবার বা দুঃখ পাইবার দরকার করে না—আমি শান্তিলাভ করি।—মন শান্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না—সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি—কিন্তু সংসারে কাঁটার উপরে পা না ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে ফোটে ;—দুঃখ বেদনার পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই—আছে নিজের মনে—তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহুদূরে। ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন—তোমার এবং তাঁহার এই পত্রে আমি মনের মধ্যে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি ;—বন্ধুহৃদয়ের সমবেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিধারার মত—তাহা আমার সফলতা লাভের এক প্রধান সহায়।

কাজের কথাটা এবারকার চিঠিতে লিখিয়ো। একবার তুমি এখানে আসিতে পারিলে সুবিধা হইত। ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩০৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

ভাই

আবার চুপচাপ? কিন্তু তোমার গতিবিধিটা আমার জানা দরকার। যদি এখানে আস তা হ'লে আর নড়িনে—এবং লোকেনের কাছে সময়মত একটা দরখাস্ত দাখিল করে মুলতবি মঞ্জুর করে নিই। যদি না আস তা হ'লে খুলনায় যাবার আয়োজন করতে হয়। তুমি ত শুক্লপক্ষ থেকে আসবার বন্দোবস্ত করচ, কৃষ্ণপক্ষ এল—তখন ধানের গাছে সবেমাত্র শিষ ধরেছে, এখন পাকা ধান কেটে আঁটি বেঁধে বেঁধে গোলায় নিয়ে যাচ্চে, করচ কি? ক্ষেত্র ক্রমে শূন্য, রাত্রি ক্রমে অন্ধকার, দিন ক্রমে মেঘচ্ছায়া বিবর্জ্জিত হয়ে আস্‌ছে। শিলাইদহ যখন রিক্তপ্রায় তখন অতিথি তাঁর দ্বারে এসে উপস্থিত হবে।

তারপরে অন্যান্য খবর কি? উল্লাসজনক কিছু থাক্‌লে নিশ্চয় পত্র পাওয়া যেত, এই মনে করে শান্ত হ'য়ে বসে আছি।

আজ চন্দ্রনাথবাবুর একখানি চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করলুম—সেইটে তোমাকে কাপি করে পাঠালে তুমিও বোধ হয় খুসি হবে।

"তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার

গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুতবৎ! তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। কণিকা কথা কল্পনা ক্ষণিকা—বলিতে গেলে চারিমাসের মধ্যে চারিখানা—পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃত পক্ষেই পারি নাই। "কণিকা" ছাড়িতে না ছাড়িতে "কথা" আসিল,—"কথা" দিয়া তুমি আমার হাত হইতে কণিকা কাড়িয়া লইলে—কণিকার ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া কল্পনা দিয়া কথা কাড়িয়া লইয়াছিলে—আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে। এবার ক্ষণিকায় চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থ বিদ্যুতের গতি—যেমন দ্রুত তেমনি উজ্জ্বল তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্দ্ধ-দেশের, মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ তোমার পরিমাণ করিতে পারি যথার্থ ই এমন শক্তি আমার নাই।

যে চারিখানার নাম করিলাম সকলগুলিই মিষ্ট হৃদয়স্পর্শী সুগভীর সুললিত, (অনেকস্থলে) সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের, পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্ব্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি—পল্লীপ্রিয় পাড়া গেঁয়ে—মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এ সৌরভ শিলাইদহইজনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ

পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোনটার কথা বলিব? অনেকগুলাতে ঐ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু, কি জানি কেন, "বিরহের" সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।

ক্ষণিকায় একটা বড় গুণপণা দেখিলাম। উহার আকৃতিও ক্ষণিকার ন্যায়। ক্ষণিকার প্রতি পৃষ্ঠায় দেখি ক্ষণিকা আঁকা রহিয়াছে। তাই বলি তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।"

———০———

এই চিঠিখানি পড়ে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করছিলুম। প্রাপ্যর চেয়ে অধিক পেয়েছি সে বিষয়ে আমার নিজের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।—"বিরহ" কবিতাটা আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়—সেইটে উনি বিশেষ-রূপে নির্ব্বাচন করাতে আমি একটু বিশেষ খুসি হয়েছি। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু কি "কাহিনী"-খানা পান নি? না, ওঁর সেটা মনে কোনরূপ রেখা অঙ্কিত করে নি? যেন সন্দেহ হচ্ছে ওটা কোন-কারণে তাঁর হস্তগত হয়নি। কিন্তু তোমাকে আর অধিক লেখা উচিত নয়। এ পাতাটা খালি থাক্। বিনা প্রত্যুত্তরে পত্র লিখ্লে তোমাকে Spoil করা হবে। অতএব ইতি ৩:শে শ্রাবণ। (ভাদ্রমাসে বাড়ি ছাড়তে নাই অতএব ৩২শে তারিখেই তোমাকে বেরতে হচ্চে—সংক্রান্তি মান্‌লে চল্‌বেনা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

এ কয়দিন পর্য্যায়ক্রমে কাজ এবং আলস্যে বিজড়িত হয়েছিলুম—এদিকে আকাশে একবার মেঘ একবার রৌদ্রের আবির্ভাব তিরোভাব চলছিল।

প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষে কাব্য ও নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং আচরণের সৌন্দর্য্য সবই ললিতকলাবিধির অধিকারভুক্ত কিন্তু সৌন্দর্য্যের হিসাবে না গিয়ে কোনপ্রকার নৈতিক আবশ্যকতা, সামাজিক উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মনীতির সৌন্দর্য্য যে সৌন্দর্য্য নয় একথা যে বলে সে অন্ধ। গোলাপের সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর, সুন্দর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তেমনি সুন্দর—কেবল তা অতিরিন্দ্রিয়ের গোচর এই যা তফাৎ। গান কর্ণগোচর সুন্দর, রূপ চক্ষুগোচর সুন্দর, সাধুহৃদয় মনোগোচর সুন্দর। তোমার প্রবন্ধের অপরাংশের জন্য উৎসুক আছি।

"সাহিত্যে" কবিতায় এবং আলেখ্যে আমি চিত্র-বিচিত্রিত হয়ে উঠেছি—তাতে তোমারি প্রণয়চেষ্টা প্রস্ফুটিত হয়েছে—আমি সে সম্বন্ধে নীরব।

আগামী ১৬ই আষাঢ়ে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বাড়িতে ১৭ই বড়দাদার কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহ।

ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পড়্‌চি। ৪ ফর্ম্মা গেলি প্রুফ হয়েছে—অদ্য কেবল দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডার প্রুফ পাওয়া গেল।

আষাঢ়ের ভারতী আজ পেয়েছি। তুমিও বোধ হয় পেয়ে থাকবে।

বম্বে থেকে আম আনাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। ইতি ৬ই আষাঢ়। ১৩০৭।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

অচলাটল নির্ব্বাণ্বরেষু

কোন্ সময় চুপ করিয়া থাকিতে হয় সে বিদ্যাটা তুমি বেশ জান।

আমি এখানে একাগ্রমনে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছি—তোমার মস্ত খবরটা একবার কেবল ঠোকর মারিয়া গেল—হে অতলস্পর্শ সংবাদ-অম্বুনিধি, এই তীরবাসীকে আর বিড়ম্বিত করিয়ো না।

কবি দেবেন্দ্র সেন শিলাইদহে আসিবেন আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিলেন তারপরে আজ তিনদিন তাঁর আর কোন সংবাদ নাই। বায়ু গর্জ্জন করিতেছে আকাশে ক্রমাগত মেঘ ও রৌদ্রের গতায়াত চলিতেছে—এবং **I am aweary aweary he cometh not**

লোকেন বহুকাল পরে দেশে ফিরিল—একলাইন খবর নাই। শ্রাবণ মাসে কি মীন রাশির সংবাদভাগ্যে কোন গোল আছে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ভাই,

তুমি ত কাল বৃহস্পতিবারে শিলাইদহ এলে না—আমি অত্যন্ত চ'টে বোটে করে একেবারে কুষ্টিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির। তোমার নামে নালিশ দায়ের কর্ত্তে নয়—তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কুষ্টিয়ায় একটা হাইস্কুল হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করতে তাঁর সঙ্গে এবং মুন্সেফবাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ করা আবশ্যক হয়েছিল। এর থেকেই বুঝতে পারবে আমি কত বড় পাব্লিক স্পিরিটেড লোক—রায়বাহাদুর হবার যোগ্য! কেবল ক্ষণিকা লিখি বলে তোমরা আমাকে অবজ্ঞা কর কিন্তু যেদিন কুষ্টিয়ার ছাত্রবৃন্দ আমাকে অভিনন্দন পত্র দেবে সেদিন আমার মর্য্যাদা বুঝতে পার্‌বে। তাতে আমার জগদ্‌বিখ্যাত দয়াদাক্ষিণ্য শৌর্য্যবীর্য্য বদান্যতার উল্লেখ থাক্‌বে—ধনমানরূপগুণ কুলশীল কোনটাই বাদ যাবে না। তখন মোলিয়রের যশস্বী জুঁর্দ্দ্যার মহাবাক্য স্মরণ করে বল্‌বে প্রায় ৪০ বৎসর লোকটাকে দেখে আস্‌চি কিন্তু জানতুম না ইনি এতবড় ইনি!

কাল কুষ্টিয়ায় যাতায়াতে সমস্ত দিন বোটে কেটেছে—সেটা মহালাভ। প্রাতে বেড়িয়েছি যখন, তখনো পথের তৃণে প্রভাতের শিশির লেগে আছে—শিলাইদহের ঘাটে যখন ফিরলেম তখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ মধ্য গগনে। আমার সেই জ্যোৎস্নাজড়িত নদীটি স্মিত বিষণ্ণ হাস্যে বল্লেন, আমাদের সেই কলহংস-মুখর নির্জ্জন বালুতটে বহুশরতের মৌন মিলন সুখ একেবারে বিস্মৃত হয়ে তুমি

এখন ডাঙার মথুরায় রাজত্ব কর্‌তে গেছ! আমি তার একটি অক্ষর জবাব দিতে পারলুম না—একেবারে নির্ব্বোধের মত নিঃশব্দে চৌকিটিতে বসে রইলুম।

রাত্রে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলুম! আজ প্রাতে উন্মুক্ত বাতায়নে দুরন্ত দক্ষিণ বাতাসে উত্তর দিতে বসেছি—বৃষ্টিধারাস্নাত কিশোর আলোকটি পূর্ণমঞ্জরিত ধান্যের ক্ষেত্রে তরঙ্গে তরঙ্গে দোলায়মান।

তুমি ত আধিব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গলির ধারে পড়ে আছ, এ সময়ে তুমি কোন প্রলোভনের আকর্ষণে শেয়ালদহের অভিমুখে দৌড়বে বলে বোধ হচ্চে না। বাঁশি বাজ্‌লে গোপাঙ্গনারা ছুটোছুটি করে যমুনাতটে উপস্থিত হত বটে কিন্তু তোমার মত তাদের কারো পায়ে ফোড়া হয় নি—বৃন্দাবনে দশপ্রকারের দশা এবং স্বেদপুলকবেপথুস্তম্ভমূর্চ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ ছিল কিন্তু কারো পায়ে ফোড়া হত না এবং একা কৃষ্ণ সকল ঘটকালির পথ রোধ করে ত্রিভঙ্গমূরতি ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন।

* * * *

রাস্কিন শেষ করে ফেল! এবং আমার ক্ষুদ্র ক্ষণিকাটিকেও ভুলো না! লেখা সম্বন্ধে নদীর উপমা খাটে না—যদি খাট্‌ত তা হলে আমার সেই বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি এতদিনে খাতার মধ্যে শেষ হয়ে থাকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে না লিখলে লেখা অগ্রসর হয় না—জগতের এম্‌নি কঠোর নিয়ম! অতএব লিখে ফেল।

প্রবোধের Arthurian legendএর আয়ু কতদিন চল্‌বে?

তুমি তার লেখার উপর হস্তক্ষেপ না করে মাথার উপরে মধ্যম-নারায়ণ তৈলক্ষেপ কর। আর্থার সাহেব ও বেচারার মাথায় সইল না।

বেলার জন্যে একটা রোগশুশ্রূষার বই দেখে রেখো। Sanitation সম্বন্ধে একটা বই তাকে পড়াচ্ছিলুম, শেষ অধ্যায়ে এসে ঠেকেছে। ইতি ২৬শে শ্রাবণ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

বিজয়ার প্রেমাভিবাদন গ্রহণ কর।

ঝড় বৃষ্টি চল্‌চে। আমি চতুর্দ্দিকে সার্সি বন্ধ করে গরম হয়ে বসে লেখবার চেষ্টায় আছি। এবারে যখন আসবে তোমাকে শোনাবার মত কিছু সংগ্রহ থাক্‌বে। কিন্তু খুব বেশী আশা কোরো না—কারণ "ব্লেসেড আর্ দোজ্ হ্বাট্ এক্সপেক্ট নথিং, ফর্"—ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবী সরস্বতীর দ্বারে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুষ্টিভিক্ষা করচি মাত্র—এবং তিনি যখন অনুগ্রহ করে যা দেন আমি সে সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিরুক্তি মাত্র না করে ঝুলিটির মধ্যে পূরি। আর কিছু না হোক ঝুলিটি উত্তরোত্তর ভরে উঠচে। এত অধিক বোঝা নিয়ে অমরতার পথে অধিক দূর যাওয়া যায় কিনা সে একটা বিবেচ্য বিষয়! এক এক সময় নৌকা বাঁচাবার জন্যে মালের বস্তা দুটো চারটে, জলের মধ্যে টেনে ফেলে দিতে হয়—আমারো অনেক বস্তা ফেলা দরকার।

ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে—বৃষ্টিধারারও বিরাম নেই। আজ ভোগের জন্য খিচুড়ি প্রস্তুত—অদূরবর্ত্তী ভোজনশালা থেকে এই মাত্র তার উষ্ণ গন্ধ এসে পৌঁচেছে—এখন তোমার অনুমতি নিয়ে গাত্রোত্থান করি—তোমাকেও আমন্ত্রণ করি! ইতি রবিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই Easter Sunday – 7 Ap. 1901 = ২৫চৈত্র

* * * *

Easter ছুটিতে লোকেনকে ডেকেছি—আসতে পারবে কিনা জানিনে—কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে তোমরা দু'জনে একত্র হ'লে বেশ জমে উঠ্‌বে আশা কর্‌চি। তোমরা পরস্পরের কাছে সুপরিচিত হও এই আমার ইচ্ছা।

অতুলচন্দ্র (ছদ্মনাম বীরেশ্বর গোস্বামী) তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসি হয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন—যেন, তুমি কাউকে খুসী কর্‌লে তার কৃতজ্ঞতার অংশে আমারও দাবী আছে।

বিনোদিনী লিখতে আরম্ভ করেছি—কিন্তু তার উপরে ভারতী এবং বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন, ভারতী প্রত্যহই তাঁর ভিক্ষাপাত্রটী আমার দ্বারে ফেরাচ্চেন। এমন করলে আমি ত আর বাঁচি নে।

আকের গুড় তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্চি—মূল্য এখন ফস্‌ করে নিচ্চিনে—যতটা সাধ্য তোমাকে ঋণী করে রাখা যাক্‌—মিষ্টের ঋণ, সুবিধা পেলে, কোন এক সময় মধুরেণ শোধ করে নেওয়া যাবে।

বাচা মাছ এখন পাওয়া দুঃসাধ্য। তা ছাড়া সে মাছ গরমে অতি শীঘ্রই নষ্ট হ'য়ে যায়। পাঠাবার তর সবে কিনা সন্দেহ। যদি লোভ থাকে ত ঈষ্টরের মধ্যে এসে খেয়ে যেয়ো। এখানকার সব ভাল জিনিষ যদি তোমাকে পাঠিয়ে দিই তাহ'লে সশরীরের আসবার তাগিদ থাকবে কেন? ডাক্তার মাঝে মাঝে তোমার শুভাগমনের তথ্য নিয়ে যান—উত্তরোত্তর তিনি হতাশ হয়ে পড়চেন বলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে।

তোমার রবি

ওঁ

গাজিপুর
২, বৈশাখ

ভাই

নববর্ষের কোলাকুলি গ্রহণ কোরো। বর্ষারম্ভে বিদেশের বন্ধুকে স্মরণ কোরো। যদি কোন সুযোগে এদিকে আস্‌তে পার তা হলে দিনকতক সম্মিলনরস সম্ভোগ করা যায়। কিন্তু তোমাকে মথুর সেনের কুঞ্জপথ থেকে নড়ান কোন্ শক্তির দ্বারা সাধিত হতে পারে তা ত জানি নে। সুদূরস্থ সখ্যশক্তি দ্বারা ত নয়ই—নিতান্ত বাহুবলের দ্বারা হতে পারে। সংসারে বোধ করি যৌগিক অথবা চুম্বকাকর্ষণের অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণ বা কৌশিকাকর্ষণের বল বেশি। কিন্তু তুমি শেষোক্ত দুই আকর্ষণের বাহিরে চমৎকার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। অতএব ডাকযোগে কেবল ডাক দিয়ে অপেক্ষা করে রইলুম—দেখি

কোন রকম ফল হয় কিনা। এখানে বই, বিজনতা এবং বন্ধু আছে—এর মধ্যে কোনটা যদি লোভনীয় জ্ঞান কর ত বিলম্ব করবার আবশ্যক নেই। আমাদের বাসস্থানটি গঙ্গাতীর, বৃহৎ কানন এবং ক্ষুদ্র কুটীর। গাছে পাখী ডাক্‌ছে এবং পাশে Civil Surgeonএর বাড়ি।

তোমার অবস্থা কি রকম আমাকে লিখো—হয় ত এমন অলস অবস্থায় আছো যে লেখবার সুবিধা হবে না। তোমার চিঠিপত্র না পেলে আমি এই রকম একটা কিছু কল্পনা করে নেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

আমি এই পুণ্যতোয়া পদ্মার দিকে মুখ করে ডাকযোগে তোমার গাঁ ছুয়ে শপথ করে বল্‌তে পারি যে তুমি যদি এস তা হলে আমি খুলনায় যাইনে—কিন্তু এই হপ্তার মধ্যে তুমি যদি না এস তাহলে যদি আমি না যাই ত আমার নাম নেই—অতএব তোমার ভৃত্যটিকে হাঁক দাও, পোর্টম্যাণ্টো বোঝাই কর, অশ্রুমুখী গৃহিণীর কাছে বিদায় লও, এবং কোনপ্রকার কৌশলে ট্রেন মিস্ কর্‌বার চেষ্টা কোরো না। এই আমার Ultimatum এর পরেই লড়াই সুরু হবে। শেষকালে হয়ত একদিন লাঞ্ছিত পরাজিত বন্দীভাবে নতশিরে এখানে এসে ধরা দিতেই হবে।

সম্প্রতি মেঘ এবং রৌদ্র উভয়ে মিলে যেন কৃষ্ণরাধার অফুরান

লুকোচুরি খেলা চল্‌চে। কেউ কাউকে পরাস্ত কর্‌তে পারচেন না। শেষকালে একপক্ষে কৌতুকহাস্য এবং অপর পক্ষে অশ্রুবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত গড়াচ্চে।

আমি নানাপ্রকার ছুতোয় নানাপ্রকার কুঁড়েমি করে অবশেষে কাল্‌ বৈকালে চিরকুমার সভায় হস্তক্ষেপ করেছি—আজ বৈকালে সমাধা করার আশা করচি। অবশ্য চিরসমাধা নয়—কেবল আশ্বিনের কিস্তি।

কিন্তু তুমি বড্ড ফাঁকি দিচ্চ। ফোড়া হলে পা চলে না কিন্তু কলম চলবার বাধা হয় না। আমি নিজে লেখা-ব্যবসায়ী অতএব আমার কাছে বাজে ওজর কোরো না—এই মুহূর্ত্তেই বসে যাও। প্রবোধ এবং তার পাগলামি, এবং পত্রগুলিকে জাহান্নম নামক একটা ভুগোল বহির্ভূত জায়গায় যেতে পরামর্শ দাও—বোধ হয় সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ অমন লোকের খবর পেলে নিজের থেকে রাহাখরচ দিয়ে তাকে সেখানে পত্তন করতে পারে।

আমি প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিজেকে অযথা বাড়িয়ে তুলতে ভূয়সী চেষ্টা কর্‌চি এ সংবাদ আমার কাছে নূতন। এ বিষয়ে আমার কোন উৎসাহ বা উদ্যোগ নেই—এবং এ সম্বন্ধে কোন রকম অপব্যয় কর্‌তে আমি অসম্মত। অথচ Enlargement সম্বন্ধে যতদূর জানা আছে তাতে বল্‌তে পারি ছবি গোকুলে আপনি বাড়ে না, হয় ত আমার অজ্ঞাতসারে আর কেউ তাকে বাড়াচ্চে।

পরিশিষ্ট

গল্পাবলীর কাগজ সম্বন্ধে গতকল্য সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ অবগত হয়েছে। হাতের দশ রিম কাগজ ফুরিয়ে গেলে চন্দ্র ব্রাদার্সদের কাছ থেকে আমদানি সুরু করতে বলেছি। যথাসম্ভব নগদ দাম দেবারই বন্দোবস্ত করা হবে—সুতরাং তাতে তাদের অসুবিধা হবে না।

Mark Twain-এর **Selection** যদি তোমার কাছে থাকে এখানে আগমনকালে সঙ্গে এনো—পরিজনবর্গকে সায়াহ্নে আমি পড়ে শোনাই। ইতি ২৮শে শ্রাবণ ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভাই

চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে **full steam** লাগানো গিয়েছিল—ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম—যেমন করে হোক্ শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুন্‌লুম শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসচে— তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে। সকল সময়ে কি মেজাজ ঠিক থাকে ? চৈত্রের কুমার সভা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেচ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শমতে ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্ত্তন করে দেবার চেষ্টা করব। বৈশাখে কুমার সভার উপসংহারটা পড়ে তোমাদের কি রকম লাগে জান্‌বার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও

আছে। নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি—মনের সে অবস্থায় কখনো রস নিঃসারণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যে রকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েচে কিনা নিজে বুঝতে পারচি নে। একবার সমস্ত জিনিষটা একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে ওর পরিমাণ সামঞ্জস্য বিচার করা যায়—সেই জন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরবে, তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।

আজ এখানে শৈলেশের আসবার কথা আছে। বিনোদিনী সম্বন্ধে একটা সুবিধা এই যে অন্ততঃ মাস তিনেকের মত লেখা সংশোধন করে ঠিক করে লিখে রেখেছি—সুতরাং কতকটা রয়ে বসে ওটা সমাধা করতে পারব। কিন্তু তবু খণ্ড খণ্ড করে এ রকম গল্প বেরলে জিনিষটা অসমান হয়ে পড়ে। সব জায়গা ত সমান সরস ও কৌতূকাবহ হতেই পারে না—সুতরাং মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে হতাশ হতোদ্যম হতে হবেই। এ রকম বই সবটা একসঙ্গে না পড়লে উত্তরোত্তর বিকাশ এবং ঘনায়মান পরিণাম পাঠকের মনে দৃঢ় করে বসে না। এ গল্পে ঘটনা-বাহুল্য একেবারেই নেই, সেইজন্যে এটা ক্রমশঃ প্রকাশের যোগ্য নয়—কিন্তু মাসিক পত্রিকার করাল কবল থেকে একে যে বাঁচাতে পারব এমন আশা করিনে। সেকালের দৈত্যকে যেমন পালা-ক্রমে এক একটি নর-খাদ্য দিতে হত—একালে মাসিক-পত্রকেও সেই রকম এক একটি সাধের রচনা পর্য্যায়ক্রমে দিয়ে

শোক করতে হয়। ভারতীর জন্তে আজ কালের মধ্যেই একটা লেখা সুরু করতে হবে—আজ খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন এসেছে। গুড় পেয়েছ? ১৩০। [illegible]

তোমার রবি

ওঁ

ভাই,

তোমার আজিকার পত্রে সোমবারে যাত্রার কোন উল্লেখ নাই। চৌঠা এপ্রিলের কোনও প্রসঙ্গ দেখিলাম না—আশা করি তোমার যাত্রার তারিখ ক্রমাগতই পিছু হঠিতে থাকিবে না।

কাল চিরকুমার সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি—এমন সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য শ্রীশ, শৈলেশ দুই ভাইয়ের নিকট হইতে বন্দুকের দুই চোঙভরা অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে—কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই। তোমাকে সম্পাদক পাকড়াও করিবার জন্য শৈলেশকে উত্তেজিত করিয়া পত্র লিখিয়াছি। বেগার খাটুনির তাগিদে নানা লোক তোমার দ্বারে ধন্না দেয়—আর একটা ধন্না বাড়িলে বোঝার উপর শাকের আঁটি পড়িবে। পরের অনুরোধে লক্ষ্মীর দলিলপত্র ফসাফস লেখ, আর সরস্বতীর মৌরসী দলিল কেন না লিখিবে? পত্রপ্রাপ্তি মাত্র Show cause why।

কাল রাত্রেই একটা ঝড়ের বাচ্ছা নদীতীরে শিকার সন্ধানে গিয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া আমাদের কুঠিবাড়ির চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছিল। অতএব ঠিক দিনেই আসিয়াছি।

১১ চৈত্র ১৩০৭

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ

ভাই—

এখানে এসে অবধি রোজই তোমাকে মনে করি কিন্তু চিঠি লেখা হয় না—মনে মনে লিখি কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল নেই। এখেনে এসে অব্‌ধি এম্‌নি ছুটির হাঙ্গামে পড়েছি যে ঠিক চিঠি লেখ্‌বার অবসরটুকু খুঁজে পাইনে। এখানে চারিদিকে শরতের রৌদ্র, অশোকের গাছ, ছায়াময় পথ, তরঙ্গিত মাঠ, সুমধুর বাতাস—সমস্ত দিন একটা গড়িমসি ভাব—কখন লিখি বল? চিঠি এতদিন না লেখ্‌বার আরেক্‌টা কারণ আছে—তোমাকে চিঠি না লিখ্‌লে কোন রকম হিসেবের দায়ে পড়্‌তে হবে না এটা আমি নিশ্চয় জানি। তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝ্‌তে পারবে—আর তুমি যদি আমার এ চিঠির উত্তর দিতে দেরী কর কিম্বা না দাও—আমিও তোমার অবস্থা ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌ব। দরকার্‌ কি? আমাদের মধ্যে একটা মস্ত চিঠি লেখা আছে—তা'তে সমস্ত বোঝাপাড়া হয়ে আছে—তোমার আমার উত্তর প্রত্যুত্তর তার মধ্যেই সমস্ত ধরাবাঁধা আছে।

আমরা দুজনেই মুখচোরা সশঙ্কিত লোক— আঁচাআঁচির চেয়ে বেশি দূরে যাইনে; কিন্তু মনে মনে কি একটা বোঝাপড়া হয় নি? আমার বোধ হয় আমাদের একরকম গভীর চেনাশুনো হয়ে গেছে তাই জন্যে আমাদের বেশি কথাবার্ত্তার দরকার হয় না। আমরা বোধ হয় এখন দুজনে এক ঘরে চুপ ক'রে বসে থাকৃতে পারি। জানি নে আমাকে তুমি কি রকম মনে কর—কিন্তু আমি তোমার কথা বেশ বুঝ্‌তে পারি—তোমাকে অত্যন্ত প্রতিবেশী বলে বোধ হয়—দুজনের এক ভাষা। আমার মনে হয় আমি ছাড়া তোমার অনেক কথা আর কেউ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝ্‌তে পারে না। তর্ক সকলেরই সঙ্গে করা যায়—কিন্তু সকলের সঙ্গে কল্পনা করা যায় না। তাই সংসারের মধ্যে সকলে কল্পনার উপরে অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়—কল্পনাকে কেবল নিতান্ত আমারই খেয়াল বলে মনে হয়—তারপরে তোমার সঙ্গে যখন কল্পনার মিলন হয় তখন তাকে আবার সত্য বলে বিশ্বাস হয়—তার পক্ষে একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

তোমার সেই রাস্তার ধারের ঘরের positionটি কিছু নিতান্ত poetical নয় কিন্তু অনেক সময়ে সেই ঘরে গিয়ে আমার মনে হয়েছে আমি যেন বাগানে গিয়েচি। তোমার ওখেনে সমুদ্র-পারের মাঠ থেকে বন-ফুল-দোলান' বাতাস বয় আমার মনে হয় যেন তোমার ও ঘরের সঙ্গে কলকাতার Municipalityর কোন সংস্রব নেই। আমি যেন কলকাতা থেকে তোমার ওখানে যাই, তোমার ওখেন থেকে কলকাতায় ফিরি। তোমার ওখেনে

খানিকক্ষণ থাক্‌লে আমার একরকম বিষাদ জন্মায়, আমার মনে হয় আমি যেন একটা কিছু করতে পারি কিন্তু করতে পারুচি নে। আমি যা'-কিছু লিখেছি যা'-কিছু গেয়েছি মনে হয় সেগুলো আগাগোড়া অসম্পূর্ণ। বসন্তের বাতাস লেগে আমার সহসা যেন চৈতন্য হয় যে, আমার গান বন্ধ হয়ে গেছে। সেই-জন্যে আমার কলকাতা ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে।

এখেনে এই মাঠের মধ্যে এসে আমার মনের মধ্যে একরকম অস্থিরতা জন্মেছে। একটা কি আমার কাজ বাকী আছে মনে হচ্চে। একটা মহত্বের জন্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌চে। মনে হচ্চে আমি নিষ্ফল। কি করব ঠিক সেইটে মনে করতে পারচি নে। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে একটা কিছু করবই এইটে আমার মনে হচ্চে। নিজের লেখা নিয়ে ভারি খুঁৎখুঁৎ করচি কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হচ্চে না। তোমাকে খুলে বল্‌চি নিজের লেখার উপর আমার ভারী সন্দেহ জন্মায়—তাই যোগ্য ব্যক্তির কাছে আমার লেখার নিন্দে শুন্‌লে আমি ভারি দমে যাই—আমার মনে হয় আমি তবে সত্য সত্যই অকর্ম্মণ্য। তোমাদের যে আমার কোন কোন লেখা ভাল লাগে আমার মনে হয় আমি তোমাদের ফাঁকি দিচ্চি—দুই চারবার তোমাদের চখে পড়্‌লেই সমস্ত ধরা পড়বে। এক এক সময় মনে হয় কিছু না লেখা ভাল। অপমানিত হয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিতে ভারি কষ্ট হয়। তাই জন্যে আমার মনে হয়, আমি যে ঠকাচ্ছি আমি তার মূল্য একদিন নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব। তাই জন্যে আমি যখন তোমার কাছে যাই বা কলকাতা ছেড়ে

আসি তখন এই ঋণদায়ের কথা মনে পড়ে। আমার রচনাই যাদের কাছে ঢের—তাদের মধ্যে আমি একরকম থাকি ভাল—একরকম ভুলে থাকি—কিন্তু তোমার কাছে গেলে আমার মনে হয় এখেনে জারিজুরি খাটবে না, তুমি জহুর চেন—আমার নিজেকে নিজের অনুপযুক্ত বলে বোধ হয়।—এই চিঠিতে যা লিখ্‌লুম তা' তোমার একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে—কিন্তু তা' ঠিক নয়। তোমার কাছে আমি চুপ করে থাকি—চিঠিতে আমি খুলে লিখ্‌লুম—এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্যই তাই। কাল আমরা কলকাতা মুখে যাচ্চি সুতরাং বিদেশ থেকে এই শেষ চিঠি। বোধ করি আগামী শুক্রবারের ডাকে First deliveryতেই আমরা কলকাতায় গিয়ে পৌছব—এই জন্যে দেখা হবার আগে আমি আমার এই বিদেশের Introduction letter তোমার কাছে পাঠালুম—এর থেকে আমার ঘরের সন্ধান কতক জান্‌তে পার্‌বে।

রবি

পুনঃ—দূর হোক্‌গে। তোমার ঠিকানা জানিনে। সুতরাং এ চিঠি আমি কলকাতায় গিয়ে তোমাকে পাঠাব।

৪ঠা শ্রাবণ

ভাই

তোমার স্নেহ-মমতা-পূর্ণ ক্ষুদ্র পত্রখানি আজ দিন চার হ'ল পেয়েছি—তুমি শুনে সুখী হবে আমার ছেলেটি বেশ আরাম

হ’য়েছে—একমাসেরও অধিককাল পরে সবেমাত্র কাল সে বাঙ্গালী-জীবনের অনন্যসম্বল ছুটি বালাম চালের ভাত পেয়েছে। তাতেই আর তার আনন্দ রাখবার জায়গা নাই—এ থেকে যেটুকু moralize করা যেতে পারে তা’ তুমি ক’রে নিও।

আমি কিন্তু নিজে—খোদ বা স্বয়ং বড় ভাল নাই। যদিও ডাক্তারি শাস্ত্রের তপসিলের লিখিত কোন দফার রোগ আমার দফা সাত্তে আমাকে আক্রমণ করে নাই, আমার মনটা কিন্তু এমনি ম্রিয়মাণ—নিস্তেজ ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা এমনি অলস—দুর্ব্বল ও স্ফুর্ত্তিহীন হয়েছে যে সত্যি সত্যি আমার সাধ যায় কেবল চোখ বুঁজে প’ড়ে থেকে ভবলীলাটা সাঙ্গ ক’রে ফেলি। তামাসা ছেড়ে বাস্তবিক বলচি আমার আজকাল কিছুই ভাল লাগে না—জীবনটা যেন নিতান্ত পুরাতন খেলা ব’লে বোধ হয় যেন এর ভেতর আর কোন মজাই নাই—সবই সেই পুরাণ একঘেয়ে ব্যাপার—সেই পুরাণ একঘেয়ে হাঁসি আর সেই পুরাণ একঘেয়ে কান্না একটানা স্রোতে চলেচে—তাতে তরঙ্গ নাই—বৈচিত্র্য নাই—এক একবার মনে হয় যেন জীবনের ঠিক পথে যেতে পারি নাই—যেন ঠিক দর্জ্জায় ঘা মাত্তে পারি নাই—যেন কোন পোড়ো জলা-ভুমিতে ঘুরে বেড়াচ্চি। আমার প্রাণ চায় আলো-আকাশ-পরিসর—আর দেখি না কোথা থেকে চারটা বড় বড় দেয়াল এসে আমাকে ক্রমেই ঘেরে ফেলচে—দিগ্‌গজ দেয়ালগুলো আমাকে এমনিই আটকে ফেল্‌চে যে আমার আর হাত পা নাড়বার জায়গা নাই—এটা ভারি morbid রকম কিছু

বোধ হ'তে পারে—আর সত্যিই বা তা হবে—কারণ আমার মনটা নিতান্তই বেস্ফুর্ত্তি হ'য়ে পড়েচে তার ভিতরকার স্বভাব যেন বিগড়ে গেচে—যেন হঠাৎ কোন দিক থেকে একটা বাতাস এসে আমাকে এক রকম করে তুলেচে—আমার জিবে আর তার নাই —আমার চোখে আর আলো যায় না। আমার মত কেতাবী লোকের আর এর চেয়ে কি দুর্দ্দশা হ'তে পারে যে, কোন বইই আর আমার ভাল লাগে না। মনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য এই ত' কত নতুন বই কিনলেম তার একখানাও কিন্তু প'ড়ে উঠ্‌তে পাল্লেম না। এমন যে Swinburneএর নূতন Miscell-any পড়লেম তাতেও সে পূর্ব্বেকার মত আনন্দ পেলেম না। Guy de Maupassantর একখানা নূতন বই পেয়েচি কিন্তু কই তার সেই সুন্দর জীবন্ত উদার তরঙ্গময়ী ভাষা আগেকার মত ত প্রাণে একটা উৎসাহের স্রোত—একটা জীবনের তরঙ্গ এনে দিতে পাল্লে না! অন্যে পরে কা কথা—এমন যে মহাকবি শ্রীপ্রিয়নাথ সেন—তাঁহারই রচিত এবং অরচিত কাব্যগুলি—সেই আসমানি—সেই—এলনাসকারী (Alnascharil) স্বপ্ন আনে না। কিছুই ভাল লাগে না—কিছুতে মন বসে না। কেবল মাজে মাজে এই বর্ষাকালের মেঘবিচিত্র আকাশ দেখতে একবার একবার ভাল লাগে। ঘরে বেশ একলা নিঝুম (আবকারি Revenue না বাড়িয়ে) ব'সে আছি—সামনের একটা জানলা খোলা—খানিকটা নীল আকাশ দেখা যাচ্চে—কোথা থেকে একখানা মেঘ—অতি ধীরে—অতি মন্থর—অতি অলস গতিতে চ'লে

যাচ্চে। দেখি আর ভাবি কোথা থেকেই বা আসে আর কোথায়ই বা চলে যায়। কোন দূর থেকে কোন গ্রাম-নদী-প্রান্তর দেখে শুনে—এমনি আমার মত কত আনমোনা অলস চাহনি পেয়ে—কোথায় আবার কোন দূরে ভেসে যাচ্চে—আর আমরাই বা কোথা থেকে এসেচি—আর কোথায় ভেসে চলিচি। দেখচি তুমি ভয় পেয়েচ—তুমি মনে কচ্চ দ্বিতীয় একখানা মেঘদূত কাব্যের অবতারণা বুঝি আরম্ভ হয়। মা ভৈঃ—আমি হলপ করে বলতে পারি—আমার দ্বারা ও রকম কুকার্য্য কখনই হবে না—তুমি অবশ্য হলপের কোন আবশ্যকতা দেখচনা—তা যাই হক কথাটা হচ্চে এই আমার দেহখানি আর তার অধিষ্ঠাতৃ-দেব বা অসুর মন নিতান্ত খারাপ থাকার দরুণ তোমাকে এত বিলম্বে তোমার পত্রের উত্তর লিখচি। আর যদি বল আজই বা লিখচি কেন—সামাজিক ভদ্রতা শীলতা বা শালীনতার (এই তিনটে কি এক, না তিন বিভিন্ন, পদার্থ বা অপদার্থ) অনুরোধে যে আজ লিখতে বসিনি তা নিশ্চয় জেনো। আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান এবিষয়ে এমনই সজাগ যে এই সকল ব্যাপার নিয়ে আমার উপর অনেক বন্ধুবরের অনুরাগ রাগে পরিণত হয়েচে। তাছাড়া এমন সময় কি কারো কর্ত্তব্য-জ্ঞান জাগে? তুমিই মনে কর দেখি ভাই—আমি আজ আপিস পালিয়ে আমার সেই ছেঁড়া শতরঞ্চ বিছান ঘরের এক কোণে লুকিয়ে বসে আছি। আমার দেহটাও নিতান্ত ছেঁড়া গোছের—এলিয়ে পড়চে। প্রাণটা কিছুই চায় না—তার কোন সাধ কর্ব্বার সাধও নাই—সাধ্যও নাই—আকাশে এই নিঝুম দুপুর

বেলায় কে পাতলা মেঘের মশারি খাটিয়ে দিয়েচে—বৃষ্টি পড়চে কি না পড়চে। ঘরের প্রায় সব দরজা জানলা বন্ধ—তাতে বেশ একরকম অকাল সন্ধ্যা ক'রে আছে—কেবল পাশের একটি জানলার আধখানা খোলা রয়েচে—আর তারই ভেতর দিয়ে ভিজে বাতাস দুষ্টু ছেলের মত তার নিজের গায়ের জল আমার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্চে—এমন সময় কি কারো কর্ত্তব্য-জ্ঞান জন্মে? এ নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ব্বার সময়। কে বলবে এসময় চাণক্য প্রভৃতি "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম।" আমি কিন্তু ভাই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য দুয়ের কিছুই না করে নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে শুয়ে থেকে বৃষ্টির রিম ঝিম শুনচি—আর তারই মাঝ থেকে এই মৃদু-বৃষ্টির মৃদু-কোমল-সম্পাতময় শব্দে প্রাণের ভিতর হঠাৎ কেমন তোমার সেই কোমল সহৃদয় পত্রখানি জেগে উঠল—তাতেই আর stationeryগুলো নিতান্ত হাতের কাছে থাকার দরুণ এই লিপিপ্রবরের অবতারণা এবং তোমার উপর দারুণ অত্যাচার—ইত্যলং।

তুমি সেই সমুদ্র-উপকূলে থাকিয়া সমুদ্রের গান শুনিতে শুনিতে যে আর এক মহাসাগরের জীবন-কাহিনী শুনিয়াছ তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আমি বেশ উপলব্ধি কত্তে পারি। তোমার পিতার জীবন ইতিহাস যে একখানি পূর্ণ পরিণত এবং সারগর্ভ গ্রন্থ হবে তাহাও বেশ বুঝি। তুমি সেদিন তোমাদের বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর যে পত্রখানি দেখাইয়াছিলে সেখানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল—তাঁহার সুন্দর অকপট স্নেহময় ভাষায় আমি

মুগ্ধ হইয়াছি। আমি ভাই ছেলেবেলা থেকে—যখন থেকে মাটির উপর কাদার আলিপনা কাটি—তখন থেকে মনে মনে বড় বড় লোকের ছবি আঁকি। এই রকম কল্পনার খেলায় তোমার বাপের যে ছবিখানি এঁকেছিনু, তারই যেন আদ্‌রা সেই চিঠিখানির ভেতর প'ড়ে রয়েচে—ছবিখানি দেখবার কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি কথা শুনেছিনু তাতে সেই আমার আশৈশব কল্পিত ছবিখানির গায়ে দুই একটি লম্বা গোছের আঁচড় পড়েছিল কিন্তু সেই চিঠির বিমল দর্পণে যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম তাহাতে সে সব দাগ মুছিয়া গেল আর প্রতীয়মান হল আমার সেই শৈশব কল্পনাটি সত্যের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি!

তোমার

প্রিয়নাথ

(খ)

আলোচনা প্রবন্ধ

(মনস্বী লেখক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত):—

প্রিয়নাথ সেন

কলিকাতা—নিমতলা—৮নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি তীর্থ ছিল। বাঙ্গালায় সে তীর্থের কথা সকলে জানিত না। এককালে রবীন্দ্রনাথ সে তীর্থের নিত্য যাত্রী ছিলেন। স্বনামধন্য মথুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বংশে একজন সাহিত্য-সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি প্রিয়নাথ সেন। গত ২৫শে অক্টোবর প্রত্যূষে চারিটার সময় প্রিয়বাবু পরপারে চলিয়া গিয়াছেন!

ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রিয়বাবুর সহিত প্রথম পরিচিত হই—তাঁহার স্নেহে, প্রেমে ধন্য হইবার অবকাশ লাভ করি। তখন প্রিয়বাবুকে যেমন দেখিয়াছিলাম, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে তেমনিই দেখিয়াছি। সাহিত্য—শাখা-পল্লব-ফল-পুষ্পসমন্বিত সমগ্র সাহিত্য—জ্ঞান-রস-আনন্দই তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। অধ্যয়ন ও আলোচনা, নিত্য নব নব রসের অন্বেষণ ও উপভোগ, বিশ্ব-সাহিত্যের সন্ধান, পরিচয় ও অনুশীলন, নানা ভাষার অসংখ্য গ্রন্থের সংগ্রহ ও সে সকলের প্রসাধন, রক্ষণ

ও অধিকারের আনন্দে প্রিয়বাবুকে তখন যেরূপ মগ্ন, তন্ময় দেখিয়াছিলাম, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তাঁহাকে সেই আনন্দে বিভোর দেখিয়াছি। সাংঘাতিক ব্যাধির ভীষণ আক্রমণে জীবনী শক্তির প্রবাহ শুকাইয়া আসিতেছে, প্রিয়নাথ গ্রন্থরাশি-বেষ্টিত হইয়া রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছেন, আনন্দরসে ডুবিয়াছেন। দেখিয়া বিস্মিত হইতাম—মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া থাকিতাম।—আজ তার শেষ! এই চিরপরিচিত নিত্য দৃশ্য আর দেখিতে পাইব না; সাহিত্য-পূজকের প্রাণের পূজা দেখিবার আর অবসর ঘটিবে না। সাহিত্য-রসের সে প্রস্রবণ শুষ্ক হইল!

প্রিয়বাবু অনেকদিন রোগ ভোগ করিতেছিলেন। রোগ-শয্যায় গ্রন্থই তাঁহার সঙ্গী ছিল। সেই সঙ্গীদের ফেলিয়া, পরিবারবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, আমাদের মত ভক্ত স্নেহ-ভাজনদিগকে কাঁদাইয়া প্রিয়বাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ব্যাধি-যন্ত্রণার অবসান হইল, তিনি সংসারের সুখ-দুঃখের অতীত হইলেন। কর্ম্মাবসান ভোগের উপরতি—বিধির বিধান। নিয়তির এই কঠোর শাসন শিরোধার্য্য করিতেই হয়। কিন্তু মন ত বুঝেনা। প্রিয়বাবুর বৃদ্ধ পিতা বর্ত্তমান। তিনি এমন পুত্রের মরণ দেখিলেন। প্রিয়বাবুর পিতা, বিধবা বনিতা ও পিতৃহীন পুত্রদিগকে আমরা কি বলিয়া প্রবোধ দিব, তাহার ভাষা ত খুঁজিয়া পাই না। আমাদের শোকাচ্ছন্ন মনের সমগ্র সমবেদনা তাঁহাদের শোকের অনলে 'তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম'। কর্ত্তব্যবোধে ভক্তিনম্রচিত্তে তাহাই নিবেদন করিলাম।

প্রিয়বাবু অসামান্য মনীষার অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্শী, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি রসজ্ঞ, ভাবুক ও সাহিত্য-রসিক সমালোচক ছিলেন। সাহিত্যের সকল বিভাগে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

তাঁহার রচনায় প্রতিভার পরিচয় আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি মধুকরের মত বিশ্ব-সাহিত্যের মধুসঞ্চয় করিতেন; মধুচক্র রচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তিনি যে স্বল্প রচনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবি, ভাবুক, সন্দর্ভকার ও সমালোচক, এই রূপ-চতুষ্টয় দেদীপ্যমান হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী রচনায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচনারীতি বিশুদ্ধ, পুষ্পিত ও প্রাঞ্জল ছিল! সে রীতি নব্য লেখকগণের আদর্শ হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য উপকৃত হইতে পারে।"

(নায়ক, ১১ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩২৩ সাল)

(কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয় লিখিত):—

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন

দেবী সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক সাহিত্যরসরসিক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন আজ ইহসংসার হইতে অপসৃত। বিগত ৮ই কার্ত্তিক রোগে তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। সাহিত্যসম্পর্কে তিনি

দুটি-দশটি কবিতা ও দুটি-দুশটি গল্পরচনামাত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এবং সেগুলিও সাহিত্যের দরবারে বিশেষ কোন উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা ঠিক বলা শক্ত; তথাপি তাঁহার নাম যে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম সাহিত্য-ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত সে কথার সাক্ষ্যদান করিতে পারিবেন।

একশ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা স্বভাবতঃই রচনাশীল; স্বীয় প্রতিভাগুণে তাঁহারা সাহিত্য-মধুচক্রের রচনাকার্য্যেই তৎপর। তাঁহারা অন্তর-বাহির হইতে ভাবমধু সংগ্রহপূর্ব্বক উত্তরপুরুষের জন্য তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যান,—সেই তাঁহাদের কায। আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা মধুচক্র রচনায় গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা মধু আহরণপূর্ব্বক রচনাকার্য্যে মুখ্যভাবে উদ্যোগশীল না হইলেও, প্রথমোক্ত দলকে রচনাকার্য্যে প্রণোদিত ও উৎসাহিত করেন, সঞ্চয়ের স্থানবিন্যাস করেন এবং সতত সজাগ থাকিয়া চক্ররচনাকার্য্যের সহায়তা ও সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রিয়নাথ সেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর; এবং এই শ্রেণীরও একান্ত আবশ্যকতা আছে। স্বভাবতঃই এই শ্রেণীর সম্পর্ক ও প্রভাব সাহিত্য অপেক্ষা সাহিত্যিকের উপরেই সমধিক। তাই ইঁহারা রসিক, সমজদার, বোদ্ধা বা বড় জোর সমালোচকভাবেই সবিশেষ সম্মানার্হ। কিন্তু দুই-ই চাই, নহিলে রস জমে না, গান হয় না। "একাকী গায়কের নহে ত গান,

মিলিতে হবে দুইজনে ; গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে। তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে ; বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্ম্মর ফুটে।”—একজন মুখে গান করে, আর একজনকে মনে মনে গাহিতে হয়, “যেখানে প্রাণহীন বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে”। তাই সারদামঙ্গলের কবি ৺বিহারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়া নবীনতম কবি কালিদাস পর্য্যন্ত অল্প বা অধিক পরিমাণে ইঁহার উৎসাহ বা প্রশংসা-ঋণে আবদ্ধ। বয়সের বা ক্ষমতার তারতম্য না রাখিয়া তাই তিনি সকলেরই বন্ধু বা শুভার্থী। প্রতিভাকেন্দ্র ঠাকুরপরিবারের অনেকেরই তিনি সাহিত্যসাহচর্য্য করিয়া, তাঁহাদিগকে এবং নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারিয়াছেন। এই বঙ্গবিস্তৃত বিপুল সাহিত্য-মজলিসের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন যেখানে যে কেহ রাগলয়ে সুর ধরিতে পারিয়াছে, কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা বা শক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই তখনই তিনি বড় গলায় বাহবা দিয়া উঠিয়াছেন। কাছে পাইলে বন্ধুভাবে তাহার পিঠ চাপড়াইয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই আলোচনা, উপদেশ, পরামর্শ প্রভৃতি মিত্রোচিত ব্যবহারে তদীয় কৃত ও কর্ত্তব্যকার্য্যের পন্থা ও প্রণালী সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিজেও উৎসাহিত হইয়াছেন। নানা ভাবে ও নানা ভাষায় পারদর্শিতা থাকায় এই বন্ধুকৃত্যে তিনি বিশেষ অধিকারও রাখিতেন। তাঁহার এই সাহিত্য-বান্ধবতার ব্যবহারে একটা অসাধারণ সরলতা ছিল ; একান্ত অকপটভাবেই তিনি নিন্দা বা

প্রশংসা করিতে পারিতেন এবং ঐ আন্তরিকতাই বন্ধুজনের নিকট তদীয় বক্তব্যবিষয়ে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত। বয়সের প্রভেদ তাঁহার এই সাহিত্য-সাহচার্য্যের কখনও অন্তরায় হয় নাই; যুবাবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে তিনি সকলেরই বন্ধু হইতে পারিতেন। সাহিত্যতীর্থের যাত্রী হইলেই হইল—আর কোন কিছু তিনি দেখিতেন না, দেখিতে জানিতেন না। সাহিত্যের বয়স নাই; সাহিত্যিকের বয়স লইয়া কি হইবে? রসই সব; তাই নিজে সেই রসের রসিক, রসের মর্ম্মী হইয়া ঐ রসের রসিক পাইলেই তিনি একেবারে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিতেন—রসের পাত্রবিচার করিতেন না। 'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে'—তাই রসের রসিক হইলেই সে তাঁহার প্রাণ হইয়া পড়িত। মুরুব্বিয়ানা তাঁহার স্বভাবের মধ্যে ছিল না। যাহাকে ভাল-বাসিতেন, তাহাকে প্রাণ দিয়াই ভালবাসিতেন; ওজন করিয়া, হতে রাখিয়া ভালবাসা তাঁহার স্বভাব ছিল না।

তাঁহার আর এক বিশেষত্ব ছিল, তাহা তাঁহার অহমিকা-শূন্যতা। অধিকাংশ লোকই এই অহমিকার হাত এড়াইতে পারেন না—বিশেষতঃ সাহিত্যপন্থীরা। যে ভাব, যে কথা ভাল বা নূতন বলিয়া মনে হয়, তাহা নিজে লিখিয়া বা প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লইবার প্রবৃত্তি এই শ্রেণীর লোকের মজ্জাগত। প্রিয়-নাথ সেন তাঁহার কত ভাব কত চিন্তা কত রস যে তাঁহার সাহিত্য-বান্ধবদিগের রচনার মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা তিনি নিজে বিস্মৃত হইলেও, তাঁহাদের বিস্মৃত না হইবারই কথা।

সাহিত্যের এই নিঃস্বার্থ 'মহাজনী' তাঁহার প্রাণের ব্যবসায় ছিল। আমার সাহিত্য বড়, আমার সাহিত্য ভাল হইলেই হইল। আমি সেখানে আমল পাই বা না পাই, তাহা আক্ষেপের বিষয় নহে। "ঠাই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি";—আমার ঠাঁই না হউক, আমার কৃত কর্ম্ম—আমার সোনার ধান ত ঠাঁই পাইবে। সে ধান সোনার তরীতে বহিয়া সাহিত্যসরস্বতী একদিন তাঁহার সোনার গোলায় ভরিয়া রাখিবেন ইহা যে নিশ্চিত।

এই সরস্বতীসেবা তাঁহার ইহজীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। ইহা তাঁহার দিবসের চেষ্টা, তাঁহার রজনীর চিন্তা, জাগ্রতের ধ্যান, তাঁহার সুপ্তির স্বপ্ন ছিল। তাঁহার হৃদয়পুষ্প দিনে কমল এবং রাত্রে কুমুদ হইয়া সূর্য্য বা চন্দ্ররূপী বাণীচরণ চাহিয়াই নিয়ত উন্মুখী হইয়া থাকিত। কোন কার্য্যই তাঁহার করণীয় নহে, যদি তাঁহার পরমকর্ত্তব্য সরস্বতীসেবা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়; অর্থ তাঁহার কাছে নিরর্থক, যদি বাণীবন্দনা তাহাতে সার্থক হইয়া না উঠে; আত্মীয় পরিবারও তাঁহার নিকট প্রিয় নহে, যদি তাঁহার প্রিয়তম সাধনা প্রতিদিন তৎসাহচর্য্যে প্রিয়তর হইবার অবকাশ না পায়। **Newman** বা **Thacker**এর দোকানে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ প্রাণ-পণ চেষ্টায় গচ্ছিত রাখিয়াছেন, ব্যাঙ্কেও মানুষ তেমন প্রাণপণে গচ্ছিত রাখে না; দপ্তরীর বাড়ীতে তাঁহার প্রিয়পুস্তকের আচ্ছা-দন-অলঙ্কার প্রতিনিয়তই প্রস্তুত হইতেছে, **Laidlaw** বা লাভ চাঁদের বাড়ীতে নহে। গৃহ তাঁহার পুস্তকরাশির আবাসস্থান—

আলমারিতে পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের সেখানে থাকিবার যতই অসুবিধা হউক। পঞ্চতপার ন্যায় পাঁচদিকে পুস্তক পরিবৃত হইয়া অহরহ তিনি তপস্যামগ্ন, কিন্তু সে তপস্যা কৃচ্ছ্র সাধ্য নহে—তাহা ভূমানন্দের। নিজে 'টাকায় তিনখানা' কাপড় পরিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু হস্তে যে পুস্তক, তাহা বিলাত হইতে বহুমূল্যে বাঁধিয়া আসিয়াছে। শীতবস্ত্র তাঁহার শত ছিদ্র, কিন্তু কীটের সাধ্য কি তাঁহার পুস্তকদেহে একটি ছিদ্র করে! স্পর্শশক্তি তাঁহার এত প্রবল দেখিয়াছি যে, অসংখ্য অর্থক্রীত সংখ্যাতীত গ্রন্থরাজির মধ্যে যে কোনখানি গ্রন্থ আঁধারে অনুভবমাত্র করিয়া বলিতে পারিতেন ইহা অমুক বইয়ের অমুক সংস্করণ। হায় রে! প্রীতি বুঝি এমনি করিয়াই প্রিয়তমকে প্রাণের কাছে পরিচিত করিয়া তুলে। হীন-জ্যোতিঃ চক্ষুও বুঝি প্রিয়বস্তুকে দূরে হইতে দেখিয়া তৃপ্ত হইত না, তাই পাঠকালে পুস্তক একেবারে প্রায় চক্ষুসংলগ্ন করিয়াই রাখিত—যেন একান্ত অনুরাগভরে বলিতে চাহিত, "আও, মেরে শিরো আঁখোপে বৈঠো।" * নিবিড় আলিঙ্গনের বাধা বলিয়া রাধা তাঁহার কৃষ্ণকে এই জন্যই বুঝি বক্ষের চন্দন অপসারিত করিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।

কথা কহিবার ভঙ্গী তাঁহার সাধারণ হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। সাধারণতঃ কথা খুব বেশী কহিতেন না, কিন্তু যাহা কহিতেন, তাহা খুব আগ্রহের ও তেজের সহিত কহিতেন। একটি বাক্যের

* প্রিয়বাবু অত্যন্ত short-sighted ছিলেন—বই একেবারে চোখের কাছে লইয়া পড়িতেন।

অর্দ্ধেকমাত্র ভাষায় কহিতেন, বাকী অর্দ্ধেক মুখচোখের ভাব বা বিষয়ানুসারে হাসি বা দীর্ঘশ্বাস, গাম্ভীর্য্য বা উচ্ছ্বাসের দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতেন। এই খানিকটা ভাষা ও খানিকটা আভাষ একত্র মিলাইয়া তবে তাঁহার বাক্যটি সমাপ্তিলাভ করিত। সাধারণ বিষয়ে তিনি একান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। কাযের কথা যাহাকে বলে, তাহা কোনমতে তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ভাবরাজ্যের, সাহিত্যরাজ্যের কথা ফাঁদিতেন এবং ডাঙায় তোলা মাছ জল পাইলে যেমন ছিটকাইয়া ডুব মারিতে চায়, তেমনি ডুব মারিতে চাহিতেন। সাহিত্যের কথা উঠিলে, পূর্ব্বেকার মানুষটি যেন সহসা একনিমেষে বদলাইয়া গিয়া, ভিতর হইতে আর একটি মানুষ বাহির হইয়া আসিত। তখন তাঁহার উচ্ছ্বাসের আর অন্ত থাকিত না—স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞান থাকিত না—একেবারে মাতিয়া উঠিতেন। কখনও বা কণ্ঠস্বর এমন উচ্চ হইত, হাস্য এমন প্রবল হইত, দীর্ঘশ্বাস এমন মর্ম্মান্তিক হইত এবং মৌন এমন সুগভীর হইত যে, সহসা তাহা নূতন লোকের পক্ষে তাঁহার জন্য আশঙ্কার সৃষ্টি করিত। যাঁহার সহিত কথা হইতেছে, হঠাৎ ঐ হাসি শুনিয়া তিনি হাসিতে ভুলিয়া যাইতেন, কাছে শিশু থাকিলে সে চমকাইয়া উঠিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িত। মূল কথা, তাঁহার অন্তর্নিহিত যে প্রাণশক্তি, তাহা যেন ঐ সাহিত্যালোচনায় একেবারে সজাগ হইয়া উঠিত এবং আশপাশের সকলকে সচকিত করিয়া তুলিত।

ফরাসী সাহিত্যের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ

সাহিত্যের গল্পরচনা তাঁহার মতে রচনার আদর্শ—একথা তাঁহার মুখে যে কতবার শুনিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি সাহিত্যরস পাইলে পাত্রবিচার করিতে জানিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে যদি Victor Hugoর কথা উঠিল, তবে বুঝিতে হইবে যে সেদিন তাঁহার স্নানাহার বন্ধ, সময়ের পরিমাপ রাখিবারও সময় নাই। Victor Hugo লোক কেমন, তাঁহার মনুষ্যত্ব কত বৃহৎ, দেশহিতৈষণা তাঁহার কত গভীর ও সত্য, তাঁহার গল্পরচনার মূলমন্ত্র কি, গীতিকাব্যে তাঁহার বিশেষত্ব কোথায়; Shakespeare-এর সহিত তাঁহার প্রভেদ কোন্ জাতীয়;—সেইখানেই কি শেষ? তাহা হইলে ত নিস্তার ছিল। Victor Hugo হইতে Guy de Maupassant, Maupassant হইতে Theophile Gautier; কাহার কি বিশিষ্টতা, কৃতিত্ব কাহার কতখানি—অর্থাৎ শ্রোতার আর সেদিন অন্য কোন কাযকর্ম্মের আশা নাই। Balzac ও Rousseau সম্বন্ধে তাঁহার মত, তাঁহার ভাষায়:—"ঐ দেখ কি কাণ্ড! কি অদ্ভুত ঐ Balzac লোকটা! কি ব্যাপার! কি plot, কি বাঁধুনি! কি বিদ্রূপ, কি চাবুক! আর ঐ Rousseau! কি অকুতোভয় সত্যপ্রিয়তা! জায়গায় জায়গায় কি নূতন মত প্রকাশের সাহস—মনে হয়, যেন যে পাতার উপর লেখা—তা জ্বলে' যাবে—এমনি তেজ!" তাঁহার মতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি-হিসাবে কালিদাসের তুলনা নাই, সৌন্দর্য্যরচনায় আর এক মহাজন Keats। Gautierএর রচনা কোথাও কোথাও সেই কালিদাসকে approach করিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের

সমবেদনা ও সহানুভূতির আদর্শলেখক Victor Hugo ও Guy de Maupassant। ওরূপ broad sympathy, বেদব্যাস ও Shakespeare ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না! ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে Shelley, Keats ও Browning তাঁহার বিশেষ প্রিয়। Shelleyর কল্পনার সুদূরতা ও গভীরতা অনন্যসাধারণ। Shelleyর কাব্য তাহার উধাও পক্ষে পাঠককে উড়াইয়া এমনি স্থানে লইয়া যায়, যেখানে বাতাস নাই, শুধু Ether—সেখানে দম আট্‌কাইয়া আসে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। Swinburne তাঁহার আর এক প্রিয় কবি। সমুদ্র যেমন একক, অনন্ত, অসীম, সঙ্গীহারা, সৃষ্টিছাড়া, তাঁহার সিন্ধুসম্বন্ধীয় সঙ্গীতগুলিও তেমনি দ্বন্দ্বরহিত! জার্ম্মান কবি Goethe তাঁহার মতে শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।—ইত্যাদি কত রসের কথা, কত ভাবের কথা, কত সাহিত্যের মর্ম্মের কথা পর-পর সম্পর্ক রাখিয়া অবলীলাক্রমে তিনি বলিয়া যাইতেন যে, একসঙ্গে সেগুলি বুঝিয়া লইতে শ্রোতাকে বিব্রত হইতে হইত। অথচ নিষ্কৃতি নাই—একবার যদি তাঁহাকে কোন গতিকে ঘাঁটাইয়াছ, ত 'বৈকুণ্ঠের খাতার' জাঁতাকলে ইঁদুরের মত আট্‌কা পড়িয়া গিয়াছ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার যে কি ধারণা, কতখানি দরদ তাহা লিখিয়া বোঝান শক্ত। একে প্রতিভার টান, তাহাতে সৌহার্দ্দের আকর্ষণ, তাই রবীন্দ্রনাথের কথা, তাঁহার রচনার কথা, তাঁহার ভাবের উদারতা তাঁহার কল্পনার অসীমত্ব, তাঁহার ভাষার সম্পদ্, তাঁহার কত কিছু—

বলিতে বলিতে সেই স্বল্পভাষী গম্ভীরবেদী পুরুষ একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। তেমন আন্তরিক সাহিত্য-প্রীতি তেমন অকপট রসানুরাগ, তেমন অকৃত্রিম কাব্যপ্রিয়তা জীবনে দেখি নাই, বুঝি আর দেখিবও না।

জ্ঞানান্বেষী, রসপিপাসু, সাহিত্যপ্রিয় সুপণ্ডিত সেই প্রিয়নাথ আজ ইহলোক হইতে অবসর লইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বহু টাকার নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন। আমাদের ইহা বুঝিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়।

এই ক্ষুদ্র লেখক তখন কার্য্যব্যপদেশে কোনও এক সুদূর পল্লীতে—সেখানে সংবাদপত্র পর্য্যন্ত পঁহুছেনা, তাই সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা বড় ছিল না। তবু, সংবাদ পাইলাম, কারণ সে সংবাদ যে চাপা থাকে না। সংবাদ পাইলাম তাঁহার এক দরদী সাহিত্য-বন্ধুর নিকট হইতে। সে দরদী বন্ধু মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। পত্র পাইলাম :—

"যতীন,

আজ একটি দুঃসংবাদ দিতে বাধ্য হইতেছি। তোমার বন্ধু, আমার বন্ধু, বঙ্গসাহিত্যের বন্ধু, কৃতীলেখক, বোদ্ধা ও সমালোচক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন আজ কয়দিন যাবৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দেহমনে কিছুদিন হইতে যেরূপ অসুস্থ এবং অসুখী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে মৃত্যু নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় হয়ত বা ছিল না। এরূপ দুঃখী জগতে হয়ত আরো আছে, যাহারা মরিতে পাইলে বাঁচিয়া যায় কিন্তু প্রার্থিত দ্রব্য সমস্তই

দুর্লভ—মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ে দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়। ভোগাভোগের অন্ত না হইলে,সূর্য্যতনয়ও দয়া করেন না। প্রিয়বাবু গিয়াছেন, তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বান্ধবসমাজ, এবং বঙ্গদেশ ও সাহিত্য যে গুণী গুণগ্রাহী রসজ্ঞজনকে আজ হারাইল, কবে কে সে স্থান পুরণ করিবে বিধাতাই জানেন।”

পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। হায়! চিরপ্রয়াণের পূর্ব্বে একবার শেষ সাক্ষাৎও হইল না! সেদিন সমস্ত দিবারাত্রি বুকের মধ্যে যে গুরুভার বোধ করিয়াছিলাম, তাহা আমিই জানি। মনে হইল প্রিয়বন্ধু ত স্বর্গগত, সেই সঙ্গে সাহিত্যের একটা দিক্‌পাল আজ অন্তর্হিত হইল। ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণাদির মধ্যে তিনি সেই দিক্‌পাল, যাঁহার প্রভাব আমরা প্রবলভাবে অনুভব করি না, কিন্তু যাঁহার স্নিগ্ধ হাস্যে এবং স্মিত সৌন্দর্য্যে সাহিত্যের ক্ষুদ্র গোষ্পদটি পর্য্যন্ত আলোকে পুলকে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হইয়া উঠে।

সাহিত্যযাত্রার পথে তাঁহার শৈশব-সহচর সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে প্রিয়নাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এইখানে তাহা উদ্ধৃত করি।

“এই ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ রচনার দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে ‘ভগ্নহৃদয়’ পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, ‘সন্ধ্যাসঙ্গীতে’ তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন,

সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্ব-সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি, সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত।"

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব কোন্‌খানে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' ইঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত। বন্ধুবর আজ বিদেশে। তাঁহার বই-পাগলা চন্দর-দা আজ ইহলোকের চিরপ্রিয় পুস্তক ফেলিয়া পরলোকপথের পথিক—সেখানে কোন্ জ্যোতিষ্কের আলোকে কোন্ তারায় লেখা গ্রন্থের কোঁন্ অজ্ঞাত রহস্যের অনন্ত পাথারে আজ নিমজ্জিত, কে জানে! প্রিয়বর বন্ধুবর কবিবর আজ

তাঁহার এই কথাশেষ বন্ধুর সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

ইংরাজী গদ্যপদ্য রচনাতেও প্রিয়নাথের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ঐ—তিনি বড় লিখিতে চাহিতেন না, কেবল বই লইয়া মস্‌গুল্ হইয়া থাকিতেন। এইখানে তাঁহার রচিত একটি ইংরাজী কবিতা উদ্ধৃত করিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

AT THE YEAR'S END

The year has found its goal,
Hope knows not where begin,
Life yawns—a barren waste,
When—when will death close in ?

What a hedge of sturdy thorn
For one short-lived rose !
For the gleam of a distant dawn
What a night of storm and snows !

A wisp's frail light in front,
Behind—the heavens dome
Glares red—a beacon fire
Fed by my burning home.

উক্ত সনেটটি সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ইংরাজ-সমালোচক ও মনীষী যাহা বলিয়াছেন, শুনিলে আনন্দে বুক ফুলিয়া উঠে। কাব্যরসের

বিশেষজ্ঞ প্রবীণ সমালোচক Edmund Gosseএর পত্রখানির কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

* * Your verses remind me of the English poetry of Goethe, which had similar peculiarities. I am sure you will not mind being compared with so eminent a man.

Believe me, with many thanks for your letter,

Yours sincerely
(Sd.) Edmund Gosse.

Preo Nath Sen Esq.

* * *

সুবর্ণবণিক সমাজের মুখপত্র "সুবর্ণবণিক সমাচারে" প্রিয়নাথ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরলোকগত মনীষী সম্বন্ধে সুগভীর বেদনার পরিচয় পরিস্ফুট। কেবল উক্ত সমাজ তাঁহার বিয়োগে ব্যথিত নহেন; সমস্ত বঙ্গীয় সমাজ, বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ, আজ বেদনাতুর। জাতিগত হিসাবে তিনি সুবর্ণবণিক থাকুন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে সু-বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথা যে একেবারেই অত্যুক্তি নহে, ইহা বোধ করি সাহিত্যসমাজের সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বণিকবৃত্তি তাঁহার কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—কিন্তু তিনি যে সুবর্ণ এবং খাঁটি সুবর্ণ ছিলেন, সে বিষয়ে কাঁহারও সন্দেহ নাই।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী মাঘ ১৩২৩)

(শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-অ্যাট-ল লিখিত)

৺প্রিয়নাথ সেন।

সকল দেশে সকল যুগেই এমন জনকতক লোক থাকেন, যাঁরা পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ পরিচিত না হলেও, সে যুগের লেখক সমাজের কাছে সুপরিচিত। এ শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের মনের ছাপ সাহিত্যের উপর নয়,—সাহিত্যিকদের উপর রেখে যান। এঁরা লেখকদের সহজ বন্ধু, এবং এঁদের সঙ্গে আলাপে নবীন লেখকেরা আনন্দও পান, শিক্ষাও লাভ করেন। ৺প্রিয়নাথ সেন এই শ্রেণীর একজন লোক ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে এ জাতীয় লোক নিতান্ত দুর্লভ, সুতরাং তাঁর অভাবে তাঁর লেখক বন্ধুরা যেরূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, নিজেদের সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করছেন। লেখক হিসেবে যাঁরা ৺প্রিয়নাথ সেনের নিকট ঋণী আমি তার মধ্যে একজন।

আজ ছাব্বিশ কি সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে সঙ্গে করে প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর ঘরে প্রবেশ করবামাত্র আমি বুঝলুম যে তিনি আর আমি, আমরা দু'জনেই জীবনের সেই এক পথের পথিক, যে পথ সকলে অবলম্বন করেন না ; সুতরাং আমাদের উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা জন্মাতে বাধ্য।

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক টাকা ভালবাসে—আর কিছু ভালবাসে না। কিন্তু সকল দেশের সকল সমাজেই এমন জনকতক লোক থাকেন, টাকার একান্ত মায়া যাঁদের ধাতে নেই। তাঁরা হয় টাকা ভালবাসেন না, নয় টাকা ছাড়া আরও কিছু ভালবাসেন —এবং সম্ভবতঃ তা টাকার চাইতে ঢের বেশী পরিমাণে। এ জাতের অনুরাগকে বৈষয়িক লোকেরা নেশা বলে থাকেন। আমাদের দেশে কারও কারও গানবাজনার নেশা আছে। বিলেতের লোকদের গানবাজনা ছাড়া আরও পাঁচরকমের নেশা আছে। সে দেশে কেউবা ফুল ভালবাসে, কেউবা ছবি, কেউবা শিকার, কেউবা কুকুর।—কিন্তু বই ভালবাসে, এমন লোক সব দেশেই কম—এবং আমাদের দেশে নেই বল্লেও হয়। বিলেতে সকলে সরস্বতীর পূজা করুন আর না করুন, ঘরের এক কোণে তাঁর ঠাট্ সাজিয়ে রাখতে বাধ্য হন। তার কারণ, সে দেশে যাঁর বৈঠকখানায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের অন্ততঃ দু'একশ বই না থাকে, তিনি ভদ্রসমাজে ভদ্রলোক বলে গণ্য হন্ না। এদেশে ঠিক তার উল্টো। আমাদের সমাজে যিনি বই ভালবাসেন, বুদ্ধিমান লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন; বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির যে কোন সম্পর্ক আছে, বিজ্ঞ লোকেরা তা সহজে স্বীকার করেন না। এঁদের মতে বই পড়াটা একটা বাতিকের মধ্যে। বই পড়াটা না হো'ক কেনাটা যে একটা বাতিক, এ কথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এ বাতিক আমারও আছে, এবং ৺প্রিয়নাথ সেনেরও* যে পুরোমাত্রায় ছিল. তার

প্রকৃষ্ট ও অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ তাঁর গৃহে প্রবেশ করবামাত্রই পাওয়া যেত। একেবারে আসবাবহীন তাঁর ঐ ছোট কুঠরীটি আমার চোখকে যে পরিমাণ আনন্দ দিয়েছিল, তার সিকির সিকি আনন্দও এ দেশের বিলাতি-আসবাব্-সঙ্কুল, চিত্রবিচিত্র রাজপ্রাসাদ দর্শনে আমি কখন পাই নি।—সেকালে গৃহাভ্যন্তরে পুস্তককে উচ্চ আসন দেবার ফ্যাসান আমাদের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না,—আজকাল হয়েছে। লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা এবং প্রিয়-পাত্রেরা যে সরস্বতীর হস্তের বীণার না হো'ক, পুস্তকের আদর কর্‌তে শিখেছেন, এ অবশ্য অতীব সুখের বিষয়। কিন্তু বই কেনার ফ্যাসান ও তার ব্যসনের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে।

ধনী লোকদের পোষা লাইব্রেরীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, তা সরস্বতীর মন্দির নয়,—সমাধি-মন্দির। মনে হয়, ও-সব ক্ষেত্রে পুস্তকাবলী যেন মলাটের কফিন-বন্দী হয়ে চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে। ৺প্রিয়নাথ সেনের বই যে গৃহসজ্জার জন্য সংগৃহীত হয় নি, সে যে ধনীর নয়, গুণীর হাতের বই,—তা বুঝতে কারও দেরি হত না। কেননা তাঁর বই দেওয়া-লের গায়ে ছবির মত সাজানো থাকত না, আশেপাশে ছড়ানো থাকত। মেঝের উপর, ঘরের কোণে, বেঞ্চের উপর, যেখানে চোখ পড়ত সেইখানেই দেখা যেত, অসংখ্য বই স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। গৃহস্বামী যে সেগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তার প্রমাণ তাদের বিপর্য্যস্ত অবস্থার ভিতরেই পাওয়া যেত। এই অনাদরই তাদের যথার্থ আদরের পরিচয় দিত।—আর সেই

পুস্তকরাশির অধিকাংশ সেই জাতের, যাদের দর্শন কলিকাতার কোন বইয়ের দোকানে কিম্বা ধনীলোকের পুস্তকাগারে দু'বেলা মেলে না।—অর্থাৎ ইউরোপের নব সাহিত্যে তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল।

এই বই ভালবাসাটা সাহিত্যানুরাগের বাহ্য লক্ষণ হলেও, একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যাঁরা যথার্থ সাহিত্য ভালবাসেন, তাঁরা সাহিত্যের শুধু রস নয়, রূপও ভালবাসেন।

আমরা উভয়ে একই রসের,—সাহিত্য রসের,—রসিক বলে, সেই প্রথম সাক্ষাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে আত্মীয়তা জন্মায়, তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। যদিচ তখন আমি কলেজের ছাত্র, এবং তিনি সাহিত্য সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তবুও পাঁচ মিনিটের আলাপে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠলুম। তার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। পৃথিবীতে যিনি বিষয় সম্পত্তি ছাড়া অপর কোনও বস্তুতে সুখ পান, তিনি আর পাঁচজনকে সে সুখের ভাগ দিতে চান্। সংসারে যে আমাদের দুঃখের দুঃখী, সেই যেমন আমাদের যথার্থ বন্ধু—মনোরাজ্যে তেমনি যে আমাদের সুখের সুখী, সেই আমাদের যথার্থ বন্ধু। ৺প্রিয়নাথ সেন ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ফরাসী ভাষার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় এবং ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলে, প্রথম থেকেই তিনি আমাকে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুশ্রেণীতে ভুক্ত করে নেন্।

আমি পূর্ব্বে বলেছি—৺প্রিয়নাথ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মনের উপর তাঁর মনের ছাপ রেখে গেছেন। এর কারণ, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ appreciation ছিল।

তিনি সাহিত্যের একজন যথার্থ গুণগ্রাহী ছিলেন। কাব্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ যে তার রস, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস কাব্যে তিনি এই রস ব্যতীত অপর কোনও গুণের সন্ধানে ফিরতেন না। আমাদের পাঁচজনের আর পাঁচ বিষয়ে মন আছে,—যথা রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম ইত্যাদি,—কিন্তু ৺প্রিয়নাথ সেন এ সকল বিষয়ের আলোচনায় কখনও নিজের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতেন না। একমাত্র সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি ছিল, এবং তিনি তাঁর সকল মন সকল প্রাণ দিয়ে আজীবন একমাত্র সাহিত্যেরই চর্চ্চা করেছেন। সাহিত্যের এই একাগ্র চর্চ্চার ফলে তাঁর সহজ রসবোধ যেমন পরিপুষ্ট হয়েছিল, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতও তেমনি উদারতা লাভ করেছিল। তিনি জানতেন যে, সাহিত্যজগতে এমন কোনও কষ্টিপাথর নেই, যার সাহায্যে সকলপ্রকার কাব্য সমান যাচিয়ে নেওয়া যেতে পারে। রূপে গুণে Shelleyর কবিতার সঙ্গে Gautierএর কোনও সাদৃশ্য না থাকলেও,—এ দুই যে কাব্য, এবং উঁচুদরের কাব্য, এ জ্ঞান আমাদের সকলের নেই; তাঁর ছিল। তাঁর মন সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও তৈরি মতামতের অধীন ছিল না বলে, তিনি সাহিত্যে নববস্তুর গুণগ্রহণ করতে পারতেন,—অবশ্য তাতে যদি কোনও গুণ থাকত। তাই

আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের লেখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানবার জন্য উৎসুক্ হয়ে থাকতুম, এবং সে লেখা তাঁর মনোমত হলে আশ্বস্ত হতুম।

৺প্রিয়নাথ সেনের অভাবে তাঁর লেখক বন্ধুরা যে নিজেদের একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত মনে কর্‌ছেন, তার কারণ,—সাহিত্যে সুরের কাণ সকলের নেই; শুধু তাই নয়, কাব্যকে কাব্য হিসেবে না দেখে,—দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি কিম্বা সমাজ-নীতির অঙ্গ হিসাবে দেখবার এবং সেই হিসেবে বিচার করবার সহজ পদ্ধতিটি অবলম্বন করাটাই একালের দস্তুর হয়ে উঠেছে।

৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে যে বিশেষ কিছু ধনরত্ন রেখে যান নি,—অর্থাৎ তিনি যে একজন বড় লেখক হন্ নি,—তার কারণ তিনি ছিলেন একজন বড় পাঠক। সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি ও উন্নতির জন্য লেখকও চাই, পাঠকও চাই; কেননা এ উভয়ের মনের সংযোগ না হলে সাহিত্য বাড়্‌তে পারে না। এবং এ দেশে এ যুগে, গুণী লেখকের মত, সমজদার পাঠকও শতেকে জনেক হয়। সেই একশ'র মধ্যে একজনের মৃত্যুতে সাহিত্য সমাজের একটি উচ্চ আসন শূন্য হয়ে পড়ে। তাই ৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্য সমাজে একটি বড় ফাঁক রেখে চলে গিয়েছেন।

(সবুজ পত্র অগ্রহায়ণ ১৩২৩)

(প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় Some Celebreties নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

PREO NATH SEN

Preo Nath Sen was some years older than myself, but he strongly attracted young people interested in literature. I met him first in 1881 and retained his valued friendship to the end of his life. He should have become a solicitor, but he was so deeply absorbed in literature that he never passed the examination necessary to qualify him for that profession. He did not do much creative work and has left no literary works behind him, but literature was to him the very breath of life. He was a bibliophile in the best sense of the word and his literary judgment was wonderfully keen and accurate. He had one of the finest libraries I have seen and not a week passed in which he did not add to his collection of books. And he read every book that he bought. As a linguist, I have not met his equal, not because of the number of languages he knew but the ease with which he acquired a new language. A biglot dictionary, a grammar of the new language, and in a few months Preo Nath would be reading books in a

new language. Of course, the correct enunciation of the words of a new language cannot be learned in this manner but this is a small detail when the object is to read books and not to speak the language. When I first saw him Preo Nath could read French and Italian in the original, and subsequently learned other European languages. Persian he learned last and I borrowed from him a splendid edition of Hafiz's poems with an English translation. His books had encroached upon every available space in his house. Besides the almirahs and shelves in the inner portion of the house, his sitting room, which contained no furniture, was full of books, which were stacked under the windows and overflowed into the verandah. With all his great love for books, he readily lent them not only to his friends but even to slight acquaintances. I must have read hundreeds of books from his library and this gave him great pleasure. Among his constant visitors were Rabindranath Tagore, Behari Lal Chakravarti, Devendranath Sen and many others. It was in deference to his unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been reprinted. In almost every case Preo Nath's literary judgment was sound and he was invariably candid

and outspoken. His favourite author was Swinburne and he carefully collected every line of prose and verse that the English poet ever wrote.

Most of the men who used to meet at the house of Preo Nath Sen to discuss literature have passed away. Rabindranath Tagore and myself are still left to cherish his memory and recall his fine character.

(Modern Review, May 1927)